নির্বাচিত বাছাই গল্প

প্রাপ্তিস্থান

প্রভা প্রকাশনী

আবাহনী
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা—৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি চন্দ্রিমা মণ্ডল
অর্পিতা প্রকাশনী
বি-৬/১৭৫, কল্যাণী
নদীয়া

ব্যবস্থাপক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল

পরিবেশক :
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

প্রকাশ : ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : রতন মুখার্জী

মুদ্রাকর :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে



অসমাপ্ত কাজের বোঝার চিহ্ন ফাইলগুলোকে গাদা মেরে টেবিলের একধারে ঠেলে রেখে সামনেটার টুকিটাকি জিনিসপত্র সাফ করতে করতে রত্নাকর চশমার কোণ দিয়ে একবার পম্পার টেবিলের দিকে তাকাল।

যেমন রোজ হয়। যাকে বলে 'নীট অ্যাণ্ড ক্লীন'। এছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না পম্পার, সেদিনের কাজ সাঙ্গ করে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ার সময়।

তবে টেবিলের কাজ সাঙ্গ হলেও, দেখা যাচ্ছে পম্পা তার ঢাউশ হাত ব্যাগটা নিয়ে খুব ব্যস্ত। তার গায়ে 'ঘরদোর অনেক। জিব টেনে টেনে প্রত্যেকটা চেম্বার খুলে খুলে দেখছে, ঢাউশের গহ্বরে হাত ঠুকিয়ে হাতড়াচ্চে তো হাতড়াচ্ছে।

রত্নাকর ভাবল, মেয়েদের এই হাত ব্যাগের মধ্যে যে কী থাকে, আর কী না থাকে! বেশি সংসারী মার্কা মেয়েগুলোর তো মাঝে মাঝে ব্যাগগুলো এত ঢাউশ হয় যে, বাজারের থলির কাজ করে।

রত্নাকরের বউদি তো তার শ্যামনগর বালিকা বিদ্যালয়ের চাকরি সেরে বাড়ি ফেরার সময় শেয়ালদা বাজার থেকে সস্তায় বাজার করে ফেরে। 'সস্তার বাজার' তো এইসব গিন্নীমার্কা মেয়েদের কাছে পরম প্রেমাস্পদের থেকেও আকর্ষণীয়। দরকার না থাকলেও বউদি একবার একটু ঘুরবেই বাজারটা। তো সব কিছুই ওই হাত ব্যাগের মধ্যে।

একদিন বউদি তার সর্বংসহা ব্যাগটির মধ্যে দু কিলো বাঁধাকপি আর গোটা আষ্টেক কচি শশাও এনেছিল। কৌশলে কী না হয়, কপিটাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে দিব্যি কব্জা করে ফেলে। শশাদের গায়ে গায়ে শুইয়ে এনেছিল। আর একদিন একটা 'সুন্দরবনের তরমুজ'।

এ গল্প শুনিয়ে পম্পারে বেদম হাসিয়েছিল রত্নাকর। পম্পা বলেছিল এ ক্ষেত্রে তো আর ওই 'খণ্ড খণ্ড'র কৌশল খাটানো যায়নি?

তা অবশ্যই নয়। কোন একটা কৌশল প্রয়োগ করেছিল। তরমুজ অটুটই ছিল। তবে সাধের সুন্দর পলিথিনের ব্যাগটিও অটুটই ছিল।

রত্নাকর পম্পার হাসি দেখে বলেছিল হবে হবে। ভবিষ্যতে আপনারও মনোভঙ্গী আসবে। এখনই তো দেখি এই একখানি ঢাউশ বয়ে বেড়ান। কত ঘরদোর কত বড় গহ্বর! কী কাজে লাগে এত?

পম্পা বলেছিল, বোঝানো যাবে না।

এখন পম্পার ব্যাগ হাতড়ানো দেখে রত্নাকর কয়েক ফিট এগিয়ে এসে হাসির আলো মুখে ছড়িয়ে বলে উঠল, কী খুঁজছেন? মাথাধরার ট্যাবলেট? লণ্ড্রীর রসিদ? বদল দেবার শাড়ির ক্যাশমেমো? চশমার প্রেসকৃপশন? পুরনো বান্ধবীর ঠিকানা? ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কার্ড না কি—থেমে গেল।

পম্পা বলল, থামলেন কেন ? চালিয়ে যান। আপনার অনুমান শক্তির বহরটা দেখা যাক!

নাঃ আর কী কী থাকা সম্ভব মনে বা মাথায় আসছে না। আপনিই বলুন।

পম্পা এখন ব্যাগ হাতড়ানো বন্ধ করে ফেলে তার মুখটা বন্ধ করে ফেলতে ফেলতে বলল, এমন কিছু না!

এত হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন, আর এমন কিছু না?

না মানে, এখন মনে হচ্ছে বোধ হয় বাড়িতেই ফেলে এসেছি !

রত্নাকরের হঠাৎ মনে হল বলে ওঠে, 'এখন' কিছুই মনে হয়নি তোমার। তখন কিছু খুঁজছিলে না। এটা শুধু সময়ক্ষেপণের ছল!.... এই অভাগা রত্নাকরের সঙ্গে এক সঙ্গে বেরোবে বলে, এবং সেটা সে হতভাগাকে জানতে দেবে না বলেই তোমার এই বৃথা ছল!

কিন্তু বলে ওঠা তো যায় না।

অধৈর্য হয়ে অকালে উদ্‌ঘাটন করতে বসার চেষ্টা মুখ্যুমি! কুঁড়িতে ফুল হয়ে ওঠবার জন্যে সময় দিতে হয়। অতএব রত্নাকর অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল টেবিলটাকে সবদিন এ রকম সাফসুতরো করে ফেলেন কী করে বলতে পারেন!

পম্পা হেসে ফেলে বলল, এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

আমার তো দারুণ শক্ত মনে হয়। সময় হয় না তো।

পম্পা মুখ টিপে হেসে বলল, বার আষ্টেক চা আর গোটা কুড়ি তিরিশ সিগারেট ধ্বংসালে সময় একটু কমে যাবেই!

তা এসব না হলেই বা এনার্জি আসবে কী করে?

পম্পা এখন শুধুই একটু হাসল। বলে তো ওঠা যায় না। আমার তো আসে।

তাই হাসির পর বলল, ইচ্ছে করলে এর ডবল কাজও করতে পারেন আপনি।

ইচ্ছে করলে। মাই গড! এই গোয়ালের মধ্যে ডবল মাপে কাজ করতে ইচ্ছে হতে যাবে আমার? না না, আপনি আমাদের মত অকর্মাদের খুব অনিষ্ট করছেন!

অনিষ্ট!

তাছাড়া আবার কী। হঠাৎ কখন কার নজরে পড়ে যাবে, একজনের যদি হয়ে ওঠে, আর একজনেরই বা হবে না কেন!

বললেন তো গোয়াল। এখানে কে কার কাজের হিসেব করছে? আপনি চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেও, আপনার যথা সময়েই প্রমোশন-ট্রমোশন হবে, যথা নিয়মেই মাইনেকড়ি বাড়বে। 'নিদ্রিত ভগবানের' কাজ-কারবার বৈ তো নয়।

আরেব্বাস! জ্ঞান তো বেশ টনটনে। তবে এত খেটে মরেন কেন?

পম্পা হেসে বলে, স্বভাবের দায়।

হুঁ। বেশি সিনসিয়ারদের এইরকম দশাই হয়। অথচ—

ওরা এখন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে করিডোরের ভিড়ের চাপের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ির দিকে আসছে। ভিড়ের জন্যে একটা জানলার ধারে দাঁড়াল।

গরমকাল, বেলা বড়। তাই এখনও আলোর সমারোহ। জনাকীর্ণ কলকাতার উদ্দাম গতির ওপর কে যেন একটি মোহময় ওড়না বিছিয়ে দিয়েছে। তবে বড় ক্ষণস্থায়ী। যেমন ক্ষণস্থায়ী এই ভিড় থেকে গা বাঁচিয়ে এই জানলা ঘেঁষে দাঁড়ানোর সময়টুকু!

পম্পার মুখে-চোখে এই কনে-দেখা আলোর একটি অনির্বচনীয় মায়া। মুখটা কিন্তু সে রত্নাকরের দিকে না তুলে বাইরের দিকে ফিরিয়েই বলল, অথচ কী?

অথচ অকারণ। সবটাই শখ।

পম্পা আস্তে বলল, আপনার এ ধারণা ভুল। এটাই আমার বাঁচার একমাত্র উপায়। চলুন।

হ্যাঁ তাড়াতাড়িই চলতে হবে, নেমে যেতে হবে। এই মিনিট খানেকের একমাত্র দাঁড়ানটুকুও যে লোকের দৃষ্টি এড়াচ্ছে না, তা না তাকিয়েও বুঝতে পারা যাচ্ছে।

ভিড়ের চাপেই এগোনো, তবু এক সঙ্গেই এগোনো। গেট থেকে বেরিয়ে একটু গিয়েই, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রত্নাকর। একটু হতাশ গলায় বলল, ওঃ। আপনার যে আজ থানায় রিপোর্টের দিন। রথ এসে দাঁড়িয়ে আছে।

পম্পা একটু ম্লান হেসে বলল, হ্যাঁ, দারোগা সাহেবের আইনের নড়চড় নেই!

আপনার বাড়িতে জানেন ?

মা জানেন বৈকি! ওরা বিচক্ষণ লোক, কাজের খুঁত রাখেন না। আগে গাড়ি নিয়ে ওখানে খবর দিয়ে দেয়, 'এসেছি, নিয়ে যাচ্ছি'।

একটু হাসল, সেই সঙ্গে কুটুমবাড়ির বাগানের ফল-টল, কুটুমবাড়ির গরুর দুধের মিষ্টি-টিষ্টি প্রেজেন্ট করে আসাও হয়। অর্থাৎ নাগপাশের বন্ধন।

রত্নাকর একটু কঠিন আর তীব্র গলায় বলে উঠল, আপনার উৎসাহ দেখলে তো মনে হয় না নাগপাশ!

পম্পা বলল, যা দেখা যায়, সেটাই কি সব?

তারপর দ্রুত পায়ে অপেক্ষমান গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল ।

ড্রাইবার দরজা খুলেই দাঁড়িয়েছিল, লম্বা সেলাম করল। পম্পা উঠে বসার পর দমাস শব্দ করে, গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। এগিয়ে গেল।

ওই শব্দটা যেন রত্নাকরের মাথায় ধাক্কা দেয়।

প্রতি সপ্তাহের ব্যাপার অনিবার্য এবং অমোঘ, তবু রোজই রাগে গা রি রি করে তার।

পম্পাকে নজরবন্দী আসামীর সঙ্গে তুলনা করে। আর পম্পার এই দামী গাড়ি চড়ে বলতে গেলে রাজকীয় ভ্রমণটিকে বলে, আসামীর সপ্তাহে সপ্তাহে থানায় উপস্থিতি পেশ করতে যাওয়া।

ওই যাওয়াটার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে দেখে রত্নাকর ভাবল, হুঁ 'বিচক্ষণ' তাতে সন্দেহে নেই। নাকি খুব পুরনো ড্রাইভার, তবু একা আসে না। গাড়ির মধ্যে যথানিয়মে পুরনো দাসীও বসে। পম্পা তার পাশে গিয়ে বসল। আজ শনিবার সন্ধ্যায় যাবে, কাল রবিবার পুরো দিন-রাত্তিরটা থাকবে, সোমবার সকালে ওখান থেকেই নেয়ে-খেয়ে-অফিসে

চলে আসবে। এই মস্ত গাড়িখানাই পৌঁছে দিয়ে যাবে। ওই দাসীটিও সঙ্গে থাকবে!

রত্নাকরের অফিসটা সরকারি, তবে কেন্দ্রের অধীন। তাই ছুটি-ছাটার নিয়ম সেই 'কেন্দ্র নির্দেশিত'। শনিবার হলেও হাফডের ব্যবস্থা নেই। মাসে একটা ছুটি দিয়ে চারটে হাফ-এর শোধ।

এই নিয়ে তার বউদির প্রতি শনিবারেই আক্ষেপ! একটা দিনও দুই ভাইকে একসঙ্গে গুছিয়ে চা-টা দিতে পাই না। বুড়ো ভদ্দরলোক কখন এসে বসে থাকে, তাকে টাঙিয়ে রাখতে মায়া হয়।

লতিকার 'শ্যামনগর বালিকা বিদ্যালয়ের' শনি রবি দুদিন ছুটি। তাই তার এত বাহাদুরী। অন্যদিন তো স্কুল সেরে আর বাজার সেরে, ফিরতে সন্ধ্যে।

সুধাকর খালি গায়ে একটা লুঙ্গি মাত্র পরে, সকালের খবরের কাগজটা এই অকালে পড়ছিল। তার দিকে একটি কটাক্ষপাত করে রত্নাকর বলল তা 'বুড়ো ভদ্দরলোককে' আর এক কাপ চা দেওয়া হবে তো?

না দিলে ছাড়বে? লতিকা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, পেলে তো দশবার খায়। অফিসেও তো হয়ে যায় বারকতক।

রত্নাকর বলল, কাজটা খুব ঠিক করে না দাদা ।

তোমার দাদাব কোন কাজটাই বা খুব ঠিক ? লতিকা ঝঙ্কার দিল, সবই যা-তা!

রত্নাকর বলল সবসময় অবশ্য তোমার সঙ্গে একমত হতে পারি না তবে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। বুঝলে হে, 'শ্যামনগর বালিকা বিদ্যালয়' সম্পূর্ণ। এই যেমন তোমাকে এই যথেচ্ছ বাকস্বাধীনতা দেওয়া! এটা কি আর খুব ঠিক ?

লতিকা চড়া গলায় বলল, দেওয়া মানে? স্বাধীনতা কি একটা মেঠাই? যে হাতে তুলে দেবে? দেয় কেউ কখনো তা? ওটি অর্জন করবার জিনিস। বুঝলে? এবং করেছি।

ও! তাহলে আর কিছু বলার নেই। তবে দাদা, তোমার বেঠিক কাজের নিষ্ঠাটি নেহাত ছোট নয়। এই যে তুমি এই খোলা বারান্দায় খালি গায়ে একটা লুঙ্গি পরে বসে আছ, এটা কি খুব ঠিক?

দেখছ তো?

লতিকা বলল দেখ। আমি তো বলি —শুধু এই অসভ্যতার জন্যেই তোমাকে আমার ডির্ভোস করা উচিত ছিল। করিনি নেহাত দয়া করে। আবার বলে কি জান? বেটাছেলের আবার খালি গায়ে লজ্জা কী? বেটাছেলে বলে সাতখুন মাপ! তাদেরই শুধু গরম লাগে।

সুধাকর কত বলল, আরে বাবা কথা তো দিয়ে রেখেছি বাড়িতে ভাদ্দরবউ এলে খুব সভ্য হয়ে যাব। সবসময় ধবধবে গেঞ্জি, পাটভাঙ্গা পায়জামা, প্লেটে ঢেলে চা খাওয়া নয়— মানে একজন সভ্যভব্য!

রত্নাকর বলল, তার আগে এসব করা চলবে না ?

আহা বুঝছিস না অনেক দিনের অভ্যেস, একটা উপলক্ষ-টুপলক্ষ দেখে ছাড়লে, মনে একটা দায়িত্ববোধ আসে।

তাহলে হে 'শ্যামনগর বালিকা' তোমার আর সভ্যভব্য পরম গুরু কপালে নেই!

কেন কেন?

সুধাকর বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিশ্বাস হবে না কেন? তুমি যখন কথা দিয়েছ— তবে বউদির ভাগ্যে বাড়িতে ভাদ্দর-আশ্বিন কার্তিক কোন বউই মাথা গলাতে আসবে না!

বারান্দা থেকে ঘরে চলে আসে রত্নাকর, পিছনের প্রতিক্রিয়াটা না দেখেই। বিয়ে সম্পর্কে কোনদিনই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল না তার শুধু অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়েই ছিল প্রশ্ন। তবে তার জন্যে বিরাট কিছুরও চিন্তা ছিল না। দাদা বউদির জীবনটা কী সুখহীন?

ওই 'সস্তায় বাজার' করতে পেলে রাজ্যজয়ের সুখে সুখী ডেলি প্যাসেঞ্জারী করা দিদিমণি মহিলাটি! আর খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বসে সকালের খবরের কাগজখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই 'দেশের কী অবস্থা হলো' —বলে আক্ষেপ করে ওঠা পুরুষটি, এদের সারাক্ষণ সর্বায়ববেই যেন সুখের হিল্লোল, পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা।

মা থাকতে এত লক্ষ্য পড়ত না এবং 'দাম্পত্যজীবনের' সুখ সন্তোষ নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়েস অথবা খেয়াল হয়নি। খেয়াল হয়ে পর্যন্তই দেখেছে রত্নাকর। দেখেছে! ভারী সুখী আর সম্পূর্ণ এরা।

কই এদের তো তুচ্ছ মনে হয়নি। ভেবেছে, কী ক্ষতি যদি এদের মতই হই; এই সংসারেরই তো ছেলে আমি। আরো অনেক 'বেশি'র এমন কি দরকার? তবে চিন্তা এই লতিকার মত সবসময় আহ্লাদে ভাসা মেয়ে কি সর্বদা মেলে? তবু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল না। অতএব সেই সাহসেই লতিকা আহ্লাদে ভেসে ভেসে তলে তলে দেওরের জন্যে কনের চিন্তা করছিল।

হঠাৎ রত্নাকর আজ সেই আহ্লাদটির ওপর একখানা পাথর ফেলে দিয়ে চলে এল।

হয়ত এর কিছুই হত না। হয়ত কোনো একদিন দাদা বউদির পছন্দ করা কোনো এক মেয়েকে বিয়ে করতে টোপর পরে বেরিয়ে পড়ত। এবং হাজার হাজাব সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরেব সাধারণ সুপাত্ররা যেভাবে সকল প্রকার গতানুগতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যেই পুলকেব উপাদান আবিষ্কার করতে করতে বিগলিত চিত্তে বাসরে গিয়ে বসে, সেইভাবেই বসত! যদি না—

হ্যাঁ যদি না কোনো এক শুভ কি অশুভ লগ্নে পম্পাকে দেখত।

কী অদ্ভুত আশ্চর্য! এই অফিসেই নাকি কাজ করছে পম্পা অনেকগুলো দিন। শুধু ডিপার্টমেন্টের পার্থক্যে দেখা হয়নি! সহসা একদিন সেই পার্থক্যটা ঘুচে গিয়ে একই ঘরে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসতে হল পম্পা আর রত্নাকরকে।

নিজের ঘরে এসে রত্নাকর আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে মনে মনে বলে উঠল, পম্পা! পম্পা! মাত্র বছর দেড়েক আগেও তোমার সঙ্গে দেখা হল না কেন আমার! তখন তো তুমি এমন দুর্লভ হতে না।

অন্ধকারেই উঠে বসল। মনে মনেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, কিন্তু এখনই বা তুমি এমন দুর্লভ হবে কেন? কেন বোকার মত একটা পাগলামির পাল্লায় পড়ে থেকে জীবনটাকে বরবাদ করতে থাকবে?

এমন হয় নাকি? না, না! ও হতে পারে না চলতে দেওয়া যায় না। কেনই বা দেব? পম্পা! পম্পা! আমি কি বুঝতে পারি না? পম্পা 'বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?'

পম্পা তুমি যে আমায় ভাবালু করে ছাড়ছ দেখছি।

রত্নাকর যখন কিছুক্ষণ সেই গাড়িটার দিকে আক্রোশের দৃষ্টিতে তাকিয়ে, অতঃপর বাসে উঠে পড়ল, গাড়িটা ততক্ষণে শহর ছাড়ানো রাস্তায় এগিয়ে চলেছে।

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য যেতে হল না।

অফিসপাড়া থেকে উত্তরপাড়া আর কতটুকু?

অনেকখানি কম্পাউণ্ডে ঘেরা বনেদী চেহারার একখানা মস্ত বাড়ি। গাড়িবারান্দার নিচে গাড়িটা ঢুকে আসা মাত্র সদরের সিঁড়িতে দাঁড়ানো বুড়ো একটা লোক কোমর নুইয়ে প্রণামের ভঙ্গী করল। দারোয়ন নয়, পুরাতন ভৃত্য। দারোয়ান আছে একেবারে বাইরের গেটে।

আশেপাশে সামনে-পিছনে অনেকটা করে জমি! একদা যে বাহারি বাগান-টাগান ছিল তা বোঝা যাচ্ছে। আবার এও বোঝা যাচ্ছে আপাতত সে বাগানে অযত্নের ছাপ। যদিও গাছেদের গোড়ায় গোড়ায় ভিজে মাটি। মালির কর্মনিষ্ঠার পরিচয় বহন করছে। তবু যেন জৌলুসের অভাব। হঠাৎ এসে পড়লে, দেখলে, মনে হবে যেন একটা বিষণ্ণ কাননের মধ্যে ঘুমন্ত এক রাজপুরী। রাজপুরীতে যেখানে যা থাকবার সবই আছে, নেই শুধু প্রাণের সাড়া।

হয়ত এই রূপকথাসুলভ তুলনাটা শুধু পম্পার মধ্যেই উদয় হয়। লোকে ভাবে যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে। কিন্তু পম্পা কী করে বুঝবে। পম্পা যখন দেখেছিল, তখন তো বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে ডেকরেটারের কারুকর্যের ছাপ, টুনি বালবের ঝালর। তখন বাড়িটা বুড়ো গালে রুজ মেখে সুন্দরী হবার সাধনা করছে।

এখন অবস্থায় বদল ঘটেছে। এখন যেন সবকিছুই ঝিমোচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে। এই 'মহামায়া' ভবনের গেটটা দূর থেকে দেখামাত্রই পম্পার নিজেরও যেন ঝিমুনি আসে।

গাড়িটা গাড়িবারান্দার নিচেই ঢুকে এল। যেমন আসে। পুরনো লোক তারাপদ কোমর নুইয়ে অভিবাদন করল। যেমন করে।

সঙ্গে আসা গিন্নীবান্নী পরিচারিকাটি নিজে নেমে পড়ে, হাতটা বাড়িয়ে ধরল পম্পাকে

নামিয়ে নেবার জন্যে। যেমন ধরে। পম্পা সেই বাড়িয়ে ধরা হাতটাকে দেখতে না পাওয়ার ভঙ্গীতে নিজেই নেমে এল। যেমন আসে।

যেন ছকে বাঁধা এক নাটকের সাপ্তাহিক পুনরাভিনয়।

সব নিঃশব্দ। এ বাড়িতে 'ঘুমন্ত পুরী' না বলে কী আর বলবে পম্পা? গেট থেকে অন্দর পর্যন্ত ঢুকে যেতে মানুষের মুখ যে নেহাত কম দেখা যায়, তা নয়। যারা আছে এ সময় হয়ত প্রায় সকলের মুখই দেখা যায়। কারণ এই মহামুহূর্তটির জন্যে সকলেই তো উৎকণ্ঠ অপেক্ষায় মিনিট গুনছে।

কিন্তু এরা কে? সকলেই প্রায় 'লোকজন' আর আশ্রিতজন। পম্পার সম্পর্কে প্রত্যেকের ভঙ্গীই সসম্ভ্রম সন্ত্রস্ত। ভীষণ মাননীয় এক অতিথির আবির্ভাব ঘটল। অতিথি, তবে প্রত্যাশিত!

সকলেই অভ্যর্থনাসূচক কিছু এক একটা কথা বলে উঠল পম্পাকে দেখে, কিন্তু এত অস্ফুটে যে কী বলল, বোঝা গেল না।

এ সমস্তই পরিচিত দৃশ্য। সাবেকি বড়লোকের বাড়ির যেমন গড়ন।

লম্বা হলঘর পার করে তবে ভিতরের ঘরে পা ফেলা যাবে। এই লম্বা হলটা বাদামী ছোপ ধরে আসা মার্বেল মোড়া। কোণের দিকে দু একটা ফাট ধরা। আর এই লম্বা জায়গাটার দেয়াল ধারে ধারে বয়েসের ভার বহন করে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো পুরনো সব আসবাসপত্র! একদার বোলবোলাওয়ের সাক্ষ্য! কবেকার এই বাড়ি? 'মহামায়া' কার নাম? কর্তার ঠাকুমার না?

সুখদার মাকে হাত ধরতে না দিলেও সঙ্গে সঙ্গে যাবেই সে। এটা তার ডিউটি। আর পম্পারও ডিউটি শাড়ির আঁচলটা মাথায় টেনে ধীরে ধীরে তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া!

অন্দরের চৌকাঠটা ডিঙিয়েই সুখদার মা থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, আগে পা হাত পা ধোবে, না আগে ওনাদের সঙ্গে দেখা করবে বউমণি?

যেমন বলে থাকে। লাইনটা মুখস্থ। প্রথম প্রথম বলেছিল 'বউরানী'।

পম্পার আপত্তিতে সেটা ছাড়তে হয়েছে. পম্পা বলেছে, 'বউরানী' আবার কী? কোন রাজ্যের রানী?

বোকাসোকা মানুষটা বলে ফেলেছিল, এই সমগ্র রাজ্যটারই তো বউরানী। সবই তো তোমার।

পম্পা বলেছিল, না বাপু না। রানী-টানী শুনতে অস্বস্তি লাগে। বউদিদি বলাই তো বেশ ভাল। আর পম্পা বোধহয় হঠাৎ অসতর্কে একটা স্বগতোক্তি করে বসেছিল, 'রাজা কোথায় তার ঠিক নেই, রানী'!

আস্তেই বলেছিল, তবু বোধহয় সুখদার মার কান এড়ায়নি। তাই একটু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। তারপর আস্তে বলেছিল খোকাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলুম,

কদাচ তো দাদাবাবু বলিনি! বউদিদি আর কী বলব? বউমণি বলব। না করোনি।

এরপর আর 'না' করে পম্পা কোন মুখে ?

সুখদার মা দ্বিতীয় মুখস্থ লাইনটা বলল, একবার নয় বাকি দর্শনটা দিয়ে এস। হা পিত্যেশ করে বসে আছে বুড়োবুড়ি।

অতএব মাথার আঁচলটা আর একটু টানা। পায়ের ভার আর একটু লঘু করে আরো শব্দহীন পদক্ষেপ।

বেশিক্ষণ যেতে হল না। সিঁড়ি উঠতেও হল না। দোতলার ঘরটর সবই এখন তালাবন্ধ হয়ে আছে। ভাগ্য বিড়ম্বিত দুই বুড়োবুড়ির এখন একতলাতেই স্থিতি।

কিন্তু সত্যিই কি ওরা খুবই বুড়োবুড়ি? পঞ্জিকা, ক্যালেণ্ডার, জন্মপত্রিকা, এরা তো সেকথা বলে না। তবু বসে আছেন দুটি নিতান্তই বুড়োবুড়ি।

বয়েসটাকে চড়চড়িয়ে বাড়িয়ে দিয়ে বার্ধক্যের কোঠায় পৌঁছে দেবার একটি কলকাঠি আছে একজনের হাতে। তিনি ইচ্ছেমত সেই কলকাঠিটি নেড়েচেড়ে কৌতুকে বিভোর হন। অনেকরকম কর্মচারী আছে সেই 'একজনটির'। তারাই কাজ এগিয়ে দেয়। যেমন দিয়েছিল এদের সেই লাগামছাড়া উল্লাসে উল্লসিত উৎসব রজনীর পরের দিন।

যারা সেদিন এদের দেখেছিল, তারা এখন দেখে ভাবে সত্যিই কি এরা তাঁরা? কালো চশমা পরা হুইল চেয়ারে বসে থাকা এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকই কি সেদিনের প্রভাতসূর্য রায়? আর কপালে রেখা পড়ে যাওয়া, ঝুলে পড়া ভঙ্গী মহিলাটিই একদার পূর্ণিমা রায়? নামের সঙ্গে যার চেহারার ছিল আশ্চর্য সামঞ্জস্য!

বিশেষ করে সেই দিনটির কথাই বলতে হয় – সেদিন বেশেবাসে, চলনেবলনে, কর্মতৎপরতায়, অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায়, আর হাস্য-পরিহাসে ঝকঝকে উচ্ছল প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই যে রমণী প্রায় পূর্ণ যুবতীর মতই ঝলসে বেড়াচ্ছিল? এ কী সে? না কি তার কঙ্কাল? তার প্রেতছায়া?

সেদিন ওই বিরাট কমপাউণ্ডে এহদ্দ ওহদ্দ প্যাণ্ডেল করা হয়েছিল।

মানুষজন আসছে-যাচ্ছে, খাচ্ছে, দেখা করছে, সবকিছুই সুশৃঙ্খল। আলাদা আলাদা বিভাগ করে, আলাদা তোরণ করে।

পূর্ণিমা রায়কে দেখা যাচ্ছে সমস্ত তোরণে। সব বিভাগে বিভাগে। তার সঙ্গে কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে, কী ব্যাপার? না খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন যে? তাড়া আছে। রাখুন তো আপনার তাড়া। দেখি কেমন যান।

এই যে এতক্ষণে আসা হল গিন্নীর। সারাদিন কী এত কাজ তোর? এই যে এই শাদা বেনারসীখানা বউ বরণ করতে কর্তার কাছে বাগিয়েছি বুঝলি? বোকা ভদ্দরলোকটিকে বুঝিয়েছি, এখন শাশুড়ি হচ্ছি রঙচঙে পরব না কি? এখন ভাল ভাল সাদা রঙের শাড়িটাড়ি দরকার।

আবার হেসে উঠে বলে ওঠা, ওই বলে তো বাগালাম, তা বলে কি এখুনি রঙিনগুলোকে বাতিল করে দেব না কি? ইস! এত বোকা নই বাবা! বউ এসে ভাববে বুড়িসুড়ি শাশুড়ী! ওর মধ্যে নেই আমি। একবার ছাড়লেই ছাড়া। তোদের জামাইবাবু বলে কিনা, যা দেখছি, বউ এলেই তার সঙ্গে সখী পাতিয়ে ফেলে, তুমি এরপর উড়ে বেড়াবে। দেখি তো শহরের হাটেবাজারে।.... আমিও বলেছি বেড়াবই তো। চিরদিন তোমাদের এই বনেদীবাড়ির খাঁচায় বন্দী হয়ে বসে ছোলা খাচ্ছি আর 'হরেকেষ্ট' বলছি। এবার পৃষ্ঠবল পাব। পাশটাশ করা আপিসে চাকরি করা বউ।

কিন্তু এই সাবেকী বাড়িতে অফিসে চাকরি করা বউ ঢুকতে আসছে যে?

সে অনেক কথা!

ভাব-ভালবাসার ব্যাপার?

না না! পাগল! এ বাড়ির ছেলে অমন বেসামাল হতে যাবে?

তবে? ওই তো, সে অনেক কথা। তা সেসব কথা এখন থাক।

এখন দেখা যাচ্ছে পম্পা নামের অফিসে চাকরি করা মেয়েটা সেকেলে বউদের মত মাথায় আঁচল দিয়ে ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে এসে নম্রভাবে প্রণাম করল অকালবার্ধক্যের ভারে ভারাক্রান্ত মানুষ দুটোকে।

অকালেই হোক, আর যে কারণেই হোক, বার্ধক্য যখন এসেই গেছে, সে তার কাজ করবেই। বুড়োবুড়ির মতই সেন্টিমেন্টাল করে দিয়েছে। কথা বলতে গলা কাঁপে, হাত ধরতে হাত কাঁপে।

কালো চশমায় চোখঢাকা প্রভাতসূর্যর গলা থরথরিয়েই উঠল। শূন্যে হাতটা বাড়িয়ে কাঁপা গলায় বললেন, এসেছ মা? সকাল থেকে হাঁ করে— কথা শেষ করতে পারলেন না।

শূন্যে হাত বাড়নো দেখেই বোঝা যাচ্ছে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। আর 'হুইল চেয়ার' বলে দিচ্ছে চলৎশক্তিও হারিয়েছেন।

পম্পা সেই বাড়ানো হাতটার ওপর নিজের হাতটা আলতো করে একটু বুলিয়ে সেইভাবেই বলল, স্নানটান করে আসি কেমন? সারাদিনের বাইরের ধূলো।

প্রভাতসূর্য হতাশ গলায় বললেন, কেন যে এখনো তুমি ওই তুচ্ছ একটা চাকরি নিয়ে পড়ে আছ মা! লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষে মাগা!

চাকরি নিয়ে আক্ষেপটা নিত্যদিনের। পম্পার তাতে ভূমিকা নীরব শ্রোতার। কিন্তু আজ হঠাৎ নতুন এই আপ্তবাক্যটি সংযোজিত হওয়ায় পম্পার মুখে ফুটে উঠল একটু যেন ব্যঙ্গ হাসির রেখা। আর নীরব শ্রোতার ভূমিকাটা ভুলে গিয়ে বলে ফেলল, লক্ষ্মী? বলুন যে, 'অপয়া অলক্ষ্মী'।

ছি ছি ওকথা বল না মা। পূর্ণিমা প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমাদের অদৃষ্ট!

তোমার দোষ কী? সর্বসুলক্ষণা মেয়ে তুমি, কুষ্ঠিতে 'রাজরানী যোগ'। তা সে কুষ্ঠি তো ফললও। আমাদেরই পূর্বজন্মের পাপে – চোখ মুছতে লাগলেন।

পম্পা ভাবল বলতেই হবে এঁরা বিশেষ উদার। অন্য যাবতীয় ব্যাপার তো যথেষ্ট সেকেলে মনোভঙ্গী। 'ভাগ্য', 'পূর্বজন্ম', 'ঠিকুজি কোষ্ঠি' ইত্যাদি এখনো তো সংস্কারের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসে আছে। তথাপি বউকে অপয়া অলক্ষ্মী না বলে নিজেদের ভাগ্যকে দোষী করা। এর থেকে উদারতা আর কী হতে পারে? কিন্তু ... কিন্তু এতটা উদার তো না হলেও পারতেন। পম্পার পক্ষে এটা অসুবিধে নয়। ভাল রকম অসুবিধেই।

তা এসব তো মনের মধ্যেকার কথা। মুখে আস্তে বল, নিজেকে তো আমি তাই ভাবি।

না, না, কখোনা তুমি এসব ভাবতে বসবে না মা। তুমি আমার লক্ষ্মী। আমাদের এই শ্মশানপুরীতে প্রাণ! যাও মা চানটান করে এসে চা-জলখাবার খাও সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছ। ওগো, তুমি যাও না, একটু দেখগে না গিয়ে, কী দিচ্ছে-টিচ্ছে।

'ওগো'টি অবশ্য এসব দেখতে টেখতে অপারগ নয়। যা কিছু ভাঙন চেহারায়। অন্ধ হয়ে যাওয়া স্বামীর খাওয়া-দাওয়া যাবতীয় তদারকি তো তিনিই করে থাকেন। খাইয়ে দিতেন, তবে ক্রমশ প্রভাতসূর্য বলতে শুরু করেছিলেন, হাতে করে মেখেটেখে মুখে না তুললে, খাওয়ার কোন স্বাদ পাওয়া যায় না।

অতএব সেই থেকে হাতে করে মেখেটেখে খাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে পূর্ণিমা সেই হাতের কাছাকাছি থাকেন, এগিয়ে দেন, কোনটা কি চিনিয়ে দেন, মাছের কাঁটা বেছে দেন। যদিও ওই কাঁটা-ফাটার ভয়ে প্রভাতসূর্য নিষ্কণ্টক জিনিস মাংসটাকেই বেশি পছন্দ করেন। সেটাই প্রায় নিত্য খাদ্য। তো আগেও তো তাই ছিল। উপরন্তু 'কণ্টকযুক্তরা'। উনি এই, হাতে করে মেখেটেকে খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করা অবধি, পম্পা কৃতজ্ঞতায় বিগলিত। নচেৎ রবিবারে রবিবারে 'খাইয়ে দেওয়াটা' তো ছিল পম্পার ডিউটি!

পূর্ণিমা বলতেন, আজ আমার ছুটি। আজ তুমি 'ডান হাতে' খাও।

পম্পা কাঁটা হয়ে যেত। সত্যি বলতে, শনিবার সন্ধ্যায় এই এসে পৌঁছনোর পর থেকেই, তার ভাবনা শুরু হত, পরবর্তী দিনের 'ডিউটি' স্মরণ করে। যদিও এতে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়েছে, নিজেকে ছোট মন ভেবেছে। একজন অন্ধ অসহায় মানুষের সেবা, এতো মানুষের ধর্ম। বিশেষ করে মেয়েদের।

কিন্তু মন কী যুক্তি মানে? অতএব পরবর্তী ব্যবস্থায় সেই মনটা কৃতজ্ঞ।

এবাড়িতে টেবিলে খাওয়ার চল ছিল। তবে সেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে। টেবিলে খেতে বসতেন টগবগে তাজা রীতিমত ভোজনবিলাসী গৃহকর্তা, এবং তাঁর পুত্র। একমাত্র পুত্র। সে কিন্তু অল্পাহারী। এ নিয়ে প্রতিদিন বাপের অসন্তোষ ছিল।

মহিলাদের মাটিতে আসন পেতে ব্যবস্থা। ভিতরের খাবার ঘরে, দু-একজন আশ্রিতা মহিলা, যাঁরা সম্পর্কসুত্রে মান্যের, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে খেতে বসতেন পূর্ণিমা। এখনো তাই

বসেন, শুধু নতুন সংযোজন, সপ্তাহে দেড়দিন পম্পা।

আগে তো – মানে পম্পা এবাড়িতে আসার আগে, কর্তা বলেছিলেন বউমাকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসাব, তা এখন থেকেই বলে রাখছি। তখন যেন বাধা দিতে এসো না।

শুনে পূর্ণিমা একটু রেগেই গিয়েছিলেন। আমার আবার কিসের বাধা? তোমাদেরই বাড়ির প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্নেই চলে আসছি। সব কিছু 'শাশুড়ী পছন্দ করবেন কিনা' ভেবে ভয়ে কাঁটা। তিনি মরে গেছেন, স্বর্গে গেছেন, তবু সেই প্যাটার্নই মেনে আসছি।

দীপ্তসূর্য হেসে খেলে বলেছিল, আচ্ছা বাবা, যখন এক কথা বললে একশো কথা শুনতে হয়, তখন সেই একটা কথাই বা বলতে যাও কেন? যা করব ভাববে তা করবে। আগে ভাগে মাকে বলতে বসার কী দবকার বুঝি না।

কর্তা আর গিন্নীর মধ্যে চোখে চোখে হাসির বিদ্যুৎ খেলেছে। সে বিদ্যুতের অর্থ, 'কী দরকার' তা ভবিষ্যতে বুঝবে যাদু।

তা সেসব আর বুঝতে হল না তাকে। আর গৃহকর্তার ঘোষণাও কাজে লাগল না। সেই বউমাও পূর্ণিমা কোম্পানীর সঙ্গী। তবে পুরোপুরি নয়। পংক্তি ভোজনে বসতে হয় তাকে শ্বশুরের মাসি, আর শাশুড়ীর পিসতুতো দিদির সঙ্গে। কারণ পম্পা তো তাদের হেঁসেলেরই শরিক।

পম্পার থালা ঘিরে অবশ্য বাড়তি অনেক বাটি পড়ে। রেকাবে মিষ্টির সম্ভার। যেগুলো খাওয়া পম্পার পক্ষে অসাধ্য বলে সরিয়ে রেখে রেখে তবে খেতে বসতে হয় পম্পাকে। অবিরতই তাদের অনুরোধ উপরোধের ধাক্কা সামলে সামলে কোনমতে উদ্ধার হওয়া।

শ্বশুরের মাসি বলেন, উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে নাতবউমা, আর তুমি একটু দই পায়েস খেতে পারছ না?

তাঁর এই কষ্টকল্পিত স্থূল রসিকতায় পাত ছেড়ে উঠে চলে যেতে ইচ্ছে করে পম্পার। কিন্তু সৌজন্য বলে কথা! ভাবে, আহা ওই অবান্তর কতকগুলো বাটি রেকাবির বস্তুসম্ভার যদি ওনাদের পাতে ধরে দেওয়া যেত, খুশিই হতেন ওঁরা।

তবে শনিবার রাত্রির ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ সহনীয়। ও 'মাসি' আর 'দিদি'দের রাত্রে আর পম্পার সঙ্গে পংক্তিভোজনে দেখতে পায় না পম্পা। কিন্তু পম্পাই বা রাত্রে কী খাবে? কত খাবে? এই এখন 'আহা কোনকালে বেরিয়েছে' বলে চায়ের সঙ্গে 'টা'য়ের ব্যাপারটা তো কম হয় না।

যাইহোক, রাত্রিটা তাড়াতাড়ি এসে যায় এই ভগবানের দয়া। রাত আছে বলেই মানুষ বেঁচে আছে। বেঁচে থাকার রসদ সঞ্চয় করবার সময় পায়।

সপ্তাহে দুটো রাতের জন্যে দোতালার সব থেকে সাজানো-গোছানো, সব থেকে ভাল ঘরখানার তালা খোলা হয়। যে ঘরের মধ্যে থেকে পিছনে চওড়া একখানা মার্বেলমোড়া

বারান্দা, অন্দরমহলের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। পিছনের যে অংশে আম্র-কাঁঠাল-সুপুরি গাছেদের অবস্থান, আর তার পিছনে গোয়াল, সেদিকটাই এই বারান্দা থেকে দৃশ্যমান।

রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই বারান্দাটায় দাঁড়ালে মনে হয় যেন কোন গণ্ডগ্রামের ছবি দেখছি। তবে নিরাপত্তার অভাব নেই। পুরো বারান্দাটা গ্রীল এবং কাঁচ দিয়ে মোড়া। মুখ মাথাটা যদি খোলা আকাশের দিকে বাড়াতে চাও তার জন্যে অবশ্য, জানলা বসান আছে। সেই সব জানলায় আবার ভিতর থেকে চাবির ব্যবস্থা। তা সে চাবিঘরের অধিকারীর কাছেই থাকে। এককথায় ভিতর বার দুদিকেই পারফেক্ট নিরাপদ ব্যবস্থা।

এ ঘর 'দীপ্তসূর্য' নামের সেই হতভাগ্য ছেলেটার। যার বৃহৎ ছবিটা ফুলের মালা গলায় দিয়ে দরজায় মুখোমুখি উঁচু দেওয়ালে ঝুলছে। সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন মালা বদলান হয়। রাত্রে এই ঘরেই শুতে আসে পম্পা। সেই হতভাগ্য যুবকের উত্তরাধিকারিণী।

চাবির গোছা হাতে নিয়ে সুখদার মা আসে সঙ্গে। দরজাটা খুলে দেয়। ও ঘর তার হেফাজতে। বরাবরই ছিল এখনো আছে। প্রতিদিন নিখুঁত করে ঝাড়ামোছা তার ডিউটি। আর প্রতি রাত্রে দরজাটা খুলে দেওয়ার সময় আবার একটি মুখস্থ লাইন বলাও তার ডিউটি।

'ঘরের মেঝেয় এক কোণায় আমি পড়ে থাকি না বউমণি! এই বিরোদ ঘরের মধ্যে একা ছেলেমানুষ।'

পম্পা তার মুখস্থ লাইনটা আওড়ায়, না না আমি তো বেশ থাকি! দরজা-টরজা তো বন্ধ থাকে।

মা, বাবু দু'জনাই খুঁতখুঁত করে। বলে, তুই ভাল করে বুঝিয়ে বলে-কয়ে বউমার ঘরের মেঝেয় একপাশে পড়ে থাকগে যা। ভয়-টয় পাবে।

ওঁদের বাতিক। এত বড় মেয়ে আবার ভয় পাব কী! তুমি তো পাশের ঘরেই থাক।

ঘরে আবার থাকতে গিছি। ওই তোমার বন্ধ দুয়োর গোড়াতেই পড়ে থাকি।

কী মুশকিল। আচ্ছা কেন? এত ঘরই খালি পড়ে আছে।

তো এও তো ঘরই বউমণি। বনেদীবাড়ির এই দরদালানটাই তো পাঁচখানা ঘরের তুল্য। জানলা দরজা বসানো। আগে আগে কাজে কম্মে এই দালান জুড়েই মানুষজন শুয়েছে।

পম্পা কোনদিন প্রশ্ন করেছিল এত কী কাজকর্ম মাসি?

মাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। ওমা! ঠাকুমা থাকতে বারোমাসে তের পার্বণ ছিল না? তা পর গে নিত্যি তেনার গুরু আসা, গুরুভাই-ভগ্নীদিগের র‍্যালা! খোকার পৈতেয় কী ঘটা। বাড়ি সর্বদাই রমরম করতো। বারোমাস 'এসোজন বসোজন'। খোকার জন্মতিথিতে তিথিতেও ঘটা কম হত না। ভাল দিনে জন্ম! জগন্নাথের চানযাত্রার দিনকে ঠাকুমা গত হবার পর অবিশ্যি তেমন আর থাকলনি। ওনার বাপের বাড়ির দিকের কতজনা আসতো

যেত, থাকত। তারা আর তেমন রইলনি। তো মা বাবুর ব্যাভার কিছু খারাপ ছিল না। তারাই বোধহয় ভাবল, আর কোন সুবাদে আসি। তো আবারও তো জমজমাটি হবার কথা! ভগবান যে এমন করবে —

ধরলে কথা থামায় কে। ভগবানের দুর্ব্যবহারজনিত আক্ষেপ চলতেই থাকে।

ওঃ। কেন মরতে যে কোনো প্রসঙ্গ তুলে বসি। ভাবে পম্পা।

সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠে আসে পম্পা সুখদার মায়ের সঙ্গে, পিছন পিছন আরও একজন উঠে আসে। সে হচ্ছে সেই বুড়ো লোকটি। গাড়িবারান্দায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই যে নুইয়ে নমস্কার করে। এই লোকটিই শূন্য দোতলার রাতের পাহারাদার ।

বুড়োকর্তার আমলের লোক এই বুড়ো। পূর্ণিমাকে বলে 'বউমা'।

আচার-আচরণে আগেকার আমলের সহবত শিক্ষার ছাপ। পিছু পিছু উঠে আসে বটে কিন্তু সিঁড়িতে বেশ কয়েক ধাপ দূরত্ব বজায় রেখে। আর যে ভৃত্যবর্গ আছে —(থাকতেই হবে। এতবড় বাড়িটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়তো।) তাদের মত কদাচ গেঞ্জি পায়জামা পরে বেড়ায় না। ফর্সা ধুতি আর মেরজাই।

লোকটার একটা নিজস্ব নাম আছে অবশ্যই । কিন্তু পম্পা ওকে মনে মনে বলে রহমন। পম্পার মনে হয় এই নামটাই যেন ওকে ঠিক মানায়। ওই ঋজুদেহী শীর্ণ স্বল্পবাক বৃদ্ধ যেন কোনো গল্পের পাতা থেকে উঠে এসেছে।

এতদিনের মধ্যে পম্পা লোকটার গলার স্বর কেমন তা জানে না। দেখলে শ্রদ্ধা আসে। কিন্তু এই লোক এই মস্ত দোতলাটার রাতের পাহারাদার একটু হাসি পায় পম্পার। গায়ে একটা টোকা মারলেই তো পড়ে যাবে। আবার ভাবে, বোধহয় বিশ্বস্ততাই ওর যোগ্যতা। আর আত্মবিশ্বাসই ওর শক্তি।

তিন তিনটে লোকে উঠে আসে , তবু দালানে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভাতসূর্যর আক্ষেপের কথাটা মনে পড়ে যায় 'শ্মশানপুরী!'

খুব মিথ্যে নয়। দালানের ধারে ধারে সারিবন্দী তালাবন্ধ দরজা, যেন ওই কথাটাই ঝালিয়ে দেয়।

আশ্চর্য! এত বড় বাড়ি বানায় কেন লোক? পম্পা ভেবে পায় না। পরিবার-পরিজনের পরিধিটা তাদের কত বিশাল থাকে? প্রভাতসূর্যর ঠাকুর্দা জয়সূর্য নাকি এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন অকালমৃতা স্ত্রীর নামে। তবে? তাঁর তো নাকি মাত্র একটিই ছেলে ছিল উদয়সূর্য। প্রভাতসূর্যের বাবা! অথচ বাড়ি বানিয়ে রেখেছেন এই বিরাট।

ভগবান জানেন, কারা থাকত ওই সব ঘরে ঘরে। আর ওই তালাবন্ধর ওপারে এখন আছেটা কী? কী আর। যতসব পুরনো পুরনো মজবুত কাঠের আসবাসপত্র, দাগ-ধরে-যাওয়া বড় বড় আয়না, চওড়া চওড়া -ফ্রেমে বাঁধানো কিছু ছবি। বোধহয় বিলিতি আর্টিস্টদের আঁকা বিখ্যাত কিছু ছবির প্রিন্ট। সিঁড়ির দেওয়াল জুড়ে তো ওই ধরনেরই নমুনা।

আবার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, না, না! ওই সব ঘর হয়ত এই ঘরটার মতই সাজানো-গোছানো! ওঁরা তো আগে এই দোতলাতেই থাকতেন। যাঁরা এখন নিচের তলায় পড়ে আছেন রোগব্যাধির উপযুক্ত আসবাব আয়োজন নিয়ে। বাড়ির কর্তাগিন্নী।

তার মানে দোতলায় ওঁদের সাজানো ঘর সাজানো থাকতে থাকতেই জীর্ণ হতে থাকবে। যেমন ওঁরা জীর্ণ হতে থাকবেন, ওই হুইল চেয়ার, রিবলভিং খাট, আর অন্য অনেক কিছু এটা সেটা নিয়ে।

ওঃ! আমায় বলে কিনা, 'তুমিই এ সংসারের সব। এই রাজ্যপাট সব তোমার।

রক্ষে কর বাবা! এই অক্টোপাসের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারলে বাঁচি। সেই বাঁচার স্বপ্নটাই দেখতে থাকে পম্পা, দিনে রাতে। এবাড়ির বাগানের ওই সব ফুলগুলো ছাড়া আর কোনো দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছেই করে না পম্পার। নড়তে চড়তে যা কিছু চোখে পড়ে দেখলে কেমন একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব আসে।

এত জিনিস কেন করে মানুষ? টাকা থাকলেই বস্তুপুঞ্জের বোঝা বাড়িয়ে চলতে হবে? মানে হয় কিছু? এইসব বৃহৎ বৃহৎ আসবাবপত্র, রাশি রাশি বাসন বিছানা ড্রাম বারকোষ বঁটি কাটারি কী আছে কী নেই। ডাঁই করে জমানো আছে সিঁড়ির ঘরে দালানের গলিতে, ভাঁড়ার ঘরের উঁচু উঁচু তাকে। সবই বৃহৎ বৃহৎ।

পুরনো পুরনো এই অর্থহীন বস্তুর বোঝার দিকে চোখ পড়লেই পম্পার পক্ষে গা কেমন করে ওঠাই স্বাভাবিক। পম্পা মানুষ হয়েছে অভাবের মধ্যে, অনটনের মধ্যে।

শোবার ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে, আর ভিতরে ঢুকে আলোটা জ্বেলে দিয়ে সুখদার মা নিত্য নিয়মেই বলল, তাহলে ঘরের বাইরেই শোব বলছ?

পম্পা মনে মনে হাসল। ভাবল টেপরেকর্ডার একখানি। মুখে ও হাসল, বলছি।

মেঝের একধারে পড়ে থাকতুম।

তোমায় তো বলেইছি বাপু, একা শুতেই আমার সুবিধে হয়।

তা ভাল। ঘুমের আলোটি জ্বেলে রেখো।

আচ্ছা।

তবে দুয়োরটা দাও। ওপর নিচ ছিটকানি দুটো লাগিয়ে নাও। পেটের খিলটা তুলে দাও।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, বারোগুার দুয়োর খুলবে নাকি বউমণি?

একটু খুলি। রাতে ওদিকটা দেখতে বেশ ভাল লাগে।

সুখদার মা ঘেন্না দেওয়ার গলায় বলে ওঠে, ও আমার পোড়া কপাল। উদিকে আবার ভাল লাগার কী আছে।? গুচ্ছির গাছের ঝুপড়ি! অন্ধকার।

পম্পা অবশ্য ঘেন্না পেল না। বলল, তা হোক আমার খুব সুন্দর লাগে।

সুখদার মাও মনে মনে কথা কয়। বলে যেমন কপাল তেমনি শখ। অন্ধকার সুন্দর লাগে। একা শুতেই ভাল লাগে! আহা। কী জিনিসই খুইয়ে বসে আছ। তা যদি বুঝতে।

মুখে বলল, তো জানলা-মানলা খুলোনি বাপু। কে কেমনে নজর রাখে। মাথার ওপর ছাতা নেই।

পম্পা আর কথা বাড়াল না। বলল ঠিক আছে। খুলব না।

তাই ভাল। কাঁচের মধ্যে দিয়ে তো সবই দ্যাখা যায়।

পম্পা চেষ্টা করে একটা হাই তোলে।

সুখদার মা তাড়াতাড়ি বলে, শুয়ে পড় মা। সারাদিনের রপটানির শরীর। তবে এও রহস্য, তোমার কেন চাকরি করে মরা। সব্বাই আমরা ভেবে কূল পাই না।

পম্পা একটু হেসে বলে, আচ্ছা আরো ভাবগে, যদি কূল পাও। দরজাটা বন্ধ করার ভঙ্গি করে। না করলে তো নড়বে না বুড়ি।

বেশ সঙ্গিনীটি জুটেছে আমার। একটু যেন কৌতুকের হাসি হাসল পম্পা। ভাবল, বড়ই বিরক্তিকর। তবু ওর মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা আছে বলেই সহ্য হয়ে যায়। ওর খোকার ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখে, আর আঁচলে নাক মোছে।

দরজাটা বন্ধ করেই আলোটা নিবিয়ে দিল পম্পা। নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে গেল চারিদিক। এই ভাল। আলো জ্বালা থাকলেই তো ওই উঁচু দেওয়ালে ঝুলে থাকা ছবিখানা দেখতে পাওয়া যাবে। বড় অস্বস্তিকর। কিন্তু শুধু অন্ধকারই কি সব সমস্যা দূর করতে পারে? টাটকা মালার ঘন গভীর গন্ধটা ঘরের বাতাসে নিথর হয়ে ছিল না? আর এখন জানলাগুলো খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসে আলোড়িত হয়ে সেই সুগন্ধভা ব পম্পার ওপর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল না?

মস্ত জোড়াখাটে বিলাসবহুল শয্যা। বড়লোকের একমাত্র পুত্রের বিয়ের সময় যেরকম বিছানা তৈরি করানো হয়, তেমনিই করানো হয়েছিল। সেটাই বজায় রেখে আসা হচ্ছে।

পম্পার ওপর আদেশ এই খাটবিছানায় শুতে হবে। প্রথমদিনে পূর্ণিমাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন পম্পাকে হাঁপাতে হাঁপাতে। বলেছিলেন তুমিই একটু ভোগ কর না! তাতেও আমাদের প্রাণের তৃপ্তি। সবই তো তোমার উপলক্ষেই করানো।

কিন্তু পম্পার পক্ষে কি সম্ভব, একা ওই বৃহৎ রাজশয্যার শোওয়া? পম্পা অন্ধকারেই বারান্দায় দিকের দরজাটা খুলল। কাঁচে ঘেরা সেই খানিকটা অন্ধকারের রাজ্যে পা ফেলে ওর প্রথম মনে হল, ভাগ্যিস এই দিকটা ছিল।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে সুপুরি গাছগুলোর হাওয়া য় আন্দোলন বোঝা যাচ্ছে। তার পিছনে একটা চালাঘর থেকে মৃদু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। গোয়ালের কাছে গোয়ালা দম্পতীর সংসার। এদের বদান্যতাতেই তাদের এই সুখের বাসা। দেখা করতে এসেছিল সেই বুড়ি। জনে জনে কতজনই যে দেখা করতে অথবা দেখতে আসে পম্পাকে।

বড় যন্ত্রণাদায়ক এই দর্শন দেওয়াটা। সবাই তো একবার করে আক্ষেপ বাক্য আর হতাশ নিঃশ্বাস খরচ করে যাবেন।

অনেকক্ষণ এই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে ঘরে চলে এল পম্পা। দরজাটা

বন্ধ করল। তারপর বিছানা থেকে একটা বালিশ টেনে নিয়ে দেয়ালধারে পাতা বড় সোফাটায় শুয়ে পড়ল। আর নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, আবার কালকের রাতটাও এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কাটাতে হবে।

কিন্তু ঘুম আসা কি এতই সহজ? দৃশ্যটা তাকে তার চির অভ্যস্ত সেই ছোট্ট ঘরের অতি সাধারণ শয্যার ধারে এনে দৈবাৎ দাঁড়ায়। সেই দৃশ্যটা যেন এখানে ওত পেতে বসে থাকে তন্দ্রা আর ঘুম, ঘুম আর জাগরণের মধ্যে!

একটা সুন্দর বড় গাড়ির মধ্যে এক বয়স্ক দম্পতীর সঙ্গে একটি সদ্যবিবাহিত নতুন বরকনে। কনের পরনে প্রায় আগাগোড়া সোনার সুতোয় গাঁথা ঝকঝকে বেনারসী শাড়ি, বরের পরনে সাদা বেনারসী জোড়। মহিলাটির পরনেও সাদা বেনারসী, হাতে পূজোর প্রসাদী ডালা। কপালের মস্ত সিঁদুরের টিপটি ঘামে আর তেলে কপাল মাখামাখি। মুখে আনন্দ বিহ্বল প্রসন্নতার হাসি।

বয়স্ক পুরুষটি হলেও, ভঙ্গীতে বয়সের ছাপ নেই। হেসে হেসে বলছেন, বউমাকে এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছ তো।

মহিলাটি হেসে বললেন, বোঝাবার সময় পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? তারপর বললেন, আমার শ্বশুরবাড়ির এই নিয়ম, নতুন বউকে আগে মা উত্তরবাহিনীর মন্দিরের চাতালে দুধে আলতার পাথরে দাঁড় করিয়ে বরণ করে নিয়ে, তবে বাড়ি গিয়ে বরণ। হেসে বললেন, তোমার শ্বশুরবাড়িরও। ওই যে বুড়ো পুরুতমশাই, উনি আমার বিয়েতেও –

কথার মাঝখানে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার।

বাজ পড়ল? নাকি আকাশটা মাথায় ভেঙ্গে পড়ল?

এই শব্দ আর এই দৃশ্য। যেন পম্পাকে তাড়া করে এই ঘরটাতেই এসে হাজির হয়। পম্পা ধড়মড় করে উঠে বসে। আবার শুয়ে পড়ে।

পম্পা রায় আর পূর্ণিমা রায় — দুই বয়সের দুই রমণী আজ পর্যন্ত ভেবে কূল পায়নি সেই দৈত্যের মত লরিটা হিংস্র আক্রোশে ছুটে আসতে আসতেও, কী করে এমন নিখুঁত অপারেশনটা করে ফেলতে পারল?

আলাদা হয়ে গেল চারখানা মানুষ!

দুই রমণী ছিটকে গাড়ি থেকে রাস্তায় পড়ে গিয়ে শুধু ঘন্টা কয়েকের জন্যে জ্ঞান হারাল মাত্র, তার বেশি কিছু না। ভিড়ের মধ্যে তাদের গায়ের গহনার বোঝার ভার হালকা হয়ে গেল সেটা কোনো ব্যাপার নয়।

কিন্তু পুরুষ দুজন?। চুরমার হয়ে যাওয়া গাড়িটার মধ্যে থেকে যাদের বহু কষ্টে টেনে বার করা হল? তাদের মধ্যে একজন হাসপাতালকে বুড়ি ছুঁয়ে স্বর্গে আর অপরজন দীর্ঘকাল হাসপাতলে বাস করে অবশেষে একদিন স্ট্রেচারে করে বাড়ি ফিরলেন, দৃষ্টিশক্তি এবং চলৎশক্তি হারিয়ে।

'মায়ের বাড়ি যাচ্ছি–' বলে স্বেচ্ছায় গাড়ির চালকের ভূমিকাটা নিয়েছিলেন তিনি, চালককে অন্য গাড়িটা দিয়ে আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পূজার উপকরণ ভার নিয়ে।

কী সুশৃঙ্খলেই সে সেইসব দ্রব্যসম্ভার নিয়ে মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছিল। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি হয়নি। অথচ —

পূর্ণিমা রায় হাহাকার করে বলেছেন, মা গো অজান্তে যদি তোমার পূজোয় কোনো অঙ্গহানি ঘটে থাকে তুমি আমায় নিলে না কেন? এমন ভয়ঙ্করী নিষ্ঠুর হলে কেন? কিন্তু পাথরের মূর্তির কাছ থেকে কে কবে প্রশ্নের উত্তর আদায় করতে পেরেছে?

সারা রাতে বারে বারেই ওই শব্দ আর দৃশ্যটা শুনতে পায় আর দেখতে পায়।

আর বিধ্বস্ত ঘুমের রাতটা পার করে যখন কাঁচের জানালা থেকে ভোরের আবাস দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পম্পা তখন সঙ্কল্প করে, ওদের বলব, রোজ রোজ এই টাটকা ফুলের মালা ঘরে দেবেন না। আমার ঘুম হয় না। কিন্তু দিনের আলোয়, মানুষের মুখোমুখি এমন একটা অদ্ভুত কথা বলা যায়?

তাই রবিবার সকালে উঠে মনে হয়, আবার একটা রাত। কবে পম্পা এই দুর্বহ কুসুমগন্ধ ভারাক্রান্ত রাতের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে?

পম্পার এই সপ্তাহান্তিক ভ্রমণ অফিসের অনেকেরই নজর এড়ায় না। অনেকে অনেক কিছুই বলে। যার যেমন কল্পনাশক্তি। ওই গাড়িটাই যে বড় গোলমেলে জিনিস!

শুনেছি মিসেস রায়ের কোনো এক মামা আছেন খুব বড়লোক, উইক এণ্ডটা সেখানেই কাটাতে যান।

মামা? হুঁ তা অবশ্য এরকম বেওয়ারিশ সুন্দরী মহিলাদের ভাগ্যে মাঝে মাঝে এমন 'ম্যামু' 'কাকু' জোটে।

আচ্ছা, মহিলা যান কোথায় বলুন তো? মানে নিজের বাড়ির দিকে বলে তো মনে হয় না।

নিজের বাড়ির দিকে? হে হে! এই আপনার সেন্স মশাই? মামু-কাকুর গাড়ি চেপে নিজের গরিব বিধবা মায়ের বাড়ি!

আহা কোনো ভবিষ্যতের স্টার নয় তো? কোথাও সুটিং-ফুটিং করতে যান না তো?

প্রত্যেক শনি রবি সুটিং? কোন স্টুডিওয় দাদা?

হে হে ডিরেক্টরের ফ্ল্যাটে হয়ত।

ধ্যেৎ! দেখলে এরকম মনে হয় না।

ওহে মশাই, বাইরে থেকে দেখেই যদি সব বোঝা যেত।

গাড়িটাকে পার্ক করে খানিকটা দূরে, লক্ষ্য করেছেন?

করেছি বৈকি।

তার মানে অফিসের কাউকে জানাতে চান না।

বাদে রত্নাকর মল্লিক। সেটা লক্ষ্য করেছেন তো?

তা করেছি বৈকি। সব সময়ই করছি। রূপবতী তরুণী বিধবা। ব্যাচিলারের কাছে এর থেকে লোভনীয় জিনিস আর কী আছে ভায়া?

মল্লিককে একদিন জিগ্যেস করলে হয়।

কী জিগ্যেস করবেন?

ওই যে মিসেস রায় শনিবারে শনিবারে অ্যামাবাসডরে চেপে কোথায় যান এবং সোমবার সকাল পর্যন্ত কোথায় থাকেন!

বলবে? তাহলে আপনি মল্লিককে খুব চিনেছেন। কী ডাঁটুস তা দেখেছেন? মানুষের প্রতি দৃকপাতই নেই। আঁতাতের মধ্যে ওই মিসেস রায়।

তাহলে বলছেন মিসেস রায় ভবিষ্যতে মিসেস মল্লিক হয়ে যেতেও পারেন।

পারেন মানে? অবধারিত। দেখে নেবেন।

কিন্তু ওই গাড়িবান? সে তার ক্লেম ছাড়বে?

ওই একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে বটে।

আচ্ছা মল্লিকই বা তাহলে ব্যাপারটাকে হাস্যবদনে সহ্য করে কী করে?

হাস্যবদনে? তাহলে তো খুব দেখেছেন। গাড়িটার দিকে কীভাবে তাকায় জানেন? পারলে ভস্ম করে ফেলে।

তার মানে রাইভ্যালটি একটু বেশি শাঁসালো! আর মিসেস 'শ্যাম কুল' দুই রাখছেন।

রহস্য।

জল্পনা-কল্পনা হার মানলেই 'রহস্য' বলে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এইসব সরকারি অফিসের 'শুধু কেরানী'রা ওর বেশি আর বেড়ে উঠতে পারে না। তেমন এনার্জিওলা যুবকও বিশেষ কেউ নেই।

মাত্র রত্নাকরই অবিবাহিত ও তরুণ। তবে বেচারীর ভাগ্যক্রমটি দেখ। জুটল যদি বা একটা. তো 'মিস' নয় মিসেস'।

রত্নাকর অফিসে এসেই চশমার ফাঁকে দেখল।

এখনো আসেনি। কী হল! ঘড়ির কাঁটায় আসে। অবশ্য মাত্রই মিনিট তিন-চার পার হয়েছে! তবু এটুকুও হতে দেখা যায় না।

দু-একজন উঁকিঝুঁকি মারছিল! হঠাৎ রাধামোহন কাছে এসে দাঁড়াল। এদিক -ওদিক তাকিয়ে বলল, মিসেস রায়ের আজ কী হল বলুন তো?

রত্নাকর প্রথম চায়ের পাত্রটা বেয়ারার হাত থেকে নিয়ে বলল, খুবই দুঃখের বিষয়, হাত গুনতে জানি না।

না মানে, ভাবছিলাম আপনি হয় তো জানেন।

রত্নাকর ভুরু কুঁচকে বলল, হঠাৎ এরকম ভাবনাটা ভাবতে গেলেন কেন?

না মানে–

থেমে গেলেন যে? মানেটা বলুন?

মানে এক জায়গায় বসেন–

এ ঘরে আরও লোক বসে। রত্নাকরের ভঙ্গীতে জেরার চিহ্ন। যেন ওর কাছ থেকে উত্তরটা আদায় না করে ছাড়বে না।

রাধামোহন বলল, আচ্ছা চলি।

সে কী? চলবেন কী? না না। হঠাৎ চললে তো চলবে না! জবাবটা দিয়ে যান।

কী মুশকিল! এর আবার জবাব কী?

থাকতেই হবে। প্রশ্ন থাকলেই জবাব আছে।

আহা বুঝছেন না? সকলেই আমরা বলাবলি করি– কী হতে পারে! বাঁধা নিয়মে এভাবে কে গাড়ি পাঠায়। আবার সোমবারে সোমবারে ফেরতও দিয়ে যায়।

–তাই নাকি? মিসেস রায়ই তাহলে আপনাদের এখন একটি প্রসঙ্গ ?

প্রসঙ্গ মানে? ঠিক বুঝলাম না!

রত্নাকর একটু ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে বলে উঠল, ঠিক বুঝলেন না? আচ্ছা, ওই তো উনি এসেই গেছেন। উনিই বোঝান।

উনি আবার কী! কী আশ্চর্য! এই যে নমস্কার, বলছিলাম, আপনি যে বড় আজ লেট? এমন তো হয় না। আচ্ছা চলি।

চলে যায় রাধামোহন।

কিন্তু পিছনে একটা হা-হা হাসির শব্দ না? ওঃ। আচ্ছা। ব্যঙ্গ। ঠিক আছে। অফিসের বুকে বসে, বিধবা মেয়েছেলের সঙ্গে প্রেম করা বার করছি তোমার শালা।

পম্পা বলল, আপনি হঠাৎ ওরকম অট্টহাস্য করে উঠলেন যে?

হাসি পেল।

অকারণ?

হতে পারে না? কত কিছুই তো অকারণ অহেতুক হয়!

গাড়িতে আসতে আসতে পম্পার মধ্যে যেন একটা চাপবাঁধা বিষণ্ণতা তাকে পাথর করে রেখেছিল, পম্পার মনে হচ্ছিল, আজ একটিও কোনো কথা না বলে, কাজ সেরে চলে যাবে। কিন্তু ঘরে ঢোকামাত্র যেই ওই উদ্ভাসিত মুখটা দেখতে পেল, আর ওই হা-হা হাসি শুনতে পেল, সেই পাথরের ভারটা যেন কোথায় পড়ে গেল। এখন ইচ্ছে হল, কথার পিঠে কথা ফেলতে। তাই কাঁধের ব্যাগটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল, কিন্তু শাস্ত্রে আছে কারণ বিনা কার্য হয় না।

মাঝে মাঝে শাস্ত্র ছাড়া কাজও হয় নাকি? ধরুন যেমন ভালবাসা! 'অহেতুক' হয় না? শেষের কথাটা অবশ্য একটু গলা নামিয়েই বলল। এবং বিশেষ, একটি ব্যঞ্জনা মিশিয়ে বলল।

ভিতরটা কেঁপে উঠল পম্পার। ওই ব্যঞ্জনা যেন লুঠেরার হাতের মত পম্পার দিকে এগিয়ে আসতে চায়। ধীরে ধীরে তিলে তিলে এগিয়ে আসতে আসতে, ক্রমশ যেন একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। পম্পা এখন কী করবে? পিছিয়ে গিয়ে উল্টোমুখো দৌড় দেবে? ছুটে ছুটে দূরে সরে যাবে?

পিছনে ফেলে আসা যে একটা জমাট অন্ধকারের পাহাড় অনেকখানি আকাশকে আড়াল করে রেখেছে, তার কাছেই গিয়ে আশ্রয় নেবে?

কিন্তু ওই লোকটা যে কী এক জাদুমন্ত্র জানে! ওর হাসি, ওর কথা, ওর চোখ, যেন সেই পাথুরে পাহাড়টাকে কুয়াশার মত ঝাপসা করে দেয়।

তবু পায়ের তলার মাটিটাকে শক্ত করে চেপে থাকতে চেষ্টা করল পম্পা। আর সেই চেষ্টাটাই ওকে প্রায় বোকার মত করে ফেলল। আর সেই বোকামির বশেই, ওই সুন্দর ব্যঞ্জনাময় বাক্যটির পটভূমিতে বলে বসল কিনা, এসেই চা? কবার হবে?

প্রসঙ্গ পাল্টানোটা রত্নাকরের নজর এড়াল না। মনে মনে একটু হেসে বলল য'বার জোটে!

জেনেবুঝে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন কেন?

রত্নাকর বলল, কারণ ওটাই মনুষ্যধর্ম।

ওটাই মনুষ্যধর্ম?

তাছাড়া কী? কে না আমরা জেনেবুঝে নিজের ক্ষতি না করি?

সব্বাই তাই করে?

সব—বা-ই। কেউ জ্ঞানে, কেউ অজ্ঞানে। অথবা অজ্ঞানের ভানে। ভাল করে ভেবে দেখুন। পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল পম্পার চোখের দিকে।

পম্পা তাড়াতাড়ি বলল, আপাতত এত দার্শনিক চিন্তার সময় নেই। ফাইলের ফিতে খুলতে যাচ্ছি।

তবু সেও কি একবার আলোভরা চোখে রত্নাকরের দিকে তাকিয়ে গেল না?

এতেও যদি রাধামোহন কোম্পানী বাজী ফেলতে না বসে, 'মিসেস রায় মিসেস মল্লিক হলেন বলে দেখে নেবেন 'আপনারা—' তবে আর কিসে বসবে?

মানুষ, তো ঘাস খায় না? হলঘরের অপর প্রান্ত থেকে সব কথা স্পষ্ট শোনা যাক আর নাই, যাক চোখের আলো? হাসির ব্যঞ্জন? দেখামাত্রই এক অলৌকিক দৃষ্টি বিনিময়?

বেলেঘাটার কমলা চক্রবর্তী সপ্তাহের তিন তিনটে দিন যেন একটা যমযন্ত্রণার মধ্যে কাটে।

শনিবার অফিসবেলায় সেই যে কোনোমতে দুটো খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়, তারপর থেকে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কোনো খবরের নাগাল পাবার উপায় নেই কমলার।

প্রথম দু-একবার কমলা পাশের বাড়ির টেলিফোন থেকে মেয়ের অফিসে ফোন করেছিল ঠিকমত সময় ফিরেছে কিনা জানতে। বারণ করে দিয়েছিল পম্পা। বলেছিল, কোনো মানে হয় না এই অস্থিরতার। কঘন্টা পরেই তো আসছি তোমার কাছে।

ছোটভাই সমু বলেছিল, মাকে ঢের বারণ করেছি দিদি, হ্যাংলার মত পরের বাড়ি গিয়ে টেলিফোন না করতে। তা শুনলে তো?

তা ছেলের বারণ না শুনলেও মেয়ের বারণ শুনতে বাধ্য হয়েছে কমলা।

অতএব সোমবার সন্ধ্যা থেকেই ঘরবার। এবং শেষ মুহূর্তে 'বার' টাই টানতে থাকে।

বাস থেকে নেমে পম্পা মোড় ঘুরতেই দেখতে পেল, মা যথারীতি মোড়ের কোণে শক্তি ব্যাটারির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য এ রোগটা আর যাচ্ছে না মার।

মেয়েকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি পিছু ফিরে বাড়ির দিকে চলে গেল কমলা। এই দ্রুত প্রস্থানের কারণ মাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই বকাবকি করবে পম্পা।

বাড়ি ঢুকেই পম্পা বলে উঠল, কী মা, আমায় দেখে অমন ভূত দেখার মত অ্যাবাউটটার্ন পিটটান দিলে যে?

শুনে চমকে উঠল কমলা। ভেবেছিল বুঝি সে মেয়েকে দেখতে পেলেও, মেয়ে তাকে দেখতে পায়নি। থতমত খেয়ে ভালমত কিছু ছুতো আবিষ্কার করতে পারার অভাবে বলে উঠল, চায়ের জলটা চড়াতে এলাম তাড়াতাড়ি। জনতায় যা সাতজন্ম দেরি হয়।

এটাও তাৎক্ষণিক চিন্তার ব্যাপার। ওই জনতাতেই কমলা অফিসের ভাত দেয়।

তো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

এমনি! কিছু না! এত গরম হচ্ছিল। বাড়ির মধ্যেটা যা ঘুপচি!

এই গরমে আমাকে এসেই গরম চা খেতে হবে? এক মিনিট দেরি সইবে না?

বাবাঃ! তুই যেন পুলিসী জেরা করছিস। সারাদিন খেটেখুটে এসেছিস।

হোপলেস। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রোয়াকের দেয়াল ধারে পাতা ফাটাচটা সরু বেঞ্চটার ওপর বসে পড়ল পম্পা। যে বেঞ্চটায় ঠিক এই ভাবে তার বাবা বসে পড়ত অফিস থেকে এসে।

সংসারের চেহারা নেহাতই জৌলুসহীন। বাড়িওলার বাড়ির একতলার একাংশ এই আড়াইখানা ঘরের সংসার।

কমলা চক্রবর্তী আর অজিত চক্রবর্তী তাদের জীবনযাত্রার প্রারম্ভে মাস কয়েকের একটা বাচ্চা নিয়ে সংসার পাততে এসে যে বাসাটুকুতে ঢুকেছিল, আজ পর্যন্ত সেই বাসাতেই রয়ে গেছে সংসার। সেই মাস কয়েকের মেয়েটাই আজকের এই বিচিত্র নাটকের নায়িকা পম্পা! সমু তার জন্মাবার অনেকদিন পরে জন্মেছে। তাই এখনো স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি।

ইত্যবসরে অজিত চক্রবর্তী হঠাৎ একদিন বিনা নোটিশে বাসাটা ছেড়ে কেটে পড়েচে এবং সদ্য বি. এ. পাস পম্পা দিশেহারা হয়ে বাবার অফিসেই আবেদন করে একটা চাকরি যোগাড় করে ফেলে সংসারের হালটা ধরেছে। এই পর্যন্ত। সংসারের চেহারায় জৌলুস বাড়নোর প্রশ্ন ওঠে না।

তবে অজিত চক্রবর্তীর মনের মধ্যে বাসনা ছিল ভাল বাড়িতে উঠে যাবার, সুন্দর করে সাজিয়ে সংসার করবার। তা কার কটা বাসনাই বা মেটে? এই বেঞ্চটা যেদিন শেয়ালদা বাজার থেকে কিনে, রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে এসেছিল, অতটা পথ ওই একটা বেয়াড়া জিনিসকে ধরে নিয়ে। আর এসে রকের ওই দেয়াল ধারটায় স্থাপন করে পরমানন্দের আলো মুখে মেখে বলেছিল, এই একটি আরামের ব্যবস্থা করা হল। বাইরে থেকে এসেই ঘরে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করে না। এ বেশ এখানে খানিক বসে হাওয়া লাগিয়ে জিরিয়ে।

তা সেটি সে করত। বাজার থেকেই ফিরুক, আর অফিস থেকেই ফিরুক। এসেই এখানে একটু বসে নিয়ে সংসারের সারাদিনের ঘটনাপঞ্জি শুনে-টুনে তবে ঘরে ঢুকত। ঘরে তো বসবার জায়গা বলতে বিছানা।

পম্পাও বাবার মত অফিস থেকে ফিরে এই বেঞ্চটায় একটু বসে নেয়। যেটা এখন ফাটাচটা হয়ে গেছে।

আজকেও বসেই বাবার কথাটা মনে পড়ল পম্পার। বাবা কাউকে বাতাস করতে দিত না। নিজেই তালপাতার পাখাখানা নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেত। বাবার মুখের রেখায় রেখায় কী পরিতৃপ্তির ছাপ পড়ত তখন। অনেক আসবাবপত্র, অনেক আড়ম্বরের আয়োজন ছিল না বলে কী বাবা একটুও অসুখী ছিল?

পম্পাও হাতপাখাখানা নাড়ছিল। মা ওর হাত থেকে কেড়ে নিতে গেল। বলল, দে আমি একটু জোরে জোরে বাতাস করে ঘাম শুকিয়ে দিই। শোবার ঘরের মতন এখানে একটা টেবিল ফ্যান ভাড়া করে বসিয়ে রাখলে বেশ হয়।

পম্পা পাখাখানা মাকে নাড়তে দিল না। নিজেও নাড়া বন্ধ কবল। একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে উঠল, আমার কী অবস্থা হয়েছে জান? 'না ঘরকা, না ঘাটকা।' নিজস্ব কোনো জায়গা নেই।

মা থতমত খেয়ে বলল, এ কথা বলছিস যে?

যা দেখছি তাই বলছি। এই আভাগা মেয়েটা সেখানেও কুটুম এখানেও কুটুম। কিংবা– 'গুরু ঠাকুর' বললেও হয়। সেখানেও তাই, এখানেও তাই।

বেচারী কমলা, কথায় খুব চৌকস নয়। যাহোক ভাবে বলে ফেলল, তা আদরের জিনিস আদর করবে না?

আদর আর সমীহ এক নয় মা। পম্পা আবার পাখাটা নাড়তে লাগল।

মা বলল, হাতমুখ ধো।

ধুই। ভাবছি এইরকম শূন্যে দাঁড়িয়ে কতদিন চালানো যাবে!

মা মেয়ের কথার থই না পেয়েই বোধহয় যে কথাটা পরে গুছিয়ে গাছিয়ে বলবে ভেবেছিল সেটাই ফট করে বলে ফেলল। বলল, তোর শ্বশুরবাড়ি থেকে এত জিনিস দেয়। লজ্জা করে। ড্রাইভারটাকে ঝিটাকে যে 'চা খেও' বলে দুটো টাকা দেব তার তো উপায় নেই। তোর যে আবার কড়া নিষেধ!

পম্পা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, এই নিষেধটা যে মান, এই রক্ষে।

মা আর একটু ইতস্তত করে বলে ওঠে, ওদের হাতে তোর শাশুড়ী যে আমায় একখানা মস্ত চিঠি দিয়েছে।

চিঠি দিয়েছে। মস্ত! চমকে উঠল পম্পা।

দুটো কারণেই চমকানো। চিঠি শুনে। আর মার মুখে 'তোর শাশুড়ী' শুনে। মা তো সবসময় 'উত্তরপাড়ার ওঁরা' বলে উল্লেখ করে। একটু আগেই একবার খটকা লেগেছে, তোর শ্বশুরবাড়ি শুনে।

হঠাৎ মার বাকভঙ্গীর পরিবর্তন কেন?

চোখ কুঁচকে বলল, চিঠি কিসের?

কমলা করুণা বিগলিত গলায় বলল, কিসের আর, দুঃখের আক্ষেপের। আর—

পম্পা হঠাৎ মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করল।

এই আধখানা একটা মোটা সাদা সেমিজ আর সেইরকমই একখানা সরুপাড় শাড়ি এবং হাতে দুগাছা মলিন পেতলের চুড়ি পরা বেচারী অজিত চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী কমলা চক্রবর্তী। এখন করুণা করছে সেই পূর্ণিমা রায়কে। পূর্ণিমা রায়ের চেহারাটা মনে পড়ল।

ভাঙ্গাচোরা সর্বহারা হয়েও, সাজেসজ্জায় চলনেবলনে এখনো সর্বৈশ্বর্যময়ী! একহাত চওড়া পাড় ছাড়া কোনো শাড়িই তো নেই পূর্ণিমা রায়ের। নেই এমব্রয়ডারি করা অথবা শাড়ির পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করা ছাড়া কোনো ব্লাউজ। পূর্ণিমা রায়ের হাতে এখনো ভারী ভারী একগোছা সোনার চুড়ি। স্বামীর কল্যাণের চিহ্ন।

কোন একদিন রাস্তায় পড়ে থাকা অচৈতন্য অবস্থায় ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে পূর্ণিমা রায়ের অঙ্গ থেকে অনেক সোনা লুঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতেই তো আর তিনি নিঃস্ব হয়ে যাননি? ব্যাঙ্কের ভল্টে তো আরো কতই মজুত ছিল।

সেই পূর্ণিমা রায়। যিনি কাঁদতে কাঁদতেও পঞ্চব্যঞ্জন সাজানো ভাতের থালার সামনে এসে বসেন কার্পেটের আসনে। তাঁকে করুণা! কমলা চক্রবর্তীর।

পম্পা অবশ্য বোঝে এটা ওঁদের বিলাসিতা নয়, অভ্যাস মাত্র। না হলে একমাত্র পুত্র হারিয়ে ফেলা, অন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভাতসূর্যের পরবার ধুতি এখনো চুনট করে কোঁচানো হয় কেন? আদ্দির পাঞ্জাবীর হাতায় গিলে কুঁচি?

সেই গিলে করা হাতায় বারবার চোখ মুছে ভিজে যায়। তবু এছাড়া আর কিছু হয় ওঁদের জানা নেই।

কমলা চক্রবর্তী আর পূর্ণিমা রায় দুই জগতের বাসিন্দা।

পম্পা মনে মনে কৌতুকের হাসি হেসে আবারও ভাবল, সাধে বলছি— আমি তাই 'না ঘরকা না ঘইটকা'। আমি কোনো জগতেরই নই। যদিবা নিজের সত্তাকে আমি মৃত অজিত চক্রবর্তীর এই ফাটাচটা সংসারেরই একজন বলে মনে করতে চেষ্টা করি, এরাই করতে দেয় না সেটা। এই কমলা চক্রবর্তী, আর তার ছেলে সমীর চক্রবর্তী! সমুও তো দিদিকে আশ্চর্য একটা সমীহর চোখে দেখে এখন। বাবা মারা যাওয়ার পর দিদি যখন সংসারের হাল ধরেছিল তখন থেকেই। তারপর তো বিরাট এক সমীহর পটভূমি।

পম্পা দেখল মা যেন আরও কিছু বলি বলি করছে। তাই পম্পা বলে উঠল, হঠাৎ আজ নতুন করে তোমার কাছে দুঃখ আক্ষেপ জানাতে বসলেন যে?

কমলা বলল, পড়ে দেখ।

তোমার চিথি আমি পড়তে যাব কেন?

কমলা অবাকের ভঙ্গীতে বলল, শোনো কথা মেয়ের। চিঠির লক্ষ্য তো তুই। আমি উপলক্ষ বইতো নয়। তোকে বলতে সাহস হচ্ছে না তাই আমায় বলেছেন, তোর এই চাকরিটা ছাড়ার কথা। ওঁরা আর একা থাকতে পারছেন না। আর ওঁদের ঘরের বউ যে তুচ্ছ কটা টাকার জন্যে এইভাবে খেটে হাড়কালি করছে, এও সহ্য করতে পারছেন না। ঘরে-বাইরে মুখ থাকছে না। অথচ তোকেও স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না চাকরি ছেড়ে দাও।

তাই দুঃখ করে লিখেছেন বিয়ের আগে তো কথা হয়েছিল অফিসে ছুটি নেওয়ার কী আছে, রিজাইন দিক। বিয়ের পরে তো আর চাকরি করার কথা ওঠে না। তো সে জোর করার মুখ তো আর ভগবান রাখলেন না। তাই জোরের বদলে মিনতি। বউমাকে আপনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করুন। আমরা আর এই শূন্যপুরীতে টিকতে পারছি না।

কমলা পত্রের মমার্থ সবই বলে ফেলে বলে ওঠে, তা ভেবে দেখছি ওঁদের দিকটা তোর দেখা উচিত! চাকরিটা বাপু ছেড়েই দে।

পম্পার মাথা থেকে পা অবধি যেন বিদ্যুতের শক খেলে যায়।

মা হঠাৎ এদের পক্ষ নেওয়ায় পম্পা যেন নিজেকে আত্মস্থ রাখতে পারে না। তীব্রভাবে বলে ওঠে, চমৎকার! এঁদের দিকটাই দেখা উচিত? আর তোমাদের দিকটা?

আমাদের! কমলা উদাস গলায় বলে, আমাদের যাহোক করে চলেই যাবে।

সেই যাহোকটা কী? পম্পা আরো তীক্ষ্ণ হয়। বড়লোক বেয়াই বাড়ির মাসোহারা নয় তো?—

কমলা কেঁপে ওঠে। কমলা ওইজন্যেই চিঠিটা মেয়েকে দেখাতে চেয়েছিল। সেই ধরনেরই একটু সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে বটে। অবশ্য ছুতোটা করা হয়েছে সমীরের পড়াশুনার উল্লেখ করে। তার যাতে সে ব্যাপারে কোনো ক্ষতি না হয়, সে বিষয়ে ওঁরা অবহিত থাকবেন। যতদিন না 'শ্রীমানের' লেখাপড়া শেষ হয়। সব দায়িত্ব প্রাভাতসূর্য রায় আর পূর্ণিমা রায়ের।

খুবই আক্ষেপ করে লিখেছেন মহিলা, ভাগ্য বিড়ম্বনায় তাঁদের কোনো জোরেরই মুখ নেই। নচেৎ 'বৌমার ভাই' তো তাঁদেরই একজন হবার কথা। তা বেয়ান যেন মনে মনে জানেন, সমীর একা তারই নয়, এনাদেরও।

যথেষ্টই অর্থবহ ইঙ্গিত। যার পিছনে রয়েছে কমলা চক্রবর্তীর মেয়ে চাকরি ছেড়ে দিলে, তার যে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেবে, তার সমাধানের প্রতিশ্রুতি ।

কিন্তু কথাটা তো কমলা বলেনি এখনো। পম্পা তবে বুঝল কী করে? অনুমান? আর অনুমানেই রেগে আগুন।

বোঝা হলেও কমলা একটা বুদ্ধির সিদ্ধান্ত করে ফেলল। ভাবল, থাক, চিঠিটাকে দেখিয়ে কাজ নেই। বলেছে তো, তোমার চিঠি আমি পড়তে যাব কেন?

আশ্চর্য! কমলা যাতে ওদের কত 'মহানুভব' ভাবছিল, মেয়ে তাতেই আগুন হয়ে উঠল।..... ওঁরা তোকে কত ভালবাসেন তা বুঝঝিস না? মহানুভব মহৎ নন ওঁরা? যে ক্ষেত্রে বউকে 'অপয়া' বলে আর তার মুখ না দেখবার কথা, সেক্ষেত্রে ওঁরা তাকে এইভাবে যত্ন-আদর তোয়াজ করে করে 'আপন' করবার চেষ্টা করছেন! নির্বোধ মেয়েটা বুঝছে না এসব।

একথা অবশ্য সত্যি, সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের পর পম্পাকে যখন হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল, কমলা তার দাদাকে পাঠিয়েছিল মেয়েকে আনতে। যদিও মেয়ের শ্বশুর তখন নার্সিংহোমে।

অবশ্য তখন কমলা 'শ্বশুর' শব্দটা মনের কোণেও আনেনি। কমলার শিক্ষা মতই তার দাদা রমাপতি উত্তরপাড়ার রায়বাড়ি গিয়ে বলেছিল আর এখানে কোন সুবাদে রাখা যাবে ওকে বলুন? বিয়েটাই তো আদৌ হয়ইনি। ও তো এখনো আমাদের 'কুমারী মেয়ে'।

তখন কমলা ওদের দিকটা ভাবতে বসার কথা ভেবে ওঠেনি। পম্পা বলে উঠল মনে হচ্ছে আমার অনুমানটা ভুল নয়। তাই না মা?

মা চিঠিটা দেখাবে না।

তাই মা রাগ দেখিয়ে বলে উঠল, 'মাসোহারা' আবার কী? আর তাই দিতে চাইলেই আমি নেব ?

কী জানি। হঠাৎ যখন ও পক্ষের উকিল হয়ে পড়েছ মেয়েটাকে বিদায় করবার তাল করছ।

মা উদাস গলায় বলল, মেয়ে সন্তান তো ঘরে রাখার জিনিস নয় মা! বিদায় দেবারই তো জিনিস। পাকেচক্রে আর আপনার ভাগ্যচক্রে, এমন অবস্থা। সর্বসুলক্ষণা মেয়ে আমার 'রাজরানী যোগ' তো হল সবই আবার কিছুই হল না। এখন ওঁদের অবস্থা শুনে শুনেই মনে হচ্ছে দুনৌকোয় পা রেখে আর কী হবে তোর। আমাদের ভগবান যা করবেন তাই হবে।

দু নৌকোয় পা! পম্পা বলে উঠল ঠিক তো। বলেছ ভাল। ভাবছি তাহলে একটা নৌকো ছেড়েই দিই, অ্যাঁ! শক্তটাতেই পা রাখি কী বল?

মা দুঃখভরা গলাতেও উৎসাহের ব্যঞ্জনা এনে বলল, সেটাই ভাবচি তখন থেকে। কী দুরন্ত শোক নিয়ে শূন্যপুরীতে বসে হাহাকার করছে মানুষ দুটো! তবু তোকে পেলে— সত্যি তোর চাকরির কী দরকার?

মা মেয়ের নির্নিমেষ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখে ভেবে পেল না কোন দিকে তাকিয়ে আছে ও। যেন আকাশে নয় বাতাসে নয়, উঠোনের টিউবয়েলটার নয়, রান্নাঘরের দেওয়ালে উঠে বাওয়া লাউ লতাটার দিকে নয়, মার মুখের দিকে তো নয়ই।

রোয়াকের নিচে এক চিলতে মেটে উঠোনওলা এই বাসটির অনাহত দৃশ্যই তো এই।

মা তাড়াতাড়ি বলল গরিব গেরস্থর ঘরে রাতদিন খাটতে খাটতেই শোকের দাঁত ক্ষয়ে যায়। বড় মানুষের ঘরে হাত পা কোলে নিয়ে বসে থাকা শুধুই হাহাকার।

পম্পা সচকিত হল। মার দিকে তাকিয়ে বলল তাহলে বলছ তোমার মেয়েটা এবার বড়মানুষের হয়ে গিয়ে হাত পা কোলে করে বসে থেকে ওই অবস্থাতেই পৌঁছক।

মা থতমত খেল। ও মা! এই তো মেয়ে বলল, 'আর দু নৌকোয় পা রাখবে না' আবার মন ঘুরে গেল না কি?

বেচারী কূল না পেয়ে আপাতত তৃণখণ্ডটাই ধরল। বলল, যাকগে বাবা। ওসব কথা পরে হবে, এখন চা-টা খা তো। চায়ের জলটা বোধহয় ফুটে ফুটে মরেই গেল।

হঠাৎ মাকে অবাক করে দিয়ে হি হি করে হেসে উঠল পম্পা।

ওমা তুচ্ছ চায়ের জলটাও 'ফুটে ফুটে মরে গেল' বলে আঁফশোষ হচ্ছে তোমার? কী মায়ার প্রাণ গো!

কমলা মেয়ের এই অকারণ হাসির মানে খুঁজে পায় না।

কমলা বেচারী মেয়ের হদিস না পেয়ে তার শ্বশুরবাড়ী থেকে 'কত জিনিস' পাঠিয়েছে সেগুলো আর দেখতে বসল না। তাকিয়ে দেখে না। বিরক্ত হয়, তবু তো দেখায় ডেকে ডেকে। কাকেই বা দেখাবে? সমু অবশ্য খুব উল্লসিত হয়। বলে ওরে-কত নারকোল, কত পেয়ারা, কত কলা, কত বাতাবি লেবু, শশা, পেঁপেঁ। উঃ পাড়ায় বিলোও বাবা! এত কে খাবে? দিদি তো খেতে চায় না।

আবার বলে বাড়ির গরুর দুধে এত সন্দেশ, এতটা ক্ষীর? ভাবা যায় না। এবং সে, পর্যন্ত হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, এই শ্বশুরবাড়ি হয়েছিল দিদির! কোথায় ওরা, কোথায় আমরা! তাও যদিবা বাবা থাকতেন।

এ সংসারে কোনো আহ্লাদই আর শেষ অবধি আহ্লাদ থাকে না।

চির অভাবী কমলা যখন দোতলায় উঠে বাড়িওলার বাড়িতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির বাগানের ফল-তরকারি উপহার দিতে যায়, তখনো তো শেষ অবধি দুঃখ আর হতাশা!

আহা কী বিয়েই হয়েছিল মেয়েটার।

কিন্তু এমন অঘটনটা ঘটেছিল কী করে?

বেলেঘাটার এই একতলার আড়াইখানা ঘরের বাসিন্দা কমলা চক্রবর্তী, যখন স্বামী হারিয়ে চোখে অন্ধকার দেখছে, তখন হঠাৎ তার মেয়েটা উত্তরপাড়ার বনেদী বংশ রায়বাড়িতে গিয়ে উঠল কী করে? যে মেয়ের রোজগারেই তখন সংসারের ভরণপোষণ চলছে।

কোন ঘটকের ঘটকালীতে এমন অভাবিত ঘটনা? নাকি, কোনো মন্ত্রবলে?

তা অভাগী কমলা চক্রবর্তী দুর্ভাগ্যে মেয়েটা সেই রাজবাড়ির সিংহাসনে উঠতে গিয়েও উঠতে পারল না। পিছলিয়ে পড়ে গেল। পরিচিত সমাজ হতবাক হয়ে হায় হায় করল যত, তার থেকে বেশি করল বামুন হয়ে চাঁদে-হাত দিত যাবার ধৃষ্টতার ব্যাখ্যা! এত কী আর সয়? যা রয়সয় তাই ভালো!

কিন্তু কমলা কি নিজে চাঁদে হাত বাড়াতে গিয়েছিল? সে তো ভয়ে ছুট মারতেই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চাঁদ নিজে নেমে এসে হাত বাড়ালে?

অজিতের দূর সম্পর্কের এক দিদি, উত্তরপাড়ায় তার মামাশ্বশুর বাড়ি, সেই একদিন এসে হাজির। 'কমলা বউ' মেয়ের বিয়ে দিবি? রাজপুত্তুর পাত্তর, এক পয়সা নেবে না। নিজেরা গা সাজিয়ে গহনা দিয়ে নিয়ে যাবে–মস্ত বনেদী বংশ।'

কমলা ননদের কথায় অলীক হাসি হেসে বলেছিল তারা আসবে আমার মেয়েকে বউ করতে?

আহা! কার ভাগ্যে কী আছে, বলা যায়? মেয়ের যদি ভাগ্যে থাকে– ওরা একটি ভাল কুষ্ঠি ওলা সোন্দর মেয়ে খুঁজছে শুনলাম। দে না তুই তোর মেয়ের কুষ্ঠিটা আর একটা ফটো!

কমলা বলল, কুষ্ঠি কোথায় পাবো? কে কবে করেছে?

তা না করেছে, না করেছে। বলি জন্ম সময়টা লেখা আছে?

তা আছে।

তাতেই হবে। ওদের হাতে কত জ্যোতিষী! ছেলের সঙ্গে রাজযোটক হওয়া চাই। তাও বলেছে, আহামরি সুন্দরী না হলেও চলবে। তা আমার ভাইঝিটি তো হেলাফেলার নয়। যে দেখবে ফিরে তাকাবে। রংটাই যা দুধে ধোওয়া নয়। সেটা হলে তো পরমাসুন্দরী বলা হতো।

কমলার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। বলেছিল, শুধু শুধু ধাষ্টামো। যেরকম ঘর-বর বলছ তুমি ঠাকুরঝি – শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। আমার মেয়ে যাবে তাদের ঘরে!

তবু 'ঠাকুরঝি' হানফান করে নিয়ে গিয়েছিল জিনিস দুটো। বলেছিল –কপাল ঠুকে দেখিই না।

আর তারপরই কী এক অলৌকিক রহস্যে এই সংঘটন। পম্পার প্রতিবাদ কোনো কাজে লাগেনি। বন্যা কি প্রতিবাদ মানে! পম্পার ভাগ্যটা যে ধেয়ে চলে এসেছিল বন্যার বেগে।

কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল। সেই উত্তরপাড়ার হেদিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বেলেঘাটার এই নেহাতই দীনহীন গেরস্তপাড়ায়।

মেয়ে পছন্দ! কোষ্ঠি পছন্দ! একেবারে রাজযোটক মিল। সাত দিনের মধ্যে বিয়ে। কারণ আসলে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক তিন মাস বিয়ে নিষিদ্ধ।

এই আকস্মিকতায় মেয়ে আচ্ছন্ন, মা আচ্ছন্ন তার ছেলেটাও আচ্ছন্ন। আর আচ্ছন্ন হয়ে গেল পাড়া-পড়শীরাও। যখন দেখল ফুলসাজানো এবং টুনি বালব ঝোলানো গাড়িতে চেপে রাজপুত্রের মত বর এসে দাঁড়াল কমলা চক্রবর্তীর দরজায়। সে তো কিছুই করতে পারল না, যা করল পিসি, আর বাড়িওলারা। বাড়িওলার চেষ্টাতেই একটা ইস্কুল বাড়ি যোগাড় হয়েছিল তাতেই বিয়ের ব্যবস্থা। বরপক্ষের প্রেরিত কলকাতার নামীদামী এক 'কেটারার্স' এসে বরযাত্রী কন্যাযাত্রী উভয়পক্ষকেই ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করে গেল।

পরদিন সকালে পাড়ার 'সেই পম্পা' যখন অষ্টাঙ্গে অলঙ্কার পরে বরের চাদরে গাঁটছড়া বেঁধে সেই ফুলসাজানো গাড়িতে চেপে বসল, তখন সমস্তপাড়া ভেঙে পড়ল রাস্তার ধারে। সবার মুখে একই কথা, কী ভাগ্য! কী ভাগ্য! এ যেন কোনো ব্রতকথার গল্প! গরীব ব্রাহ্মণের মেয়েকে রাজপুত্তুর এসে বিয়ে করে নিয়ে গেল।

আর তার পরের দিনই সেই তারাই সকলে একবাক্যে রায় দিল, এ তো জানা কথাই। এত কখনো সয়? কাজ করতে হয় সমানে সমানে। বামন হয়ে চাঁদে হাত! সইলেই হলো?

কিন্তু অপর পক্ষরা? তারা তো আরে বেচারী কমলা চক্রবর্তীর মত নির্বোধ নয়? তাদেরও তো জানবার কথা কাজ করতে হয় সমানে সমানে। চেষ্টা করলে কি আর তারা তাদের সমান সমান ঘরে পম্পার মত মেয়ে পেত না? এত হোমড়ে পড়তে এলো কেন? আর এই কি রাজযোটকের নমুনা? শুধু যোটকই দেখছে? আর কিছু না? রহস্য!

পম্পাও কতদিন বেলেঘাটার বাসার এই ঘুপচি ঘরটায় সরু একটা চৌকির নেহাত সাধারণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছে, কী এই রহস্য! একেই কি তাহলে 'নিয়তি' বলে? কিন্তু কার নিয়তি? সেই প্রৌঢ় দম্পতীর না পম্পার?

পম্পাদের বাড়িতে পম্পা কখনো এই জ্যোতিষ, জ্যোতিষী, ঠিকুজী-কোষ্ঠি, যোটক-রাজযোটক শব্দগুলো শোনেইনি। কাজেই সে সম্পর্কে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো চেতনাই জন্মায়নি। বিয়ের সময় পিসি-বাহিত হয়ে ওই শব্দগুলো এ বাড়িতে এসে পড়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটাকে অনুধাবন করার আগেই পম্পা নামের মেয়েটার কাছে ব্যাপারটার অন্তঃসারহীন অসারতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ওঁরা? এইটাই ভেবে পায় না পম্পা! ওঁরা নাকি চিরকালই ব্যাপারটাকে 'অভ্রান্ত' বলে জানেন এবং মানেন। তবে? তার এতবড় ব্যর্থতা দেখেও বিশ্বাস হারালেন কই?

এখনো তো পম্পা যখন চলে আসে, পূর্ণিমা রায় বলে ওঠেন দুর্গা দুর্গা!' আর প্রভাতসূর্য বলেন, আজকের তিথিটা দেখেছিলে পূর্ণিমা? অশ্লেষা মঘা-টঘা নয়তো? খুব হাসি পায় পম্পার। আবার এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে আশ্চর্যও লাগে। আর আশ্চর্য লাগে ওঁদের ভঙ্গী দেখে। পম্পার কাছে যেন ওঁরা একটা অপরাধীর ভূমিকায় থাকেন। সাধারণ নিয়মে নিজেদের এই চরম দুর্ভাগ্যের জন্য নতুন বউকে দায়ী না করে বউয়ের দুর্ভাগ্যের জন্যে নিজেদের দায়ী করার ভঙ্গী কেন ওঁদের? শুধুই মহত্ত্ব?

বউ গেলে কৃত্যর্থমন্যের ভঙ্গী! বউকে দেখলে বিগলিত! বউ কথা কইলে যেন 'দেবীর বর' পাচ্ছেন। এমন কেন, মানসিক ভারসাম্যের অভাব? ভেবে ভেবে ঠিক করেছে পম্পা, এটাই কারণ! ভয়ানক সন্ধিক্ষণে অকস্মাৎ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ফেলে ওঁরা মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

সেইখানে তো মুশকিল। পম্পা ভারী অসহায় বোধ করে। ওই দুটো করুণাপ্রার্থী আর স্নেহবিগলিত মুখের দিকে তাকিয়ে পম্পাও মনের জোর হারিয়ে ফেলে বসে। জোর করে বলে উঠতে পারে না এইভাবে সপ্তাহে সপ্তাহে আসা আমার পক্ষে খুব অসুবিধা। বলে উঠতে পারে না, বা আসব আমি রোজ রোজ সেটাই বলুন?

চন্দ্রসূর্যের নিয়মের মত গাড়িটাও যেমন এসে দাঁড়ায়, পম্পাও তেমনি নিয়মের চক্রে আবর্তিত হয়ে উঠে বসে।

কিন্তু শুধুই কি সপ্তাহে সপ্তাহে? ক্রমশই যেন এক আগ্রাসী স্নেহের প্রবল ক্ষুধা পম্পাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চেষ্টা করে চলেছে। ক্রমশ আর শুধুই সপ্তাহান্তিক থাকছে না ব্যাপারটা যে কোনো ছুটি পড়লেই কমলা চক্রবর্তীর বেলেঘাটার বাসার দরজায় সেই পরিচিত গাড়িটি এসে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তা থেকে নেমে আসছে সেই গিন্নীবান্নি পুরনো পরিচারিকাটি। মার্কামারা বড়লোকের বাড়ির পুরনো লোকের ভঙ্গী? এই ভঙ্গীর সামনে বলে ওঠা যায় না আজ আর পম্পা যাবে না। গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাও বাছা! বরং কমলা এমন তটস্থ ভাব দেখায়, যেন স্বয়ং বেয়ানই এসেছেন বুঝি।

পম্পা রেগেমেগে বলে, খালি খালি কী যাব? তুমি যদি বলতে না পারো; আমিই বলে দিচ্ছি গিয়ে, যাব না। অন্য কাজ আছে। মা তখন মেয়ের হাতে পায়ে ধরার যোগাড় করে। বলে গাড়ি ফেরত দেওয়াটা বড্ড অপমানের। অমন একাটা মান্যিমান লোক। খোঁড়া অন্ধ হয়ে বসে আছে। একটুতেই মানে যা লাগে।

অথচ ওই মা-ই, গোড়ায় গোড়ায় গাড়ি আসা দেখে গজ গজ করেছে। বলেছে, কিসের সুবাদে এত মাখামাখি করতে যাবে আমার মেয়ে! ওতো আমার কুমারী মেয়ে! ওকে আমি আবার বিয়ে দেব!

যখন বলেছে তখন অবশ্য মনে হয়েছে! 'কত ধানে কত চাল' এ বোধটা নেই কমলা চক্রবর্তীর!

কিন্তু ক্রমেই যেন পরিস্থিতি বদল ঘটছে। নরম হয়ে যাচ্ছে কমলা। ক্রমেই যেন তার মনে হচ্ছে, ওঁরা যে এখনো পম্পাকে বউ বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এটা পম্পার পরম ভাগ্য।

আর পম্পা? পম্পা মনে মনে উচ্চারণ করে, কেন যাব আমি? কেন? কেন?

কিন্তু আবার ফর্সা জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠেও বসে। প্রথম প্রথম পম্পা সাদা শাড়ি পরে যেত। পূর্ণিমাই বলে বলে ছাড়িয়েছেন। বলেছেন তোমার জন্যে কত শাড়ি নিজে হাতে করে পছন্দ করে কিনেছিলাম মা! পরবে মা, সেসব পরবে!

পরার ব্যাপারে যতটা সংস্কারমুক্ত হতে পেরেছেন তিনি, খাওয়ার ব্যাপারে অবশ্য তা নয়। সেখানে সাত্ত্বিক ব্যবস্থা। বেচারী পম্পার আরো যন্ত্রণা খাওয়ার পাতে দুধ, ঘি, ক্ষীর দই, মাখন, পায়েসের প্রাচুর্যে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করা কমলার একটা রোগ কী রেঁধেছিল? কী দিয়ে খেলি? তারপর আবার শঙ্কিত দৃষ্টিতে বলে, তা হ্যাঁরে, এখানে যে তোর খাওয়া ছোঁওয়ার বিচারটিচার নেই, সেটা ওরা টের পায়নি তো?

পম্পা মার এই তুচ্ছতায় ভারী বিরক্ত হয়। তুচ্ছতায় পম্পার যত অরুচি, পম্পার মা-র তাতেই তত রুচি!

বিরক্তি না চেপেই বলল পম্পা তুমি আমার মরা বাবার নামে 'দিব্যি' দিয়ে বসে আছো, তাই টের পায়নি। নইলে প্রথমদিনেই পেতো! এইসব লুকোচুরি আমার বিশ্রী লাগে।

কমলা অপ্রতিভ! কমলা থতমত লুকোচুরি আবার কী? ওঁরা সেকেলে ধাঁচের মানুষ, অন্যরকম দেখলে হয়ত মনে আঘাত পাবেন, তাই বলা।

তুমি কি ভাবো মা, কখনো কারুর মনে আঘাত না দিয়ে চিরদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়?

কমলা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তাই অন্য ছুতো করে পালায়।

মেয়ে যে বলেছিল আমি 'না ঘরকা, না ঘাটকা' সেটা কি মিথ্যে? দু জায়গাতেই যেন কুটুম, সেটা তো ভুল নয়। মেয়েকে কমলার দারুণ ভয়, দারুণ সমীহ! যত কথা কমলার ছেলের সঙ্গে।

জানিস সমু, তোর দিদির শ্বশুর বলেছে, ওর যত ব্যবসাপত্তর আছে, তোর দিকে সবকিছুর কর্তা করে দেবে! বলেছে ওঁদের ছেলে বেঁচে থাকলে যেমনভাবে দায়িত্ব নিত, ছেলের বউকেই সেভাবে নিতে হবে। চোখে দেখতে না পান শুনে মুখে মুখে সব শিখিয়ে দিতে তো পারবেন।

সমু বলে, ওঁদের মত ভাল লোক দেখা যায় না, তাই না মা?

তাই তো! কিন্তু আমাদের কপাল! ঘুরেফিরে সেই কপালের কথা!

শুনে দিদির খুব ভাবনা হল বোধহয়?

ওরে বাবা, তোর দিদিকে কে বলেছে এখুনি! ঝিয়ের হাতে চিঠি দিয়েছিলেন, কত কথাই লিখেছিলেন। চাকরি ছেড়ে দিতে বলে আবার অনেক ব্যবস্থার কথা।

বউমার কাজে ক্রমশ বউমার ভাইটি সাহায্যকারী হতে পারবে। সব কিছুর ম্যানেজার হয়ে থাকতে পারবে। নয় নয় করেও রায়বাড়ির এখনো যা আছে ঠিকমত চালাতে পারলে অনেক! এইসব। বিধবা বউকে এত মান্য কে দেয় বল? কথাটা অনায়াসেই বলল কমলা। তার মানে কমলা চক্রবর্তী এখন তার মেয়েকে 'কুমারী' না ভেবে বিধবাই' ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছে! কখন থেকে তার মনের এই পালাবদল কে জানে।

পম্পার মা-র সাহস হয়নি। মেয়ের কাছে তার ভবিষ্যৎ জীবনের 'সোনার ছবিটি' মেলে ধরে দেখাবার। ছেলের কাছে সেই অক্ষমতাটি ব্যক্ত করে নিঃশ্বাস ফেলেছে হৃদয়বান শ্বশুর কমলার হতভাগিনী মেয়েকে তার রাজ্যপাট লিখে দিতে চাইছে, এ কী ভাবা যায়? অথচ অভাবিত ভাগ্যের কথাটি কমলা মেয়ের কাছে ব্যক্ত করে তার সুখের অংশীদার হতে পারছে না।

ছুটির দিনে, দরজায় গাড়ি এসে দাঁড়ালেই মেয়ে এত বেজার হয়, দেখলে অবাক লাগে কমলার।

অথচ আবার— হ্যাঁ অথচ আবার পম্পার নিজেরই অবাক লাগে, শান্তভাবে ফের সে গাড়িতে উঠে বসছে গিয়ে। এবং আরো অবাক লাগে যখন সেই পরিচিত গাড়ি-বারান্দাটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে থেমে যায় গাড়িটা। এবং পম্পার 'বহমান' পিঠ নুইয়ে নমস্কার জানায়, পম্পার ভিতরের সমস্ত বিদ্রোহ কোথায় হারিয়ে যায়।

পম্পা অভ্যস্ত কথাগুলো শোনে, অভ্যস্ত কথাগুলো বলে, অভ্যস্ত নিয়মে গিয়ে প্রণাম করে, সেই দুর্ভাগ্য প্রৌঢ় দম্পতীকে। নম্রতা আর বশ্যতার প্রতিমূর্তি এই মেয়েকে দেখলে কে বলবে, একটু আগেও এর ভিতরে তীব্রভাবে পাক খাচ্ছিল সেই তীক্ষ্নপ্রশ্ন 'কেন? কেন আমি এখানে আসতে বাধ্য হব?'

কমলা চক্রবর্তীর সাহস হয়নি। পূর্ণিমা রায়ের হল। কী যেন একটা ছুটির সকালে বউকে আনিয়ে নেওয়ার পর, একথা সেকথার মধ্যে বলে উঠলেন, যার সর্বস্ব সেই এখনো কুটুমের মত। আজ পর্যন্ত বোধহয় বউমা পুরো বাড়িখানা ভাল করে দেখেওনি। সুশীলাদি, বউকে একবার তিনতলার জিনিসের ঘরটা দেখিয়ে আনো তো।

জিনিসের ঘর! সেই অহেতুক অবান্তর বস্তুর বোঝা! শুনেই হৃৎকম্প হল পম্পার। শুকনো মুখে বলল, জিনিসের ঘর আর কী দেখব?

পূর্ণিমা বললেন, তোমাকেই তো এখন থেকে সব দেখতে শুনতে হিসেব রাখতে হবে মা। আমার তো ক্ষমতা গেছে। দোলে আর ঝুলনে, কত ঘটা হত আগে। তার দরুন রূপোর বাসনের গাদা। চাঁদোয়া পর্দা ঝাড়লণ্ঠন, কার্পেট শতরঞ্চি কত কত!

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই তবুও যেতে হল। কিন্তু কেন? কেউ তো তাকে বাধ্য করেনি। ও বাড়ির ইটকাঠ কড়ি-বরগায় বশ্যতার মন্ত্র গাঁথা আছে না কি?

তিনতলায় নিয়ে গেলেন সুশীলামাসি। পূর্ণিমার পিসতুতো দিদি। চিরদিনের আশ্রিতা।

তা আশ্রিতা মহিলা আশ্রিতাদের ধর্মটি পালন করলেন।

যে প্রশ্ন পম্পার আর তার পরিবারের মনে নিরুত্তর ছিল, তার উত্তরটি দিলেন মাসি। যে 'রহস্য' রহস্যেই ছিল, তা উদঘাটন করলেন।

রহস্য তো ছিলই. কেন উত্তরপাড়ার এই রায়বাড়ির একমাত্র সন্তান রূপের কার্তিক ছেলের জন্যে পাত্রী খুঁজতে গিয়ে বেলেঘাটার এক গরিব পাড়ার, গরিব বিধবা কমলা চক্রবর্তীর খেটেখাওয়া মেয়েটার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, গড়িয়ে পড়েছিলেন। আর আজও— সেই কাঙালপনার ভূমিকাতেই রয়ে গেছেন।

কিন্তু—উত্তরটা যে সুশীলাবালার জানা ছিল, সে কথাটি কি প্রভাতসূর্য আর পূর্ণিমা রায় জানতেন? তাঁদের ধারণা ছিল তাঁরা ছাড়া ত্রিভুবনে আর করো জানা নয়।

সুশীলা মাসির ভাষা প্রাঞ্জল। প্রকাশভঙ্গী সাবলীল-উপস্থাপনার কৌশল অনবদ্য। সিন্দুক থেকে রুপোর বাসনের গাদা বার করে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ বলে উঠলেন, সোনা আর রুপো, বিষয় আর সম্পত্তি, একজনের বিহনে সবই মিথ্যে। বিধবা মেয়েমানুষের আর ভোগ কী? মেয়েটার তো জীবন নষ্ট! তা ও তো ইচ্ছে করেই করা হয়েছে বউমা! জেনে বুঝে লোকের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া! এখন ওরা যতই তোমার নামে বাড়ি গাড়ি বিষয় আশয় বিজিনেসের লেখাপড়া করে দিক, তোমার লোকসানটা পুরবে? সোনা চিবোলে, ভাতের ক্ষিদে নিবারণ হয়?

পম্পা এই অভূতপূর্ব ভাষা শুনে অবাক হয়ে যায়। পম্পা তার পরম হিতৈষিণী মাসিশাশুড়ীর জটিল-কুটিল মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে হাঁ করে বলে, কিসের কথা বলেছন?

কিসের কথা বলছি? হা আমার কপাল। এই সরল শিশুমন, তার সঙ্গে এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা। বলি, সর্বসুলক্ষণা মেয়ে তুমি, তোমার কী এই অকাল বৈধব্য হবার কথা? এ তো ঘটিয়ে দেওয়া।

পম্পা অবাকের চরমে উঠে বলে, ওঁদের কী দোষ?

তা বউমা, স্বার্থচিন্তাই দোষ? সুশীলাবালা বিজয় গৌরবের গলায় বলেন, জেনে শুনেই তো নিরীহ একটা মেয়েকে ধরে এনে, তাকে হাড়িকাঠে গলা দিইয়ে কোপ বসালে। এ তো বলিদান দেওয়াই।

পম্পা ক্লান্তভাবে বলল, আপনি কী বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না। আর এসব দেখতে ভাল লাগছে না। তুলে ফেলুন। আমি নিচে যাই!

তা যাবে তো বটেই। ওরা তো তোমায় এখন আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধবার তাল করছে। ভাবছে কেউ কিচ্ছু জানে না। এই সুশীলা বামনীর অজানা কিছু আছে সংসারে? গোড়া থেকেই বলি তবে— না বলা না কওয়া, হট করে একদিন হরিদ্বার না হৃষিকেশ থেকে মায়ের গুরুদেব এসে হাজির। আর ছেলের পানে তাকিয়েই বলে উঠল, সব্বোনাশ! এ যে সামনেই নিদারুণ ফাঁড়া। এই জন্যেই বুঝি ঠাকুর আমায় এখানে এনে ফেললেন।... একথা শুনে তো সব ভির্মি যায়। অবিশ্যি ছেলের কানে তোলেনি। কারোর কানেই তোলেনি।

তবে আমার কথা আলাদা। আমার কান বাতাসে হাঁটে। তো যাগযজ্ঞ শান্তি-স্বস্তেনের কসুর হল না। অন্য ছুতো দেখাল। তবু গুরু বলল, আশা দেখছি না। একেবারে মোক্ষম যোগ। মা-বাপেরও তো কুষ্ঠিতে জোর দেখছি না। শেষ, ভরসা বিয়ে দিয়ে ফেললে, তার জোরে হয়তো কাটতে পারে ফাঁড়া। মেয়ে খোঁজ কুষ্ঠি দেখ, যদি কোনো মেয়ের কুষ্ঠিতে 'সাবিত্রী' যোগ দেখ তো কালো সোন্দর বেছ না! এই শ্রাবণের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে ফেল। তবে সবই চুপিচুপি।

পম্পা এই রূপকথার গল্পের সামনে আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে থাকে। পম্পার কাছে এ একটা অজানা জগৎ।

মাসি বলে চলেন, তৎক্ষণাৎ তুমুল তোড়জোড়। চক্ষের নিমিষে দুশো পাঁচশো মেয়ের ফটো আর কুষ্ঠি এসে পড়ল। পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত ঘটক-ঘটকী ছুটল। তো শেষমেষ এই তোর ছবি আর কুষ্ঠি দেখে গুরু বলল, বোধহয় 'মা' মুখ তুলে চাইলেন। এই মেয়ের সঙ্গে লাগিয়ে দাও বিয়ে। ছেলেটা বোধহয় বেঁচে গেল! এই মেয়ের রয়েছে 'সাবিত্রী যোগ'।

পম্পার হতভম্ব মুখ থেকে অজ্ঞাতসারে উচ্চারিত হয়, 'সাবিত্রী যোগ'!

হ্যাঁ গো যে যোগে বৈধব্যের দুয়োরে কাঁটা। ব্যাস লেগে গেল ধুন্ধুমার ঘটা। আহ্লাদের বান। যেন মরাছেলে প্রাণ পেয়ে চোখ মেলেছে। তা শেষরক্ষে হল?

মাসির চোখে মুখে যেন বিজয়গৌরব। কথাতেই বলে, যাগযজ্ঞ তাক্‌তুক্! যমের কাছে – সবই ফুঁক! যমে যাকে নজর হেনেছে–

হঠাৎ পম্পা সমস্ত আচ্ছন্ন ভাব ঝেড়ে ফেলে বলে ওঠে, আমি এসব বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস কর না?

না, যা হবার হয়।

তা সেই কথাই তো আমিও বলছি গো! যা হবার তা হলোই! হতোই! শুধু শুধু নিজের স্বার্থে একটা পরের মেয়েকে ধরে এনে বলিদান দেওয়া।

মহিলাকে খুব খারাপ লাগছে পম্পার।

বিরক্ত ভাব না চেপেই বলে, একথার কোনো মানে হয় না। ওদেরও তো যথেষ্ট হল। মারাও যেতে পারতেন।

পারতেন না বউমা। ওইখানেই তো ভগবানের কলকাঠি। যে যার কর্মফল ভুগবে।

পম্পা রাগের গলায় বলে, যেটা আমার ব্যাপারেও খাটে। এত সব বলছেন কেন?

ওমা! মাসি মুখ কালো করে বলেন, যার জন্যে করলুম চুরি, সেই বলছে চোর। কটাকট করে খোলা দেরাজ, আলমারি, সিন্দুক, বাক্স চাবি লাগতে থাকেন সুশীলাবালা। তার, হতাশা আর আক্রোশের রেখায় কদর্য হয়ে ওঠা মুখটার দিকে তাকিয়ে পম্পার মনে হয়, নির্ঘাত এসব বুড়ির বানান গল্প! 'কান ভাঙান' না কী যেন একটা কথা আছে, বোধহয় তাই।

মহিলাটিকে খুব খারাপ লাগল পম্পা, তার বিবৃত কাহিনীটা স্রেফ বানানো মনে হল, তবু—হ্যাঁ আশ্চর্যের কথা তবু পম্পার কবে যেন 'কালীঘাটের' মন্দির চাতালে দেখা একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

একটা রক্তাক্ত হাড়িকাঠ। একটা নিরীহ ছাগশিশু! আর এক খাঁড়াধারী। জোর করে দৃশ্যটা সরাতে চেষ্টা করে পম্পা। ভাবে ছি ছি, আমি এইসব কুসংস্কারে ভরা কথাগুলো বিশ্বাস করে মরেছি নাকি? সংসারে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই রকম অনিষ্টকারীই হয়।

তথাপি—

তথাপি যখন কালো চশমা পরা একটি মুখের সামনে এসে বসল, পম্পার মনে হল ওই চশমার আড়ালের মুখটা খুব স্বার্থপর। এবং শীর্ণহাতে একগোছা ঢলঢলে আর ভারীভুরি সোনার চুড়ি গোছা, রোগা মুখে মস্ত একটা সিঁদুরের টিপ মহিলাটিকে হঠাৎ অভিনেত্রী মনে হল। স্নেহের অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন! আসলে তো সত্যি স্বার্থই।

আবার লজ্জাও পেল। ধ্যেৎ কী ভাবছি আমি।

পম্পা যখন নিচে নেমে এল, এঁরা তখন নিজেদের পরিকল্পনা আর বক্তব্যটি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছেন।

হয়তো আজই এই প্রস্তাব না এসে পড়লে পরিস্থিতির চেহারা অন্যরকম হত! হয়তো তাহলে যেমন চলছিল তেমনিই চলতে থাকত!

পম্পা যেমন একটা অর্থহীন ছন্দে আবর্তিত হয়ে চলেছে, তেমনি যেমন চলত, রত্নাকর মল্লিক নামের লোকটা পম্পার গাড়ির দিকে ঈর্ষা বিরক্তি আর আক্রোশের দৃষ্টিতে তাকায়, তাকিয়ে দেখত! আর বলত, নাঃ, এর একটা বিহিত না করলেই নয়।

কিন্তু আজই প্রস্তাবটা এল। যখন সুশীলাবালা নামের মহিলাটির সমস্ত কথা 'বানান' আর কুসংস্কার বলে নস্যাৎ করে দিয়েও, বারে বারে কালীঘাটের মন্দিরের চাতালের একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল, তখনই ওঁরা বলে উঠলেন, এই কাগজপত্রগুলো একটু দেখতে হবে মা।

কালো চশমা, একটু হাসির মত করে বললেন, তুমি তো আর তোমার শাশুড়ীর মত ইংরিজি অক্ষর দেখে ভয় পাবে না? পড়ে দেখ, তারপর—

সবটা পড়ে দেখার ধৈর্য হয়নি। একটু চোখ বুলোনো মাত্রই হঠাৎ এ বাড়ির ইটকাঠ কড়িবরগা তাদের নিয়ন্ত্রণ মন্তরটা হারিয়ে ফেলল। পম্পা ওই দৃষ্টিহীন চোখের দিকেই বিদ্রোহের দৃষ্টি হেনে বলে উঠল, এসব কী? আইনত আমিই আপনাদের এই রায়বাড়ির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী? তাই-কেন? আমি কে?

এ কী বলছ বউমা?

অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান দুটো মানুষই একসঙ্গে বলে উঠল, তুমি ছাড়া আর কে? তুমিই তো সব। তুমি ছাড়া আর কে আছে আমাদের? আইনত ধর্মতও সবই তোমার।

ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! পম্পাকে বন্দী করে ফেলবার পরিকল্পিত সুকৌশল ষড়যন্ত্র। পম্পাকে এরা চিরজীবনের জন্যে এদের জিনিসের ঘরের জিনিসের মত সিন্দুকে পুরে চাবি বন্ধ করে রেখে দেবার মতলব আটছে।

পম্পাকে অতঃপর সারাজীবন সেই ফুলের মালা গলায় দেওয়া ছবি ঝোলানো ঘরে রাত কাটিয়ে চলতে হবে। পম্পাকে বিশাল এক বস্তুপুঞ্জের জঞ্জালের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে। অথচ কোনো কারণ নেই। আইনত কথাটা মিথ্যে! সম্পূর্ণ মিথ্যে!

পম্পার চোখের সামনে একখানা সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ ভেসে উঠল। সে মুখের রেখায় রেখায় একটি নীরব প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশার ছাপ! যে মুখটা নিজে যতটা কথা বলে, তার থেকে বেশি বলায় সেই একঝোড়া পুরু কাঁচের চশমা ঢাকা চোখকে দিয়ে। সেই চোখ যেন পম্পাকে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখে প্রতীক্ষা করছে, 'কখন পম্পার সময় হবে।'

পম্পা মনে-প্রাণে তো তার কাছে পৌঁছে গিয়ে বসেই আছে, শুধু এই এক অর্থহীন জটিলতার পাক তাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে দিচ্ছে না। পম্পা রাতদিন ভাবছে কী করে এই জটিলতার জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

পম্পাকে একাই লড়তে হবে। তার মা ভাই, মামা, কেউই আর এখন পম্পার পক্ষে থাকবে না, সেটা অবধারিত। কিছুদিন আগেই যারা বলেছিল, 'এ বাড়িতে আর কিসের সুবাদে আসবে ও? ঐ তো আমাদের কুমারী মেয়ে'। তারা বদলে গেছে। তারা এখন পম্পাকে এই রায়বাড়ির বিধবা বউ ভাবতে শুরু করেছে।

তবে? লড়াইটা তো তাহলে পম্পার একার।

কিন্তু সত্যি আসলে পম্পা কী? কুমারী না বিধবা? পম্পার যেন কেমন গুলিয়ে যায় মাঝে মাঝে, আর তখন পম্পার নিজেকে ভারী অসহায় মনে হয়। তখন পম্পার যাকে দেখলে, রাগ দুঃখ অভিমান জ্বালা কিছুই দাঁড়াতে পায় না, তার উপর ভারী রাগ হয়। বসে বসে প্রতীক্ষায় প্রহর গুনবে কেন তুমি? লুঠ করে নিয়ে যেতে পারো না? মুক্ত করে দিতে পারো না পম্পাকে এই জটিল জাল থেকে?

সেই রাগটাই বুঝি এখন আছড়ে পড়ল, এক অশক্ত প্রৌঢ় দম্পতীর ওপর। অথচ কিছু আগেও কি ভাবতে পেরেছে পম্পা এঁদের মুখের ওপর বলে ওঠা যায়, ধর্মটর্ম বুঝি না আমি। আইনের কথাই হোক। বলুন কেন আমিই এবাড়ির সব? যেখানে বিয়েটাই আদৌ হয়েছিল কিনা সন্দেহ!

বউমা!

পূর্ণিমা রায়ের আর্তস্বর যেন ঘরের মধ্যের প্রবাহিত বাতাসকে টুকরো টুকরো করে দিল, হঠাৎ এসব কী বলছ তুমি মা? কার কী কুমন্ত্রণায় হঠাৎ তোমার এমন সন্দেহ? মা উত্তরবাহিনীর মন্দির চাতালে দাঁড়িয়ে তাকে সাক্ষী রেখে তোমায় আমি এই রায়বাড়ির কুললক্ষ্মী বলে বরণ করে নিইনি? সেকথা কি ভুলে গেলে? তারপর আকাশের বাজ ঐ

যে আমাদের মাথায় ভেঙে পড়ল আমরা শেষ হয়ে গেলাম। তবু সেই বরণটি তো মিথ্যে হয়ে যাবে না?

পম্পা কিছুতেই মানতে রাজী নয় সুশীলাবালার হিংস্র কুটিল মুখটা থেকে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কথাগুলো বেরিয়ে এসেছিল। তখন সেগুলোর কোনো মূল্য আছে, তবু পম্পার মনের মধ্যে অনুচ্চারিত কথার ঝড়, 'আকাশ থেকে বাজ ভেঙে পড়েছিল।' কিন্তু বিনা মেঘে কী? সেটা বলেতে পার আমার। যদিও আমার কথা বলছ না তোমরা। তোমাদের নিজেদের ভয়ঙ্কর ক্ষতির কথাটাই বৃহৎ করে দেখছ। তোমরা আমাকে ঠকিয়েছ। তোমরা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তোমারা একটা মূঢ় আশায় আমাকে তোমাদের বাসনার যুপকাঠে বলি দিয়েছ। আমি এসব বিশ্বাস করি না। কিন্তু তোমরা তো কর। তবে? তবে কেন বলব না তোমরা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। আর এখন আমার সর্বনাশের পূরণ করবার ভানে আমাকে কতকগুলো ঐশ্বর্যের লোভ দেখাতে আসছ। যে ঐশ্বর্য এখন তোমাদের জীবনে অর্থহীন বোঝা মাত্র।

হ্যাঁ ভিতরে বয়ে চলেছে এই দুরন্ত ঝড়। বাইরেটা স্তব্ধ!

সূর্যহারানো প্রভাতসূর্য অভ্যস্ত ভঙ্গীতে শূন্যে হাতটা বাড়িয়ে পম্পার হাতটা ছুঁতে চেষ্টা করলেন, পেলেন না সে হাতটা। পম্পার হাত এখন কোলের ওপর জড়ো করা।

হাতটা আবার নামিয়ে ফেলে প্রভাতসূর্য আস্তে বললেন, আইনজ্ঞ মানুষকে জিজ্ঞেস করেই তো এসব হয় বউমা। তিনি বলেননি বিয়েটা সম্পূর্ণ হয়নি। আইনের মতে 'সম্প্রদান' কালে এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে গেলেই বিবাহ সম্পূর্ণ। এবং সে যে আইনত উত্তরাধিকারিণী। তোমারই সব।

হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে বলে ওঠে, আমি চাই না। আমি চাই না। আমার এসবে কিছু দরকার নেই। আপনারা আপনাদের জিনিস মিশনে দিয়ে দিন। আমায় মুক্তি দিন।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতা! তারপর একসময় প্রভাতসূর্য বলে ওঠেন, এ যদি তোমার ভার লাগে তো থাক। তুমি যদি তাই চাও বউমা, তাই হবে। এই অভিশপ্ত বিষয়সম্পত্তি কোনো মিশনেই দিয়ে যাব। তাহলেও কি তুমি আমাদের ত্যাগ করবে মা?

পম্পা মুখ খোলে। সেই একখানি হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবিকে মনের মধ্যে আঁকড়ে ধরে কঠিন হয়। আস্তে বলে, আপনারাই আমায় ত্যাগ করুন, এই প্রার্থনা।

তা ত্যাগ করলেও তো পম্পাকে রায়বাড়ির গাড়িতেই চৌহদ্দি ছাড়িয়ে তাকে তার জন্মগৃহে পৌঁছে আসতে হবে। সঙ্গে সঙ্গিনীকেও দিতে হবে!

সুখদার মা অবাক হয়ে বলল, না খেয়েদেয়ে এখনই চলে যাচ্ছ যে?

পূর্ণিমা রায় বললেন, শরীর খারাপ লাগছে। পূর্ণিমা রায় হাত নাড়লেন যার অর্থ আর কথা নয়।

গাড়ি ছাড়বার আগে বুড়ো যথারীতি পিঠ ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাতে এসে সেই হাসিভরা মুখের কপালটা অভিবাদনটি দেখতে পেল না। মুখটা দুই করতলের আড়ালে

ঢাকা। কিন্তু বিচারাধীন বন্দী দীর্ঘদিন হাজতবাসের পর মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে পড়ার সময় কি থানার দেওয়ালে ইটকাঠগুলোর দিকে চোখ পড়ার ভয়ে ঢাকা দিয়ে বোরোয়?

কমলা অবাক হয়ে বলল, এখুনি চলে এলি যে?

এলাম!

কেন রে? কী হল? শরীর খারাপ? কমলার চোখে শঙ্কার ছায়া!

শরীর খারাপ হতে যাবে কেন?

তবে?

তবে আবার? চলে এলাম।

তোর কথার মানে বোঝা দায় বাবা। ওঁরা ছাড়লেন?

যাতে ছাড়েন তার ব্যবস্থা করে এলাম মা। ওই মিথ্যে বন্ধন থেকে চিরদিনের মত মুক্তি নিয়ে এলাম!

মায়ের মাথায় থানইটটা বসিয়ে দিয়ে পম্পা হঠাৎ অকারণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই মুখোমুখি হল সমুর।

দিদি! তুমি! যাব্বাবা!

কী হল? ভূত দেখলি নাকি?

আহা ভূত দেখা আবার কী। এই মাত্তর ভদ্রলোককে তুমি বাড়ি নেই বলে ভাগিয়ে দিলাম, আর তুমি–

পম্পার সমস্ত শরীর অবশ লাগল।

কাকে ভাগিয়ে দিয়েছে সমু, তা বুঝতে একটুও দেরি হল না পম্পার। নিথর গলায় বলল, কোন ভদ্রলোককে আবার ভাগালি?

তোমার অফিসের মল্লিক বলে আছে কেউ?

পম্পা হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়ল।

সেই তিনিই। বললেন মল্লিক বললেই বুঝতে পারবে তোমার দিদি! ভারী মজার কথাবার্তা ভদ্রলোকের আর কী জলি। বলেন কী, অ্যাঁ! আজ ও? ছুটি পেলেই শ্বশুরবাড়ি ছুটবে? নাঃ এ মেয়ের আর উদ্ধার নেই! তো আমি তোমার লজ্জা কমাতে বললাম, সক্কাল বেলাই গাড়িফাড়ি পাটিয়ে দেয়–কী বা করবে? হি হি করে হেসে বললেন, তা সত্যি কী আর করবে বেচারা! নাচতে নাচতে ছুটতেই হবে। বুঝলে হে সমু, কাউকে কব্জা করে ফেলতে একখানি ভালমত গাড়িই হচ্ছে বেষ্ট কলকাঠি। এমন মজার লোক! ইস! আর একটু আগে যদি আসতে দিদি। এই তো বাস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই, সোজা আসছি। বেরোচ্ছ কোথায়?

এমনি।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল সমু।

তার মানে সেও তার দিদির মাথায় একখানি থানইট বসিয়ে চসে গেল। হঠাৎ তাই মনে হচ্ছে পম্পার। সমু যেন তার মাথায় ধাই করে একটা ইট বসাল।

রত্নাকর! এ কী অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা তোমার। একদিনের জন্যেও তো তুমি আমার কাছে আসনি। আজই আসতে ইচ্ছে হল? রত্নাকর, গতকাল তো তুমি বলে ওঠনি, পম্পা কাল আমি তোমার কাছে যাব। তুমি কেন এসেছিলে, বলে গেলে না। একটু লিখে দিয়ে গেলেও পারতে? রত্নাকর! তুমি বলে গেছ এ মেয়ের আর উদ্ধার নেই। অথচ—তুমি যদি আর একটু পরে আসতে কিংবা আর একটুক্ষণ থাকতে, তাহলে আমি বলে উঠতে পারতাম রত্নাকর বেচারী মেয়েটা নিজেই নিজেকে উদ্ধার করে নিয়েছে। তুমি জান না কাজটা কী দুরূহ, কী কঠিন! তবু আমি—ওঃ। আর এই খবরটা তোমায় দেবার জন্যে আমায় অনেক অনেকগুলো ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে।

ভয়ানক একটা লোকসানের দুঃখে প্রাণটা হাহাকার করে উঠছে। কী কথা বলতে তুমি রত্নাকর? কোন কথা বলতে চলে এসেছিলে এতটা দূরে? উঃ তুমি কেন অনেকক্ষণ আগে এসে ফিরে গেলে না রত্নাকর? কেন, এইমাত্র থেকে চলে গেলে? তুমি যদি বিশেষ কোনো সেন্ট ব্যবহার করতে, তাহলে হয়ত এখনো এখানের বাতাসে সেই সৌরভ ভেসে বেড়াত।

পম্পার মধ্যে এমন সেন্টিমেন্ট! আশ্চর্য মনের মধ্যেটা যে কী বিচিত্র।

কিছুটা দূরে একটা পার্কের মত ব্যাপার আছে। যাকে একদা ঘটা করে নাম দেওয়া হয়েছিল চিলড্রেনস পার্ক! পম্পা সেখানে এসে একটা রেলিঙ ভাঙ্গা মরচেধরা লোহার বেঞ্চে বসল। পম্পা অনুপস্থিত লোকটার সঙ্গে কথা চালিয়ে চলল। আর হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলল, এখনকার এই লোকসানের হাহাকারে কিছুক্ষণ আগের একটা মস্ত হাহাকারের ভার যেন লঘু হয়ে গেছে। যে মুক্তিটা পম্পার বুকের ওপর কত জাঁতার মত চেপে বসেছিল, পম্পাকে যেন ধিক্কার দিচ্ছিল, যন্ত্রণা দিচ্ছিল, লজ্জা দিচ্ছিল, মুক্তিটাকে মুক্তি বলে অনুভব করতে দিচ্ছিল না, সেটা তার জাঁতার ভার নিয়ে সরে যাচ্ছে সত্যিকার মুক্তির স্বাদ অনুভব করছে পম্পা।

অপরাধবোধমুক্ত পম্পা এখন ভাবতে পারছে, আমিও তো একটা রক্তমাংসের মানুষ!

হয়ত এমনিই হয়। একটা ক্ষতির ওপর আরও একটা ক্ষতির বার এসে পড়লে, আগেরটা তুচ্ছ হয়ে যায়। এখন এই ক্ষতিটাই প্রধান হয়ে উঠেছে পম্পার কাছে, সেই বেলা দশটার আগে আর দেখা হচ্ছে না ওর সঙ্গে। কালও তো ছুটি!

ওঃ! যদি আমি পালিয়ে আসতে না পারতাম, কালকেও আমায় সেই এক স্বাচ্ছন্দ্যহীন নিরানন্দ অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে থাকতে হত। ভাবল পম্পা, আমার দুঃসাহস আমায় রক্ষা করেছে।

এখনকার সেই মরচে-ধরে-আসা উঁচু-গেট-দেওয়া বিশাল বাগানঘেরা, পুরনো পুরনো মস্ত বাড়িখানা পম্পার দিকে বিষণ্ণ অভিমানের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকছে না মৌন একটু

ধিক্কারের বাণী বহন করে। এখন মনে হচ্ছে ভাগ্যিস, খুব জোর পালিয়ে আসা হয়েছে! খুব জোর বেঁচে যাওয়া হয়েছে।

কমলা তার একান্ত সচিব ছেলেকে ডেকে চুপিচুপি বলল, তোর দিদির যে কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না। হুট করে চলে এল! ঝিঁটা বলল, 'শরীর খারাপ–' অথচ ও বলল শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? চিরকালের মতন চলে এলাম। আবার এসেই কোথায় চলে গেল।

সমু বলল, কোথায় আর যাবে? ওই চিলড্রেন্স পার্কের দিকে গেল মনে হল!

ওখানে কী?

কী আবার? সমু বলল, একা একা বসে থাকবে একটু।

ভাবটা ঠিক বুঝছি না। ওদের সঙ্গে কি মনোমালিন্য করে এল?

হতে পারে। সমু তার নতুন অভ্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে হাতের 'মাসল' ফোলাতে ফোলাতে মুচকি হেসে বলল, দিদি আবার একখানা বিয়ে করবার তাল করছে মনে হয়।

কী? কী বললি?

বারো ক্লাসের ছাত্র সমু তার ধাড়িধাড়ি বন্ধুবর্গের সঙ্গে মিশে তাদের ভাষাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। তাছাড়া মা তো তার 'ফ্রেণ্ড'। তাই অবলীলায় বলে উঠল, দেখে নিও। যা একখানা মারকাটারি বন্ধু জুটিয়েছে!

বন্ধু! কোথায় পাচ্ছে বন্ধু?

অফিসেরই হবে! দেখা করতে এসে দিদি নেই দেখে মনখারাপ করে চলে গেল!

আমি জানতাম! একদিন এই সর্বনাশই হবে, টের পাচ্ছিলাম। যা মনমেজাজ মেয়ের! উঃ! নির্বোধের ঢেঁকি। ও নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারতে বসলো!

কমলার মাথা চাপড়াতে ইচ্ছে করছে। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

সমু মাসল ফোলাতে ফোলাতে বলল, আমারই সুবিধে! বন্ধুদের কাছে লজ্জা করবে। ওরা বলবে এ মা! তোর দিদি এই!

এখন পম্পার জন্যে এই পৃথিবী!

বেশ কিছুক্ষণ পরে চলে এল পম্পা। কিন্তু এতক্ষণ ধরে অনেক চিন্তা করেও ঠিক করতে পেরে উঠল না। পরশু দেখা হওয়া মাত্রই বলে উঠবে কিনা, বেশ বুঝে বুঝে অভাগার বাড়ি বেড়াতে যাওয়া হল! অথবা 'ভুলে যাওয়ার' ভান করবে। যেন ব্যাপারটা কিছুই না। সে যদি প্রসঙ্গটা তোলে, বলে উঠবে, ও হ্যাঁ ভাই বলছিল বটে সেদিন। এটাই বোধহয় ঠিক হবে। প্রেস্টিজটা থাকবে।

কিন্তু পম্পার 'প্রেস্টিজটা' আর বজায় থাকল না। রত্নাকর সে প্রসঙ্গে গেল না। রত্নাকর পরের দিন– দেখা হওয়া মাত্রই বলে উঠল, চাকরিটা ছেড়েই দিন না মিসেস রায়। কেন আর একখানা চেয়ার দখল করে বসে থেকে কোনো একটা আভাগা বেকারের অন্ন মারছেন?

পম্পা চোখ তুলে তাকাল।

পম্পা তার দুদিন ধরে সাজিয়ে তোলা সমস্ত কথাগুলো ভুলে গেল। আর নিয়ত যা হয়, তাই হল! আজ হয়তো বেশিই হল। লোকটাকে দেখলেই তার মনের সব ভার যেন হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় কোথায় উড়ে যায়, লোকটার গলার স্বর শুনলেই পম্পার মুখে হঠাৎ আলোর ঝলকানি খেলে যায় আর লোকটার পুরু চশমার কাচের ওপার থেকে তাকান গভীর দৃষ্টি (যেটা তার অন্য ভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খায় না) দেখলে পম্পার যেন একটা ভয়ের অনুভুতিতে চেতনা অবশ হয়ে আসে।

এর সবগুলোই হল।

আবার তৎসত্ত্বেও পম্পা যেমন কথার সুরে আর ভাবে একটা হালকা চাল এনে, পায়ের তলার মাটি শক্ত করে, তাও করল। ওটাই তো আত্মরক্ষার উপায়। ভারী কথার ওপর ভারী কথা চাপিয়ে চললে, সে কথা কোথায় কোন অতলে টেনে নিয়ে যেতে পারে, কে জানে।

পম্পা বলল, জগতে কত লক্ষ অভাগা বেকার, আমি একা আর কজনের দুঃখ গোছাতে পারব।

রত্নাকরের চোখে আবার গভীর সমুদ্রের হাতছানি। যাতে ভয় করে। যাতে বুক কাঁপে।

লক্ষ লক্ষর যা হয় হোক, 'একটা' অভাগার প্রতি লক্ষ্য রাখলে ও তো তার দুঃখটা ঘোচে।

কিন্তু পম্পা কি সহসা সমুদ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তলিয়ে যাবে? পম্পার যে আত্মরক্ষার চেষ্টাটাই মজ্জাগত। তাই পম্পা বলে ওঠে, আমাকে কি আপনার খুব 'পরদুঃখকাতর' বলে মনে হয়?

পাগল! মোটেই না। রত্নাকরের হাসিতে কৌতুক ঝলসায়, ও ব্যাপারের ধারেকাছেও নেই আপনি। তবে হ্যাঁ—একটা সিগারেট বার করে হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে বলে, তবে হ্যাঁ, 'দুঃখী' ব্যক্তি যদি গাড়িবান, বাড়িবান, বিত্তবান, মানামান হল তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে অ-কাতরে দুঃখকাতর।

এই ভঙ্গী রত্নাকরের। আর এইটাই পম্পার কাছে পরম আর্কষণীয়।

বড় সাধারণ বাড়িতে জন্মেছিল পম্পা, মায়ের কথাবার্তা এতই ভোঁতা আর তুচ্ছ যে পম্পার দুঃখ হয়। বাবাও ছিল বড় সাদামাঠা আর মাঠো। কথাও যে একটা 'শিল্প' সাধারণ কথার মধ্যেও যে মাধুর্যরস পরিবেশন করা যায়, একথা পম্পার জানা ছিল না।

পম্পার ভাগ্যচক্র পম্পাকে যেখানে ঠেলে দিয়েছিল— সেখানে 'কথার' চাষ বিস্তর, কিন্তু সে চাষ তো বেনোঘাসের। যে দুটি সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে কিছু প্রত্যাশা থাকতে পারতো, তাদের তো পম্পা আস্ত অবস্থায় দেখেনি। অতএব সেখানেও কেবলমাত্র ভোঁতা কথার কারবার।

তাই পম্পা এখানে এত আর্কষিত।

পম্পা প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ওর বাকভঙ্গীর।

পম্পাও বুঝি ওর সংস্পর্শে এসে বুঝে ফেলতে শিখেছে কথাও একটা শিল্প। পম্পা হেসে ফেলে বলল হায় রত্নাকর! কবে আপনার 'বাল্মীকিত্বে' প্রমোশন হবে?

রত্নাকর চকিত হল। রত্নাকর যেন অকস্মাৎ চলার পথে মানিক কুড়িয়ে পেল। তাই সাহসী হল। বলে উঠল, দেবীর বরলাভের আগে আর আশা কোথায়? হতভাগ্য রত্নাকরকে দস্যুর ভূমিকাতেই থেকে যেতে হবে। নসিব!

ওই মুখের দিকে তাকিয়ে বরাবরের সাবধানী পম্পা হঠাৎ সাবধানতা ভুলল। পম্পা একটা পিছলপথে পা দিয়ে বসল, যে পথটা নদীর দিকের ঢালু! অথচ পম্পা এক মিনিট আগেও ভাবেনি, এমন অসতর্কতা করে বসবে। বলে ফেলল দস্যুর ভূমিকাতেই বা বীরত্ব দেখাতে পারলেন কোথায়? সেখানে তো স্রেফ ফেলিওর।

আর একবার চমকালো রত্নাকর। ওর একেবারে কাছাকাছি চলে এল। স্বভাব ছাড়া আবেগের গলায় বলে উঠল পম্পা! আজ আর কাজ নয়। ফাইলপত্তর সব ফেলে দিয়ে চল বেরিয়ে পড়ি।

বেরিয়ে পড়ি! কোথায়?

চুলোয়! জাহান্নামে! স্বর্গে! বেহস্তে! যেখানে হোক।

পম্পা কাঁপা গলাকে টাইট দিয়ে চাপা গলায় বলল, দস্যু মশাই, ধারেকাছে যারা আছে, ঘুরছে তারা কেউই কিন্তু 'কানা কালা' নয়।

কেয়ার করি না। ওঠো! ওঠো!

কী ছেলেমানুষী হচ্ছে?

দোহাই তোমার একদিন অন্তত ছেলেমানুষী করতে দাও। বেরিয়ে এসো তোমার মিসেস রায়ের খোলস থেকে।

পম্পা আস্তে বলল, বেরিয়েই তো এসেছি!

না, না, একসঙ্গে না। আমি আগে চলে যাচ্ছি। মিস ঘোষালকে বলে যাচ্ছি।

কী বলবে?

বলব যা হোক!

সত্যিই ফাইলপত্তর গুটিয়ে রেখে 'বিশেষ একটু দরকার আছে' বলে নেমে গেল পম্পা। সেও তো পারছিল না স্থির হয়ে থাকতে।

রত্নাকর রাধামোহনের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলে উঠল, রায়চৌধুরী, কাট মারছি! একটু ম্যানেজ করে নেবেন। বাজারে জোর গুজব রাজ্য লটারীর ফার্স্ট প্রাইজটা না কি আমার নাম্বারে উঠেছে।

ঝোড়ে বাতাসের বেগে বেরিয়ে গেল। নেমে দখল পম্পা ইতিমধ্যেই একটা ট্যাক্সি ধরেছে। কাছে চলে সে নিচু গলায় বলল, উঃ! কী শার্প ব্রেন! ঠিক এই সময় এই

জিনিসটিরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তোমাকে নিয়ে কী করতে ইচ্ছে হচ্ছে জানো? লোপালুপি! গাড়িতে উঠে বসল। বলল পম্পা! আমরা কী মুখ্যু! জীবনের কতগুলো দিন নষ্ট করলাম।

পম্পা বলল এমনও হতে পারে আমরা দারুণ বুদ্ধিমান। দিনগুলোকে বেহিসেবি খরচ করে না ফেলে ব্যাঙ্কে জমা করেছি!

হয়ত তাই। কিন্তু আর নয়। এবার উড়নচণ্ডী হয়ে যাই। চলো দুজনে রেজিস্ট্রেশন অফিস, নোটিশটা দিয়ে আসি।

পম্পার হেসে ফেলা ছাড়া গতি হয় না।

কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, হা ভগবান! আমি কি শেষে এক পাগলের পাল্লায় পড়লাম।

এতে পাগলের কী হল? জানো অন্তত এক মাস আগে নোটিশ দিতে হয়। আর কোনো মালিকহীন সাবালক মিসেসকে বিয়ে করতে কোনো অবজেকশন উঠতে পারে না।

কিন্তু গার্জেনদের— না, না, এক্ষুনি হয়ত 'গার্জেন' কথাটায় আপত্তি তুলবে তুমি। বলবে 'আমরা সাবালক'। তাই গার্জেন না বলে গুরুজনই বলি। গুরুজনেদের একবার না জানিয়েই এসব করতে আছে ?

ঠিক! ওঃ! সাধে বলেছি ব্রেন কী শার্প। যখন যেটি দরকার ঠিক মনে পড়বে। যাক বাবা! বাঁচা গেল। আমিও আমার দাদার মত বাকি জীবনটা বসে খেতে পাব! বলো আগে তোমদের বাড়ি, না আগে আমাদের বাড়ি।

আগে তোমাদের।

রত্নাকরের বউদি খুসিতে উচ্ছ্বসিত হল।

নিঃশব্দে ডুবে ডুবে জল খাওয়ার জন্যে দেওরকে গঞ্জনা দিল, পম্পাকে কাছে বসিয়ে খুব আদর করে চা মিষ্টি খাওয়ালো, এবং 'শুভস্য শীঘ্রং' এই শাস্ত্রবাক্যটি মনে করিয়ে দিল।

আর তক্ষুনি বিয়ের বাজারের ফর্দ করতে বসল। কিন্তু আড়ালে এসেই সুধাকরকে বলল, আশ্চর্য বাবা! তোমার ভাই আর কনে খুঁজে পেল না? বিধবা হোক তাতে কিছু না। বিদ্যেসাগরের অশরীবী আত্মার আর্শীবাদ পাবে। কিন্তু কী রকম বিধবা জানো? ফুলশয্যা হয়নি। বরকনে নিয়ে ঠাকুরমন্দিরে পূজো দিতে গিয়ে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট।

সুধাকর বলল, তাই নাকি? তাহলে তো 'বিধবাই নয়? বলতে গেলে আইবুড়োই ।

তা অবশ্য। তবে মনে একটু খটকা লাগছেই। অ্যাক্সিডেন্টে খতম, বিয়েটা সম্পূর্ণ না হতেই বরের বাবা অন্ধ আর পঙ্গু এবং মায়ের হার্ট জখম। অথচ কনে ঠিক রইল। 'পয় অপয়' বলে একটা কথা আছে তো?

সুধাকর বলল, ওটা কোনো কথাই নয়। ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়।

জানিও সব, বুঝিও সব। তবু মনে যেন কাঁটা ফুটছে। তবে হ্যাঁ প্রেমটি জব্বর। ওই মেয়ের শ্বশুরবাড়ি তো নাকি বেশ বড়োলোক, বরটা ছিল বাপের একমাত্র সন্তান। কাজেই যথাসর্বস্ব এই বউই পেতে পারতো। তারা নাকি আদরও করতো খুব। সেসব লোভ ছেড়ে চলে এসেছে তো।

উদোমাদা সুধাকর হঠাৎ একটা একদম মেয়েলি কথা বলে বসল। বলল, তার মানে সেই যে বলে যে যার বর, যে যার কনে। প্রথম বিয়েটাই একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট'। খোকাই এর আসল বর।

মেয়েলি কথাটা বলে ফেলেই একটু লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা মুখের সামনে মেলে ধরে।

ওর যথেষ্ট সৌজন্য করেছিল মানে সুধাকবরা! কমলা চক্রবর্তীর সৌজন্যের ধার দিয়ে গেল না, বলল 'সুখ' কপালে থাকলে, ওই একবারই হতে পারত।

আর পম্পা যখন বলল, ও তোমায় প্রণাম করবে– তখন বলল, থাক থাক। এইখান থেকেই আশীর্বাদ করছি।

পম্পা ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলল, তা একবার দেখবেও তো? না সেই পাপীর মুখ দেখবে না?

আহা। দেখব না বলেছি ? তবে এ তো আর 'নাপিতে পুরুতে' বিয়ে নয় যে কিছু করণকারণ আছে। কাগজে কলমে লেখাপড়া করা বিয়ে। ওসব তো বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপার। আমার জন্যে তো আটকে থাকবে না!

কমলার মন ভেঙে যাচ্ছে মেয়ের দুর্মতিতে। সেই তাদের অত আদর ভালবাসা, অত বিষয়আশয়, সব পায়ে ঠেলে তুমি নতুন একটা বিয়ে করতে নাচছো। এটা কি খুব বুদ্ধির কাজ হচ্ছে? গৌরবের তো আর রইল না কিছু।

কমলা চক্রবর্তীর দরজায় আর এখন মস্ত গাড়ি এসে দাঁড়াবে না। কমলা চক্রবর্তীর মেয়েকে মাথার মণি করে নিয়ে যাবে না। কমলা চক্রবর্তীর ঘরে ঘরে থরে থরে এত উপঢৌকন এসে পড়বে না। যা সে পাড়াপড়শীকে দুহাতে বিলোতে পারে। এরপর লোকের সমালোচনা, আর নিজের মুখ হেঁট।

বিধবা মেয়ে বিয়ে করলে কার মুখ উজ্জ্বল থাকে? ত্যাগের বড়ো আদর্শ আছে? মেয়েমানুষের এত ভোগসুখে লোভ থাকা উচিত নয়।

রত্নাকর এই দুই গুরুজনের সঠিক মনোভাবের হদিস জানে না। ও জানে ওর দাদা বউদি এতে বেদম খুশি! আর পম্পার মা লাজুক বলেই ভাবী জামাইয়ের সঙ্গে গল্প জুড়তে বসতে পারল না। অতএব রত্নাকরের কোনোখানে নেই আনন্দের ঘাটতি। রত্নাকর হাওয়ায় পা ফেলে হাঁটছে। রত্নাকর অপেক্ষার দিনগুলোকে এক ধাক্কায় ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে।

তবে পম্পা সকলেরই মনের হদিস পেয়ে গেছে। ওটা মেয়েদের সহজাত। তবু পম্পারও নেই আনন্দের ঘাটতি। পম্পার দিনরাতগুলো কাটছে অনির্বচনীয় একটি সুখের স্বাদে।

পম্পা তো কোনোদিন জানেনি, প্রেম বস্তুটার স্বাদ কী? পম্পার কোনোদিন একছিটেও বাল্য প্রেম, কৈশোর প্রেমের অভিজ্ঞতা ছিল না। তার জীবনটা বড় সাধারণ ছিল। মা বাবা, ছোট্ট ভাইটি আর স্কুল কলেজকে কেন্দ্র করেই পম্পার বাল্য-কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে। আর নবযৌবনের দিনগুলি কাটছিল প্রাণ ভেঙে-যাওয়া পিতৃশোক আর সংসারের হাল ধরবার চিন্তায় দিশেহারা অবস্থায়। এই মেয়েটার ওপর বাবার ছিল বড় ভালবাসা আর আশা। মেয়ে বি. এ. পাশ করল, না অজিত চক্রবর্তী রাজ্যপদ পেল তা সে আহ্লাদ আর কদিন ভোগ করতে পেল সে?

বাবা অত তাড়াতাড়ি চলে না গেলে, আমার এম এ-টা পড়া হতো। এ দুঃখ মর্মে মর্মে বিঁধে আছে পম্পার। সেই পম্পার ওপর হঠাৎ যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল চিলের ডানার ঝাপট। পম্পাকে বিধ্বস্ত করে দিল। পম্পা জগৎ সংসারের দিকে তাকাবারই বা সময় পেল কখন?

না, পম্পা কোনোদিন জানতে পারেনি, পুরুষের মুগ্ধদৃষ্টি হৃদয়ে কী মোহ বিস্তার করে। পম্পা জানতে পারেনি প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে পারার স্বাদ এমন অনির্বচনীয়।

পম্পাকে যখন তাঁতির মাকুর মত, অবিরত উত্তরপাড়া আর অফিসপাড়া, অফিসপাড়া আর পূর্বপাড়ায় আনাগোনা করতে হচ্ছিল, পম্পার ভিতরে প্রত্যাশার দানা বাঁধতে পায়নি। পম্পা স্বপ্ন দেখতেও সাহস পায়নি, সে একটা 'জীবন' পাবে।

সেই 'জীবন' এসে তার হতে ধরা দিচ্ছে।

এই সুখমগ্নতার মধ্যে পম্পার ওপর তেমন তীক্ষ্ণ রেখা বসাতে পারছে না মার বরফ-শীতল ব্যবহার, ভাইয়ের অপছন্দর দৃষ্টি। যদিও পম্পা ভাইকে বলেছে, যাক চাকরিটা তো আর ছাড়তে হল না আমার। তুই নিশ্চিন্দি হয়ে পড়াশুনা করবি। যতদিন না তোর কোনো রোজগারপাতি হচ্ছে, আমি আছিই। 'তবু সমুর দিদির ওই 'মারকাট বন্ধুটার' সঙ্গে বিয়েয় বসাটা আদৌ পছন্দ হচ্ছে না। নিজেকে কেমন নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে।

নিষ্প্রভ তো বটেই। পড়াশোনায় এতই বাজে, যে এমন আশা কোনোদিন করতে পারেনি পম্পা ছোট ভাইটিকে সে 'অনেক বড়' হবার সুযোগ দেবে, প্রাণপাত করেও বাইরে -টাইরে পাঠিয়ে পড়াতে, বাবার আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারবে। বরং এখন যা নমুনা দেখা যাচ্ছে, পাড়ার একটা নামকরা মস্তান হয়ে ওঠা ছাড়া বোধহয় সমুর আর কোনোদিকেই নামটাম করার সম্ভাবনা নেই। তাই সমুর 'অপছন্দ' পম্পাকে বিচলিত করতে পারছে না।

অফিসসুদ্ধ লোকের জানা হয়ে গেছে খবরটা। অনেকেই 'দেঁতো' অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। এখন অতএব 'দুজনে একসঙ্গে' বেরিয়ে পড়ায় লজ্জার আড়ষ্টতা নেই। বেরিয়ে পড়ে কোথায় না কোথায় চলে যায়। অবশ্য কলকাতার মধ্যেই! শুভদিনটি আসার মধ্যে দুটো ছুটি পড়ল। পর পর মাসের দ্বিতীয় শনিবার আর রবিবার। রত্নাকর বলল, চলো

দীঘায় বেড়িয়ে আসি।

পম্পা বলল নাঃ! একেবারে অধিকারের দাবি নিয়েই তোমার ঘরে প্রবেশ করব।

আহা, আমি তো বলছি না সেখানে গিয়ে তোমায় আমার ঘরে প্রবেশ করতে হবে। না হয় দুটো ঘর বুক করব। তোমার কৌমার্য অটুট থাকবে। গ্যারান্টি!

অসভ্যতা কোরো না বলছি। অন্যেরা বিশ্বাস করবে?

অন্যেরা তো অবিশ্বাস করার জন্যে মুখিয়েই থাকে।

সেই তো। তাই বলছি, তাদের সুযোগ দিতে যাব কেন মরতে? সারাদিন মাঠে চরে রাতের বেলা গোঠে ফেরাই ভাল। তা তুমি যেটা ভাল বলবে, সেটাই ভাল।

উঃ। কী বাধ্যতা! আসলে দেখো তোমার দাদা-বৌদি ও আর আমার মা-ভাই এই গার্জেনকুল ভাবতেও তো পারেন আর কটা দিন সবুর সইল না?

ঠিক আছে। দাহলে দুটো 'হোল ডে' মেঠো প্রোগাম ঠিক করে ফেলো।

সেই প্রোগ্রামেই ঘোরা হল দুদিন। সেই চিরপুরাতন ঠাঁই বোটনিকস, ডায়মণ্ডহারবার, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর। তবু কী 'নতুন' হয়ে দেখা দিল।

মনের মধ্যে ভাবপ্রবণ গুঞ্জরন, 'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে! অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে–'

কিন্তু মুখে তো ওসব প্রকাশ করা চলে না, তাই শুধু কথার স্রোতে ভাসা–

এই জানো, বউদি সাধ মিটিয়ে, এখন এনতার শাড়ি কিনছে। যে আমার কেনার জন্যে কিছু রাখছে না।

পম্পা একটু কেঁপে ওঠে! তার তো শাড়ির গোনাগুনতি নেই! কিন্তু সে সবই তো ওদের দেওয়া। তৎক্ষণাৎভাবে ওগুলো সমুর বউয়ের জন্যে রেখে দেব। অতএব বলে ওঠে, এত বেশি নিয়ে কী হবে? একসঙ্গে দুশো শাড়ি পবা যাবে?

ওরে বাবা! এ যে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর বাণী! একসঙ্গে তো দুটো জিনিস ভোগ করার ক্ষমতা মানুষকে দেননি তার সৃষ্টিকর্তা। তবু মানুষ দুটো চারটে গাড়ি রাখে, দুটো দশটা বাড়ি বানায়, দুশো পাঁচশো পোশাক জমায়, আর–একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, পাঁচশো সাতশো বেগম ধরে এনে হারেমে পোরে।

তোমার সব কথাতেই ইয়ার্কি! বনে আলোজ্জ্বলা চোখে তাকায় পম্পা।

এই ঔজ্জ্বল্য, এই খোলা আকাশ পম্পার জন্যে ছিল। ভাবা যায় না।

এই লোকটার সান্নিধ্যে এলেই, আর মনে পড়ে না, জীবনে কোনো জটিলতা আছে। কোনো ভারাআছে।

সহজ হওয়ার কী সুখ। নির্ভার হওয়ার কী আরাম।

কিন্তু পম্পার সৃষ্টিকর্তা কি পম্পার জন্মলগ্ন নির্ধারণ করার কালে বড় বেশি ভারাক্রান্ত

ছিলেন? কিংবা ভয়ানক কোনো যন্ত্রণায় হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন? তাই আবার এই ঘটনাটা ঘটিয়ে বসলেন, পম্পার জন্যে?

দশদিনের মত ছুটি নিয়ে পম্পা যখন মস্ত একটা স্বস্তি নিয়ে বাড়িতে এসে ঢুকল কমলা চক্রবর্তী গিয়ে এসে বললেন, আইনত তো তুমি এখনো উত্তরপাড়ার রায়েদের বাড়ির বউ? তোমার অন্য ব্যবস্থা বোধহয় ওরা জানেও না। তাই খবর একটা দেওয়া বিবেচনায় এইমাত্র খবরটা দিয়ে গেল, তোমার শাশুড়িটি মরলেন। হঠাৎ হার্টফেল। বাড়ির কেউ নয়, গাড়িও পাঠায়নি, পাড়ার কোনো জ্ঞাতি হবে, বলে গেল! বলে গেল তোমায় একটু জানাতে।

পম্পার আর এখন কী করার আছে, খালি পায়ে নম্র মুখে উত্তর পাড়ার রায়বাড়ির সেই দেউড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া?

দেখল, দেউড়ির সামনেই নামানো হয়েছে তখন, সৌভাগ্যবতী পূর্ণিমা রায়ের বেনারসী শাড়ি মোড়া মাথায় গাদাখানেক সিঁদুরটানা সুন্দর দেহটা। বোধহয় পূর্ণিমা রায়ের বিয়ের বেনারসীটা বেরিয়েছে সিন্দুক থেকে।

পম্পাকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে ছুটে এল অনেকে।

অদ্ভুত একটা ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে পম্পা সেই অলৌকিক সৌন্দর্যের দিকে।

আর দুদিন পরেই পম্পার জন্যে মজুত ছিল এই সাজ। বেনারসী কেনা হয়েছে রত্নাকরদের বাড়ি থেকে। এমনি সোনাঢালা একটা বেনারসী। নিশ্চয়ই কেনা হয়েছে কৌটাখানেক সিঁদুর।

এই মহিলা পম্পার সেই সাজটাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।

অনেক রাত্রে, শ্মশানযাত্রীরা ফিরে আসার পর প্রভাতসূর্য অনুভব করলেন পম্পা এসেছে।

খুব শান্তভাবে বললেন, তোমাকে আবার কে জ্বালাতন করতে গেল! আমি তো তোমায় আসতে বলিনি মা!

পম্পা আস্তে বলল আমি তো আপনার অবাধ্য মেয়ে বাবা! আমায় যেতে বলেননি, তবু চলে গিয়েছিলাম। এখন আসতে বলেননি, তবু এসেছি।

রত্নাকর বলেছিল, হঠাৎ উদারতার নেশায় সর্বস্বান্ত হয়ে দান করে বলার মধ্যে সাময়িক উন্মাদনা থাকতে পারে পম্পা, কিন্তু সে উন্মাদনা কেটে গেলে? তারপর?

পম্পা চোখ তলে একটু হেসে বলেছিল, তারপর আর কী? দিন কাটিয়ে চলা। শুধু দিন কাটিয়ে চলায় জীবনটা কাটবে কী করে ভেবেছ?

জীবন? না, ওটা নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না রত্নাকর। দিনগুলো নিয়েই কথা।

সেটাই বা কী কাটবে আমায় বল! ওই এক আরো অধিক শোকগ্রস্ত পঙ্গু অন্ধ বুড়োর

সেবা করে? ওঁর তো টাকার অভাব নেই।

চারটে নার্স রাখুন না।

সে হয় না।

কেন হয় না?

ভেবে দেখছি এটাই বোধহয় আমার নিয়তি।

রত্নাকর তীব্র হয়েছিল, ছাড়ো ওকথা। লোকে কী ভাববে জানো? ভাববে তুমি বিষয়আশয়ের লোভের জন্যেই শেষ পর্যন্ত আটকা পড়ে গেলে।

লোকে তো এই রকমই ভাবতে অভ্যস্ত।

আমি তবু বলছি পম্পা এতবড় ভুল কোরো না। ভেবে দেখ এই পুরনো প্রাসাদে বন্দিনী হয়ে থেকে তোমার দিনগুলো কাটবে কোন উপায়ে?

পম্পা একটু হাসল, এদের লক্ষ্মীর ঘর গুছিয়ে, রুপোর বাসন সামলে, চওড়া চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো পুরনো পুরনো অয়েলপেন্টিং ঝেড়ে, বড় বড় আরশি আর সুন্দর সব পুরনো পুরনো পোর্সিলিনের পুতুল আর ফুলদানী মুছে আর লোকজনের ওপর খবরদারি করে। দিন কাটার আবার ভাবনা।

তা বটে কাটলে ছুরি দিয়েও কেটে নেওয়া চলে। কিন্তু পম্পা, একবার অন্তত ভেবে দেখ, তুমি একটা রক্ত মাংসের মানবী।

পম্পা রত্নাকরের হাতের এপর একটা হাত রাখল। বলল, সেটা ভেবে দেখেই তো হয়েছে মুশকিল। মানবী বলেই তো মানবিকতার দায়।

বেলাদি



সকালবেলায় ডাক এল। আমরা সবাই চা খাচ্ছিলাম। যাকে বলে প্রাতঃরাশ। আমাদের কাজের লোক বাবুলাল মায়ের হাতে দুটো চিঠি দিল। একটা কোন শ্রাদ্ধের চিঠি, একটা আমার মাসির চিঠি। আমার মা মাসির চিঠিটা পড়তে লাগলেন, আমি শ্রাদ্ধের চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করেই আঁৎকে উঠে প্রায় ক্রন্দনবিজড়িত সুরে বললাম, 'মা বেলাদি-'-

'কী বেলাদি?' মা তাকালেন। বাবাও মুখ থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'কে বেলা দি?'

আমি টেবিলের উপর হাতের ভাঁজে মাথা রেখে মুখ ঢাকলাম।

বেলাদি আমার বালিকা বয়সের স্বপ্ন। আমার যখন দশ বছর বয়েস বেলাদির তখন পনেরো। পনেরো বছর বয়সে ছিপছিপে সদ্য তরুণী বেলাদির কোনো তুলনা আমি পাইনি। বেলাদি আমাকে লেখাত, পড়াত, সাজাত, নিয়ে বেড়াত। আমি বেলাদির একনিষ্ঠ ভক্ত, এখনকার ভাষায় চামচে। বেলাদি বিহনে আমি আধখানা মানুষ। এই শ্রাদ্ধের চিঠিটি সেই বেলাদির মৃত্যুতে।

বেলাদির বাবা জগদীশ কাকাবাবু আমার বাবার সহপাঠী ছিলেন। একসঙ্গে ওঁরা ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। তারপরে যে যার পথে কে কোথায় ছিটকে গিয়েছিলেন, হঠাৎ আবার প্রৌঢ় বয়সে মিলিত হলেন চুঁচুড়া শহরে এসে। আমার বাবা সেখানে সরকারি স্কুলের হেডমাস্টার, জগদীশ কাকাবাবু মুন্সেফ। অনেকদিন পর্যন্ত অবশ্য কারো সঙ্গে কারো যোগ ছিল না। বাবাও জানতেন না জগদীশ কাকাবাবু মুন্সেফ হয়ে চুঁচুড়া এসেছেন, জগদীশ কাকাবাবুও জানতেন না, হেডামাস্টার হয়ে বাবা সেখানে আছেন। বেলাদির ছোট ভাই মন্টুর মারফতই, জানাজানিটা হল। মন্টু বাবার স্কুলে পড়ত, তার ব্যাপারেই জগদীশ কাকাবাবু একদিন স্কুলে হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে এসে বাল্যবন্ধুকে দেখে অবাক।

বেলাদির তিন বোন। লীলা, ইলা, বেলা। ভাই দুজন, ছোটটি মন্টু। ভাল নাম সুব্রত। জগদীশ কাকাবাবু এমনিতে বেশ ভালমানুষ, আমাদের কত ভালবাসতেন আদর করতেন, কিন্তু সাংঘাতিক কড়া। বাড়িতে সবাই তাঁর ভয়ে একেবারে তটস্থ। কাকিমা মানে বেলাদির মা ছিলেন আবার তেমনি নরম। দেখতেও খুব সুন্দর। সব সময় চকিত ভাব, অসহায় ভাব।

আসলে জগদীশ কাকাবাবুর মধ্যে দুটো রেখা খুব স্পষ্ট ছিল। একটি রেখায় পরাধীন স্ত্রীলোকের চার দেয়াল, আর একটি রেখায় স্বাধীন পুরুষের অনন্ত আকাশ। তিনি অমোঘ ভাবে বিশ্বাস করতেন পুরুষের সেবার জন্যই স্ত্রীলোকের জন্ম। তাদের দেবজ্ঞানে পূজো করাই তাদের ধর্ম। বলতেন, স্ত্রীলোক মাটির ভাণ্ড, ঠুং করে লাগল কি গেল। পর্দাপ্রথায় বিশ্বাসী। বড় দুই মেয়ে লীলা ইলাকে তিনি অতি অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন, বেলাদির জন্যও পাত্র দেখা হচ্ছিল। কিন্তু বেলাদি নারাজ। কেঁদে-কেটে হাট বসিয়ে ভণ্ডুল করে দিচ্ছিল সব। লীলাদি ইলাদিও সেটা খুব জোরের সঙ্গে সমর্থন করছিলেন। এখন বাবার উপরে কথা বলার সাহস হয়েছে একটু। কতদিন আগে বিয়ে হয়ে গেছে, তিন বাচ্চার মা হয়ে গেছে, তাই সাহসও বেড়েছে খানিকটা।

লীলাদি নাকি লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিল। ম্যাট্রিকে বৃত্তিও পেয়েছিল একটা। কলেজে ভর্তি হবার স্বপ্ন দেখছিল। কাকা বাবু বললেন 'ঐ ঢের'। জন্মেছে তো মেয়ে হয়ে,

সেই তো পরের ঘরে হাঁড়ি ঠেলবে আর কাঁথা কাপড় কাচবে, বেশি বিদ্যা দিয়ে করবেটা কী? এই বলে লীলাদির চেয়ে বারো বছরের বড় এক উকিলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। নাকের জলে চোখের জলে ভেসে লীলাদি চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। ইলাদিকে বিয়ে দিলেন আরো আগে। বললেন, 'সেই বিয়ে তো দিতেই হবে, তাই ভাল পাত্র পেলাম দিয়ে দিলাম।'

ইলাদির পরে এক ভাই সুপ্রিয়, তারপর বেলাদি তারপর সুব্রত।

লেখাপড়ায় বেলাদিও ভাল। বাবা বলতেন, 'কী তুমি বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোকে ধরে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছ। অন্তত বি.এ-টা পাশ করতে দাও।' কাকাবাবু বলতেন, দেখো, উলুখড়ের পাখা হয় মরিবার তরে। মেয়েদের বেশি লেখাপড়া সেখানোটাও ঠিক তেমনি পাখনা গজানো। পাখনা গজালেই মরবে।'

তর্ক করা বৃথা। কাকাবাবুর ঐরকমই ধারণা।

মফঃস্বল শহরে ডেপুটি মুন্সেফ হাকিম ইত্যাদিদের খুব সম্মান। কাকাবাবুরা গঙ্গার ধারে সুন্দর একটা বাড়িতে থাকতেন, আমি সব সময়েই আছি সেখানে। বেলাদি ক্লাস টেনের ছাত্রী, আমি সিক্স। কিন্তু এই অসম বয়েস আমাদের বন্ধুত্বের বাধা হয়নি। প্রথম দিকে স্নেহের অংশটা বেশি ছিল, দিন কাটতে কাটতে সেই স্নেহের সঙ্গে প্রেম-প্রীতিরও মিলন হলো। আর তারপর আমার যখন চোদ্দ, আর বেলাদির যখন উনিশ তখনই কাকাবাবুর বদলি হবার পরোয়ানা এলো। বেলাদি ততোদিনে আই . এ. ও পাস করে গেছে। বি. এ. তে ভর্তি হবার জন্য ঝুলোঝুলি করছে । কাকাবাবু প্রবল বেগে পাত্র খুঁজছেন, দিদিরা বিরোধিতা করছে। এইরকম অবস্থায় আমাকে অশ্রু সাগরে ভাসিয়ে এক রাত্রে বেলাদিরা চুঁচূড়া শহর ত্যাগ করল। তারপরে কয়েকদিন বিরহযন্ত্রণা ভোগ, ঘন ঘন চিঠি লেখালেখি, যথারীতি এইসব চলেছিল, আবার তারপরে যথারীতি ঢিলে হয়ে এল সেই আবেগ। একদিন দেখা গেল কখন যেন সব বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ চিঠিতে জেনেছিলাম বেলাদি বেথুন কলেজে ভর্তি হয়েছে। হস্টেলে আছে। আর তারপরে চার বছর বাদে এই সংবাদ।

চার বছর অমন কিছু সাংঘাতিক দীর্ঘ সময় নয় যে অত মধুর স্মৃতি মন থেকে মুছে যেতে পারে। চিঠিপত্র নাইবা লেখা হল, তাতে কী? বেলাদি আমার অন্তরে সব সময়েই আছে। পুরনো কথা উঠলেই সর্বাগ্রে বেলাদি উঠে আসে আমার মনের উপর তলায়। সুতরাং তার মৃত্যু আমার পক্ষে অসহনীয় ।

আমার মার চোখেও জল এল, বাবাও চোখ নিচু করে স্থির হলেন। আর তারপরে আরো দুবছরের ব্যবধানে শোকের উপর প্রলেপও পড়লো।

ইতিমধ্যে অবসর হয়ে গেল বাবার। আমরা আমাদের কলকাতার বাড়ি বালিগঞ্জে চলে এলাম। বি. এ. পাস করে এম. এ. তে ভর্তি হলাম।

একদিন বাবা মাকে বললেন,'জগদীশ তো বর্ধমানে আছে। অত বড় একটা শোক

পেয়েছে। চল ওদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

মা বললেন 'আমার যেতে মন সরে না। বেলা আমার মেয়েই ছিল, ওর মৃত্যু আমার বুকেও কম শেলবিদ্ধ করেনি। কী বলব গিয়ে? কী দেখব গিয়ে!'

আমার মন নতুন কষ্টে ভরে গেল। সেই রাত্রে আমি সারা রাত ধরে বেলাদিকে স্বপ্ন দেখলাম।

দিন তিনেক বাদে আমি যখন কলেজ থেকে ফিরছিলাম, বাস থেকে মাত্র নেমেছি, তাকিয়ে দেখলাম, দূর থেকে কে যেন প্রায় ছুটে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি থামলাম, আর তারপরেই দুই চোখ আমার বিস্ফারিত হয়ে গেল। টুকটুকে চেহারায় বেলাদি এসে জড়িয়ে ধরলো আমাকে।

আমার স্তম্ভিত অবস্থা দেখে বেলাদি হেসে বললো, 'কী রে চিনতে পারছিস না!'

আমার মুখ দিয়ে কথা সরলো না, থমকে থেকে বললাম 'তুমি'!

'ভাবছিস আমার ভূত না?'

'কিন্তু —'

'শ্রাদ্ধের চিঠি পেয়েছিলি তো?'

'ওটা কি তবে একটা ঠাট্টা?'

'না। সত্য।'

'কী হয়েছে ঠিক করে বল। আমার কী রকম লাগছে।'

'আমি বিয়ে করেছি'।

'তার সঙ্গে কাকাবাবুর নামে বাজে ইয়ার্কি করে এরকম চিঠি লেখার কী অর্থ?'

বেলাদি হাসতে হাসতে বলল, 'যাকে বিয়ে করেছি সে যে আমার স্বনির্বাচিত পাত্র অতএব চরিত্র ভ্রষ্ট কন্যাকে বাবা মৃতকন্যা হিসেবে জ্ঞান করে সর্বত্র, সব বন্ধু বান্ধবের কাছেই শ্রাদ্ধের চিঠি পাঠিয়েছেন। আমিও একখানা পেয়েছিলাম। শুনেছি বেশ ঘটাপটা করেই ঠাকুর-পুরুত ডেকে শ্রাদ্ধ করেছেন।'

'সে কী!'

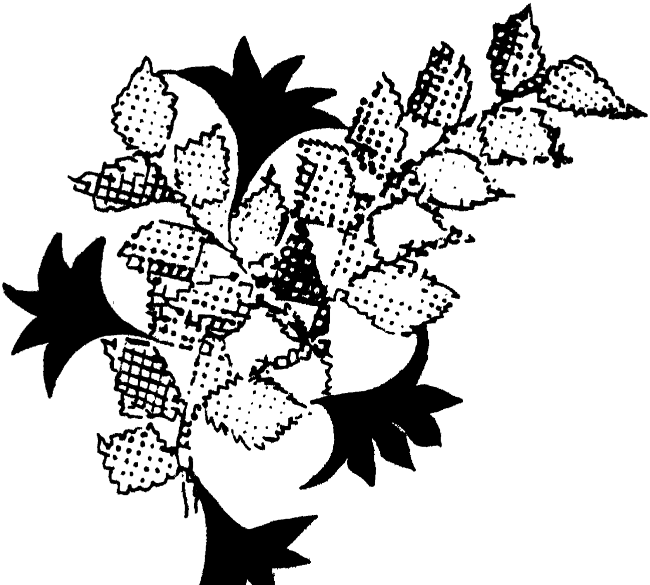
'অথচ যাকে বিয়ে করেছি অযোগ্য নয়তো বটেই দৈবক্রমে স্বজাতিও। আপত্তির কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু আমি প্রেম করে বিয়ে করবো এর চেয়ে গুরুতর অন্যায় তিনি আর কিছুই ভাবতে পারেননি। আটকেও দিয়েছিলেন, আমি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছি। সুখে আছি। মায়ের মনেও কষ্ট হয়। শুনেছি এ ব্যপার নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাবার খুব ঝগড়া হয়। জীবনে এই প্রথম মা সাহস করে সন্তানের জন্যে বাবার বিরুদ্ধে কথা বলেন।'

তারপর?

'তারপর আবার কী?' স্বামীর টাকায় যাদের খেতে হয়, থাকতে হয়, সমাজের কাছে

'মান-সম্মান বজায় রাখতে হয়, তাদের গতি তো স্বামীই। আছেন সেখানে। গোপনে চিঠি লেখেন আমাকে।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। চুমু খেয়ে বলল, 'মেয়েরা যদ্দিন ইকনমিকেলি ইনডিপেনডেন্ট হতে না পারবে ততোদিন তাদের এই দশা ঘুচবে না বুঝলি? সেই ভেবে নিজেকে তৈরি করিস।



যুদ্ধ



ওল্ড বালিগঞ্জের এক নিরিবিলি রাস্তায় ট্যাক্সিটা ঢুকতেই অমল চেঁচিয়ে উঠল, 'রাখিয়ে সর্দারজী, রাখিয়ে—'

'বেশখ্ —' বলেই বিশাল চেহারার শিখ ট্যাক্সিওলা গাড়িটাকে রাস্তার একধারে দাঁড় করিয়ে দিল।

ব্যাক-সীটে অমলের পাশে দূরমনস্কের মত চুপচাপ বসে ছিল জয়তী। চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি এসে গেছি'?

অমল বলল, হ্যাঁ বউদি ; এখানে দরজা খুলে অমল নামল, তারপর জয়ন্তী। রাস্তাটা সোজা খানিকটা যাবার পর ডানদিকে যেখানে বেঁকে গেছে, সেই বাঁকের মাথায় প্রকাণ্ড হাই-রাইজ বিল্ডিংটা দেখিয়ে অমল বলল, 'ঐ বাড়ির টেনথ্ ফ্লোরে নশো তের নম্বর ফ্ল্যাটে নীনারা থাকে।

এখনি দেখা করে আসুন। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে গেলেই দেখবেন পর পর অনেকগুলি লিফট। একটায় ঢুকে স্ট্রেট ওপরে উঠে যাবেন।'

কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়ল জয়তী। কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি যাবে না?'

অমল অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। বলল না বউদি, আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। নীনা আমাকে চেনে ; আমি গেলে নির্ঘাত কনকেন্দুদাকে জানিয়ে দেবে। কনকেন্দুদা ভাববেন, আমিই আপনাকে তাতিয়ে নীনার কাছে নিয়ে গেছি। তাতে আমার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে'। এই কথাটা ঠিকই বলেছে অমল। জয়তীর স্বামী কনকেন্দু দারুণ নামকরা পেইন্টার। সারা ইণ্ডিয়া জুড়ে তার খ্যাতি। শুধু দেশেই না, বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। তার ছবির জন্য আর্টের সমঝদাররা সারা বছর উন্মুখ হয়ে থাকে। কলকাতায় তো বটে, দিল্লি-বম্বে-বাঙ্গালোর বা মাদ্রাজ, এমনকি ইউরোপ আমেরিকাতেও অসংখ্যবার কনকেন্দুর পেইন্টিংয়ের একজিবিশন হয়েছে। নানা দেশে আর্ট মিউজিয়ামগুলো তার ছবি কিনে সযত্নে তাদের গ্যালারিতে সাজিয়ে রাখে। তাছাড়া বড় বড় কোম্পানি, গভর্নমেন্টের নানা ডিপার্টমেন্ট, বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এবং ব্যাঙ্ক ও অফিস সাজাবার জন্য নিয়মিত তার ছবি কেনে।

আর অমল তরুণ পেইন্টার হিসাবে সবে নাম করতে শুরু করেছে। আর্টের জগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া তো সোজা ব্যাপার না ; সে জন্য প্রথম দিকে জোরালো খুঁটি দরকার। তার খুঁটি হলো কনকেন্দু। খুঁটি না বলে গডফাদার বলাই উচিত। কনকেন্দু জন্যই দুবার অমলের ছবির একক প্রদর্শনী হওয়া সম্ভব হয়েছে ; সেই অমলকে সরকারি স্টাইপেণ্ড পাইয়ে দিয়েছে। একটা স্কলারসিপের ব্যবস্থা করে প্যারিসে পাঠিয়ে দেবে। কনকেন্দু তার জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরী করে দিচ্ছে।

কনকেন্দুর সূত্রেই জয়তীর সঙ্গে অমলের পরিচয়। অমল প্রায় রোজই একবার ল্যান্সডাউনের রোডের বাড়িতে আসে এবং জয়তীকে বউদি বলে।

এখন সেই অমল যদি গোপনে গোপনে জয়তীকে নীনার কাছে নিয়ে গিয়ে পেছন থেকে কনকেন্দুর পিঠে ছুরি মারার চেষ্টা করে আর সে খবর কনকেন্দু জেনে ফেলে তার ফলাফল কী দাঁড়াবে, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

অমল বলল, 'আমি এখানে ট্যাক্সিতে ওয়েট করছি; আপনি ফিরে এলে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাব। আমার সঙ্গে যে এসেছেন, দয়া করে নীনাকে বলবেন না।

জয়তী ভাবল, যথেষ্ট ঝুঁকি নিইে অমল ওল্ড বালিগঞ্জে নীনাদের বাড়ির কাছাকাছি তাকে নিয়ে এসেছে। ছেলেটাকে আর বিপন্ন করা ঠিক হবে না। বলল 'ভয় নেই বলব না।' বলে 'আর দাঁড়লো না; সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

ডিসেম্বরের সবে শুরু। এখন দুপুর শীতের মায়াবী রোদে চারদিক ভরে যাচ্ছে।

ওল্ড বালিগঞ্জের একদিকটা যেন ঘিঞ্জি নোংরা ভাঙাচোরা কলকাতার অংশ নয়। এখানে চারপাশে প্রচুর পাখি, অজস্র গাছ পালাার স্নিগ্ধা নির্জনতা। রাস্তাটা মসৃণ এবং ঝকঝকে। কলকাতার মধ্যে থেকেও জায়গাটা কলকাতার নয়।

কিন্তু ওল্ড বালিগঞ্জে শীতের অলৌকিক দুপুরের দিকে লক্ষ্য ছিল না জয়তীর। হ্যা জয়তীর হাই-রাইজ বিল্ডিংটার দিকে সে যত এগুচ্ছে তার পা ততই এলোমেলো হয়ে পড়ছে। মাথাটা মাঝে মাঝেই ঠেলে যাচ্ছে জয়তী টের পেল, বুকের ভেতরটা ভয়ানক কাঁপছে মনে হল, দুরন্ত বেগে সেখানে অনবরত ট্রেন ছুটে যাচ্ছে।

নীনাকে আগে কখনও দেখেনি জয়তী। তবে শুনেছে, মেয়েটা দারুণ সুন্দর। একটা কলেজে ইতিহাস পড়ায়। আরো শুনেছে তাকে ডিভোর্স করে নীনাকে বিয়ে করতে চায় কনকেন্দু। কিন্তু সহজে নিজের অধিকার ছাড়বে না জয়তী। অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী বলবে, কী ধরনের আচরণ করবে, মনে মনে সেব গুছিয়ে নিতে লাগল সে।

কখন যে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সে হাই-রাইজ বিল্ডিংটায় ঢুকে, লিফটে করে টেনথ ফ্লোরে এসে, নশো তের নম্বর ফ্ল্যাটের কলিং বেল বাজিয়েছে, খেয়াল নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা মধ্যবয়সী কাজের লোক দরজা খুলে দিল। জয়তী বলল, 'নীনা সান্যালের সঙ্গে দেখা করব। আছেন?'

পঞ্চাশের মতো বয়স হলেও লোকটা বেশ চটপটে। বলল 'আছেন। ভেতরে আসুন।'

ফ্ল্যাটে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে লোকটা জয়তীকে চমৎকার সাজানো ড্রইংরুমে নিয়ে গেল। বলল, 'আপনি একটু বসুন, দিদিমণিকে খবর দিচ্ছি।' বলেই বেরিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পর যে তরুণীটি ও ঘরে এসে দাঁড়াল তার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি নয়। এমন ঝকঝকে স্মার্ট মেয়ে খুব বেশি দেখেনি জয়তী। পাকা গমের মতো তার গায়ের রং। পাতলা ফুরফুরে নাক সটান নেমে এসেছে। গলাটা যেন নিটোল সোনার ফুলদানি। লম্বাটে ডিমের মতো মুখ। গলার নীচে কোন খাঁজ নেই। কণ্ঠার হাড় চোখে পড়ে না। গাল গলা এবং বুকের ওপরের অংশ সবকিছু ভরাট এবং মসৃণ। প্লাক-করা ভুরুর তলায় ভাসা ভাসা দুই চোখে বুদ্ধির ঝলক। বাদামী চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। নিয়মিত হেয়ার টনিক লোশন মাখার জন্য চুলগুলো পালিশ করা সিল্কের সুতোর মতো চকচকে এবং নরম।

এই মুহূর্তে তার পরনে দামী ম্যাক্সি, পায়ে ফোমের হালকা স্লিপার। গয়না বলতে সারা গায়ে কিছুই নেই। শুধু বাঁ হতে পাতলা সোনার ব্যাণ্ডে একটা ছোট্ট জাপানী ঘড়ি।

মেয়েটির পোশাকে চেহারায় বা তাকানোর ভঙ্গিতে অদৃশ্য এক ব্যক্তিত্ব যেন মাখান। অবশ্য তা উগ্র নয়, স্নিগ্ধ লাবণ্যর মতো সেটা যেন তার একান্ত নিজস্ব কোন অলঙ্কার।

মেয়েটি যে নীনা, দেখামাত্রই বুঝতে পেরেছে জয়তী। পলকহীন সে নীনাকে দেখতে লাগল।

নীনা বলল, 'শুনলাম আপনি আমার কাছে কী দরকারে এসেছেন। কিন্তু আপনাকে

তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

জয়তী ভাবল, নীনার ব্যক্তিত্ব ছাপিয়ে তাকে কয়েক স্তর ওপরে উঠতেই হবে। সে লক্ষ্য করেছে, নীনা তার চাইতে কম করে তের চোদ্দ বছরের ছোট। চোখে দৃঢ়তা এনে বলল, 'বসো।'

ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে গেল নীনার কিছু না বলে আস্তে আস্তে জয়তীর মখোমুখি একটা সোফায় বসল সে।

নীনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিল জয়তী। বলল, আমার চাইতে অনেক ছোটই হবে। তুমি করে বললাম বলে কিছু মনে করলে?

অত্যন্ত নিঃস্পৃহ ভঙ্গিতে নীনা বলল, 'ঠিক আছে। আপনি যে জন্যে এসেছেন, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার অন্য কাজ আছে।'

মুখে যাই বলুক 'তুমি' বলার কারণে নীনা যে ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হয়েছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। সে অন্য কাজের কথা জানানো সত্ত্বেও জয়তী কোনরকম ব্যস্ততা দেখাল না। একটা ব্যাপার মনে পড়তে সে বেশ অবাকও হল, আবার মজাও লাগল। কিছুক্ষণ আগে ট্যাক্সি থেকে নেমে এ বাড়িতে আসার সময় ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সে ; এখন সেই ভয় বা নার্ভাসনেসের চিহ্নমাত্র নেই।

ভাবতে ভাবতে একটা আয়নার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল জয়তীর। নীনার ঠিক পেছনেই ডিসটেম্পার করা যে দেয়ালটা রয়েছে তার গায়ে একটা বড় মাপের আয়না আটকানো; তাতে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে জয়তী। চুল উঠে উঠে কপালটা প্রায় মাঠ। সিঁথি র দুপাশে অনেকটা ফাঁকা, সেখানে সিঁদুরের সরু দাগ। যে কটা ধোঁয়াটে রঙের পাতলা চুল এখনও টিকে আছে তার ভেতর নকল চুলের বল পুরে বেঢপ একটা খোঁপা করেছে জয়তী। আইলাইনার দিয়ে চোখে সূক্ষ্ম টান দিয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে আকর্ষণ বা সৌন্দর্য আর কতটুকু বেড়েছে। তার ঘোলাটে দৃষ্টির তলায় স্থায়ী কালচে পোঁচ, গাল ভাঙা, কণ্ঠার হাড় গজালের মত ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

একসময় জয়তীর গায়ের রং আশ্বিনের রৌদ্রঝলক মনে পড়িয়ে দিত। মসৃণ নিভাঁজ ত্বক থেকে উঠে আসত আশ্চর্য দ্যুতি। এখন খুব লক্ষ্য করলে হাতে এবং গলায় গোল গোল শুকনো দু-একটা দাগ চোখে পড়ে।

ওগুলো লজ্জাকর এক রোগের স্মৃতিচিহ্ন। সতের বছরের বিবাহিত জীবনে গভীর প্রেমের সঙ্গে এগুলোও তাকে উপহার দিয়েছিল। আবশ্য নার্সিংহোমে পাঠিয়ে তার রোগটা একেবারে সারিয়েও দিয়েছে কনকেন্দুই।

সতের বছর আগে বাইশ বছেরের যে উজ্জ্বল টগবগে প্রাণবন্ত মেয়েটি ভালবেসে কনকেন্দুকে বিয়ে করেছিল, এখনকার জয়তীর মধ্যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই জয়তী সেদিনের ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

সামনে সোফায় জীবন্ত নানা এবং তার পেছনের আয়নায় নিজের প্রতিফলন দেখতে দেখতে ফের সেই ভয়টা জয়তীর মধ্যে ফিরে এল। চোদ্দ-পনের বছরের ছোট ঝকঝকে মেয়েটার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে কি পারবে? পরক্ষণেই ভয়টাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। ভাবল, এই অসম যুদ্ধে তাকে জিততেই হবে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে নীনা বলল, কী হল, বলুন—' তার কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতা গোপন রইল না।

হ্যাঁ, বলতে তো হবেই।' জয়তী আস্তে আস্তে গলার স্বরটাকে খুব নিচু পর্দায় রেখে শুরু করল, 'প্রথমে নিজের পরিচয়টা দিই। আমি জয়তী— পেইন্টার কনকেন্দু চ্যাটার্জির স্ত্রী।'

নীনা এর জন্য তৈরি ছিল না; প্রথমটা ভয়ানক চমকে উঠল। তার মুখের ওপর দিয়ে অসংখ্য ঢেউয়ের মতো কিছু খেলে যেতে লাগল। কিন্তু তা কয়েক পলকের জন্য। তারপরেই আশ্চর্য সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, 'কী আশ্চর্য, আপনি! আমাদের বাড়িতে যে কোনদিন আসবেন ভাবতেই পারিনি। কী সৌভাগ্য! আগে একটু কফির কথা বলি তারপর—'

নীনা উঠতে যাচ্ছিল; জয়তী উঠতে দিল না। বলল 'এই অসময়ে আমার কফি খাওয়ার অভ্যেস নেই। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমারও একটু তাড়া আছে। কাজের কথা সেরেই চলে যাব।'

বাইরে স্মার্ট এবং সাবলীল থাকতে চেষ্টা করলেও নীনার ভেতরে যে ঝড় চলছে, সেটা বোঝা যায়। সে বলল, 'প্রথমদিন এলেন। একটু কিছু না খেলে আমার খুব খারাপ লাগছে। একটা অন্তত মিষ্টি—'

'ফর্মালিটির দরকার নেই, আমি লাঞ্চ সেরে এসেছি। এখন কিছু খেতে পারব না। যে জন্যে এসেছি, এবার সেটা বলা যাক। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে।'

রীতিমত আবাকই হয়ে গেল নীনা। জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা?'

'কাল সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়িতে একটা ফাংসান আছে। আমার খুব ইচ্ছে, তুমি আস। কিন্তু আমি যে তোমাকে ইনভাইট করে গেলাম এটা এখন কাউকে বলতে পারবে না। কি, কথা দিচ্ছ তো?' সামনে ঝুঁকে গভীর আগ্রহে নীনার চোখের দিকে তাকাল জয়তী।

কিছুক্ষণ বিমূঢ় মত বসে রইল নীনা। এমন অদ্ভুত কথা আগে আর কখনও শোনেনি সে।

জয়তী ফের বলল, 'এভাবে গেলে সবাইকে সারপ্রাইজ দেওয়া হবে, বিশেষ করে কনকেন্দুকে। একটা দারুণ মজার ব্যাপার হবে। কি, কথা দিলে— ইন দা নেম অফ গড?'

'আমি না হয় আপনাদের বাড়ি যাব, আর আপনার আসার খবর কাউকে দেব না। কিন্তু—'

'বল'।

'আপনাদের বাড়িতে কিসের ফাংশান কাল?'

'কনকেন্দুর জন্মদিনের।'

জয়তী জানালো কাল তার স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে তাতে ঘনিষ্ঠ এবং নির্বাচিত কিছু বন্ধুবান্ধবকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। যাঁদের আসার কথা আছে তাঁরা হলেন বিভিন্ন দূতাবাসের কনসাল বা ভাইস কনসাল; নানা ব্যাঙ্ক, মাল্টি ন্যাশানাল কোম্পানি এবং এয়ার লাইনসের টপ একজিকিউটিভ বা ডিরেক্টররা। এ ছাড়া আর্ট ক্রিটিক, কিছু বন্ধুবান্ধব এবং খবরের কাগজের লোকজনও থাকবে।

নীনার বিস্ময় অনেকটা থিতিয়ে এসেছিল। হঠাৎ জয়তী কেন তাদের ফ্ল্যাটে এল, কেনই বা কনকেন্দুর জন্মদিনে তাকে নেমন্তন্ন করছে, সব ঠাণ্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করল। এর পেছনে জয়তীর গভীর সঙ্গোপন কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা, কে জানে। খুব সতর্ক ভাবে নীনা বলল, 'আপনাকে জয়তীদি করেই বলছি—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।' তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল জয়তী।

নীনা বলল, 'এত বিরাট বিরাট লোকের মধ্যে আমার মতো সামান্য মেয়েকে ডাকছেন কেন? বলবার মতো আমার কোন পরিচয়ই নেই। আই অ্যাম অ্যান ইন্‌সিগ্‌নিফিকেন্ট গার্ল।'

'ইনসিনিফিকেন্ট বলছ কেন? তুমি তো কনকেন্দুর দারণ একজন অ্যাডমায়ারার। তোমার মতো ফ্যান তার খুব কমই আছে। ওর বার্থ-ডে পার্টিতে না গেলে খুব দুঃখ পাব। আসছ কিন্তু! প্লীজ—'

একটু ভেবে নীনা বলল, 'ঠিক আছে, যাব। তবে—'

'কী জিজ্ঞাসু চোখে তাকল জয়তী।

নীনা বলল, 'একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না জয়তীদি। আগে তো কখনও আমাকে দেখেননি তবে কী করে জানলেন আমি কনকেন্দুদার পেইন্টিং এর ফ্যান। এখানকার ঠিকানাই বা পেলেন কোত্থেকে?

জয়তী বিচিত্র হেসে ভাসা ভাসা উত্তর দিল, 'আমার স্বামীর কে বন্ধু কে শত্রু, কে তার গুণগ্রাহী— এসব খবর জানতে হয়। নইলে কিসের প্রেম! আচ্ছা ভাই, এখন চলি। কাল কিন্তু তোমাকে খুব আশা করব।"

'আর একটু বসবেন না?' বলেই নীনার মনে পড়ল, কিছুক্ষণ আগে জয়তীকে বলেছিল তার অন্য জরুরী কাজ আছে।

'আজ আর নয়। আলাপ টালাপ করে গেলাম, পরে অনেক দেখা হবে, তখন অনেক গল্প করা যাবে।' বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে গেল জয়তী।

নীনা তার সঙ্গে সঙ্গে লিফট পর্যন্ত এল।

একটু পর নিচে নামতে নামতে সিনেমা স্লাইডের মত জয়তীর চোখের সামনে তার জীবনের কিছু কিছু ছবি ফুটে উঠতে লাগল।

ছোটবেলা থেকেই পেইন্টিং ভাস্কর্য– এ সবের দিকে তার দারুণ ঝোঁক। নিজেও ভাল ছবি আঁকতে পারত একসময়। কয়েক বছর নিয়মিত আঁকার স্কুলে গেছে সে; পরে ছেড়ে দেয়।

বড় হয়ে কলেজে পড়তে আর্ট একজিবিশনের খবর পেলেই দেখতে যেত জয়তী। এমনই এক একজিবিশনে কনকেন্দুর সঙ্গে তার প্রথম আলাপ। তখন সবে এম-এর ফিফথ ইয়রে উঠেছে সে।

কনকেন্দু দারুণ সুপুরুষ। নাক মুখ কাটা কাটা। প্রায় ছ ফুটের মত হাইট। সতেজ টান টান চেহারা তার, শরীরে এক গ্রামও বাজে চর্বি নেই। লম্বা লম্বা চুলগুলো অবহেলায় পেছন দিকে উল্টে দেওয়া। ভাসা ভাসা চোখে অন্যমনস্কতা আর অপার্থিব স্বপ্নের মতো কিছু যেন মাখানো।

প্রথম দেখেই কনকেন্দুকে এবং তার পেইন্টিংগুলোকে ভাল লেগে গিয়েছিল জয়তীর। কনকেন্দু চমৎকার কথা বলতে পারে। তার কণ্ঠস্বর সামান্য গম্ভীর ধীর কিন্তু সুরেলা। ছবি না এঁকে গান গাইলেও সে নাম করতে পারত।

কনকেন্দু যখন তার প্রতিটি ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড কী পরিবেশে এবং মানসিক অবস্থায় সেগুলো আঁকা হয়েছে, এসব বুঝিয়ে দিচ্ছিল তখন মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে জয়তী। ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী দেখার পর জয়তীই যেচে বলেছিল, খুব তাড়াতাড়িই একদিন কনকেন্দুর সঙ্গে দেখা করবে। তার ছবি সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানতে চায় সে।

দিন চারেক পর দেখাও করেছিল জয়তী। তার দু-দিন বাদে আবার। তারপর থেকে রোজ নিয়মিত।

মনে পড়ে, প্রথম আলাপের দিনটা থেকে ঘনিষ্ঠতা হতে সময় লেগেছিল মোটে তিন সপ্তাহ। দেড় মাসের মাথায় বাড়ির প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও চোদ্দ বছরের বড় কনকেন্দুকে এক রকম জোর করেই বিয়ে করেছিল জয়তী।

বিয়ের পর ক-টা বছর রঙিন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল যেন। দিল্লি বম্বে বাঙ্গালোরে এবং কলকাতায় তখন প্রতি বছর একজিবিশন হচ্ছে কনকেন্দুর। তার সঙ্গে সারা দেশ তো ঘুরতই জয়তী, একবার জাপান আর একবার ইওরোপও ঘুরে এসেছিল।

তখন কনকেন্দু ছাড়া আর কিছুই জানত না জয়তী, বুঝত না। অলৌকিক কোন জাদুকরের মতো সে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তবু তারই ভেতর সে টের পাচ্ছিল, তিনটে ব্যাপারে কনকেন্দুর তীব্র প্যাশন– মদ, মেয়েমানুষ এবং ছবি।

মদ খাওয়াটা কোনদিনই দোষের মনে হয় না জয়তীর। তার বাবা এবং দাদারা একটু-আধটু যে ড্রিংক করতেন না, তা নয়। এ বিষয়ে তার আপত্তি বা শুচিবাই কোনটাই নেই। তবে ড্রিংকটা একটু বেশিই করত (এখনও করে থাকে।) কনকেন্দু। মদ্য পানের ব্যাপারে

তার কোনরকম বাছবিবচার নেই। হুইস্কি রাম ভদকা থেকে কালীমার্কা ধেনো মদ বা চোলাই— কোন কিছুতেই তার অরুচি নেই। পাকস্থলীতে খানিকটা হুইস্কি বা চোলাই পড়লে সে আর স্বাভাবিক থাকত না।

মেয়েমানুষ সম্পর্কেও কনকেন্দুর প্রচণ্ড আগ্রহ। তার গুণমুগ্ধদের বেশির ভাগই মেয়ে। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই জয়তী টের পেয়েছিল, এদের অনেকের সম্পর্কটা শুধু আর্টেই সীমাবদ্ধ নেই, ছবি-টবি ছাড়িয়ে সেটা শারীরিক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। মদের মতোই মেয়েমানুষ সম্পর্কেও তার কোনরকম বাছাবাছি নেই। দেশী-বিদেশী শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে, গেঁয়ো বা আদিবাসী– উদ্দাম স্বাস্থ্যবতী যুবতী হলেই হল। এমনকি রেড লাইট এরিয়াতে সে মাঝে মাঝে হানা দিত।

মেয়েমানুষের ব্যাপারটা প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারত না জয়তী। ফ্রী সেক্স তার খুবই অপছন্দ। এখানে তার রক্তে মধ্যবিত্ত সংস্কার ভীষণভাবে কাজ করত। এ নিয়ে কিছু বললে জয়তীর গালে আলতো টোকা মেরে কনকেন্দু বলত, 'কেন আজেবাজে ব্যাপারে মন খারাপ করছ। ছবি আঁকার জন্যে এসব দরকার। মেয়েদের সঙ্গে ইন্টিমেটলি না মিশলে জীবনকে নানা দিক থেকে ছবিতে কী ধরে ধরব।'

তখন জয়তী এতই আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে মন খুঁতখুঁত করলেও কনকেন্দুর কথা মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু ক'বছর বাদে পরপর দুটো বিকলাঙ্গ মরা বাচ্চার জন্ম দিয়ে প্রবল মানসিক ধাক্কা খেয়েছিল জয়তী। কেন তার মৃত সন্তানেরা এরকম চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে এল তা জানতে প্রচণ্ড চেঁচামেচি করেছিল সে। অগত্যা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই চেনাশোনা এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বয়স্ক সহানুভূতিশীল ডাক্তারটি গোপনে তাকে জানিয়ে দিয়েছিল, কোনদিনই জীবন্ত সন্তানের মা হতে পারবে না জয়তী। স্বামীর পোকায় খাওয়া বীজে সুস্থ নীরোগ বাচ্চা হতে পারে না।

এর কিছুদিন বাদেই আগেকার কদিনের তামার পয়সার মতো গায়ে চাকা চাকা দাগ বেরুতে শুরু করেছিল জয়তীর। ওটা কী ধরনের জঘন্য রোগ এবং কিভাবে তার শরীরে ঢুকে তার রক্ত বিষাক্ত করে দিয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অবশ্য কনকেন্দুই খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে তাকে সারিয়ে তোলে। কিন্তু তারপর থেকেই জয়তীর শরীর ভাঙতে শুরু করে।

তার চেহারার যত ধ্বংসের ছাপ পড়ে ততই দূরে সরতে থাকে কনকেন্দু। জয়তী খবর পায়। বাইরে মেয়েদের নিয়ে দারুণ মাতামাতি করছে সে।

প্রথম প্রথম যেখানেই কনকেন্দুর একজিবিশন হত দিল্লি বা বম্বে, টোকিও কি জেনেভা – সব জায়গায় স্ত্রীকে নিয়ে যেত সে। কিন্তু চেহারা নষ্ট হবার পর আর সঙ্গে নিত না; একটা না একটা অছিলায় তার যাওয়া বন্ধ করত। জয়তীর আকর্ষণ তার কাছে দ্রুত কমে আসছিল। ফলে শরীরের মতো মনও ভীষণ ভেঙে পড়ছিল জয়তীর।

এসব কথা মা-বাবা বা দাদা-বউদিদের যে বলবে, তারও উপায় নেই। কেননা সবার

অমতেই তো জয়তী কনকেন্দুকে বিয়ে করেছিল। সেই কনকেন্দুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে কি করে?

এভাবেই ক'টা বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে মাঝেমাঝেই সে খবর পাচ্ছিল, তাকে ডিভোর্স করে কনকেন্দু অন্য মেয়েকে বিয়ে করবে। এক একবার একেকটি মেয়ের নাম সোনা যেত। যতবার এসব কানে আসত, ভীষণ টেনশন বাড়ত জয়তীর। মনে হত তার সমস্ত স্নায়ু ছিঁড়ে তছনছ হয়ে যাবে। পরে জানা যেত, না বিয়েগুলো হচ্ছে না; নানা কারণে সেগুলো ভেঙে গেছে।

খুব গোপনে এসব খবর তাকে দিত অমল। সে তখন ছবির ব্যাপারে কনকেন্দুর কাছে সবে ঘোরাঘুরি শুরুই করেছে। কনকেন্দুর কাছে সবে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। কনকেন্দুর চাইতেও জয়তীর সঙ্গেই তার বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেটা খুবই আবেগপ্রবণ, অন্যের সামান্য্য দুঃখকষ্টেই অভিভূত হয়ে পড়ে। জয়তী তাকে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেনি। কিন্তু কিছুদিন যাতায়াতের পরই সে টের পেয়েছিল কনকেন্দু এবং জয়তীর মধ্যে কোথাও একটা মারাত্মক গোলমাল রয়েছে। পরে সেটা সে আবিষ্কার করেছিল। ভেবেছিল, জয়তীর জন্য কিছু করা দরকার। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কনকেন্দু খেপে গেলে তার ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই আড়ালে কনকেন্দুর মেয়েঘটিত যাবতীয় খবর সে জয়তীকে জানিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি যাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই গাঢ় তাদের ফটোও যোগাড় করে এনে দিয়েছিল।

নীনার সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকমের ঘনিষ্ঠতার খবরটাও অমলই তাকে জানিয়েছে। সতের বছর আগে জয়তী যেমন একজিবিশনে গিয়ে কনকেন্দু এবং তার পেইন্টিং দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, নীনাও ঠিক তাই। কনকেন্দুর বয়স এখন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন। পঁচিশ বছরের একটি তরুণীকে আকৃষ্ট এবং আচ্ছন্ন করার মতো ম্যাজিক এখনও তার আছে।

অমল আরো জানিয়েছিল নীনার সঙ্গে কনকেন্দুর বিয়েটা হবেই; আগেরগুলোর মতো এটা ভাঙার কোন সম্ভাবনাই নেই।

এটা জানার পর থেকেই একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ফেলেছে জয়তী। যেভাবেই হোক এ বিয়ে আটকাতেই হবে। নীনাদের ফ্ল্যাটে এসে তাকে নেমতন্ন করাটা তার রণকৌশলেরই একটা অংশ।

কখন যে হাই-রাইজ বিল্ডিংটা থেকে বেরিয়ে রাস্তার আরেক মাথায় সেই ট্যাক্সিটার কাছে চলে এসেছিল, খেয়াল নেই জয়তীর।

অমল তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'আসুন বউদি–'

জয়তী উঠে বসতেই ট্যাক্সিওলা স্টার্ট দিল।

অমল এবার জিজ্ঞেস করল, 'দেখা হল'?

'হ্যাঁ।' জয়তী মাথা নাড়ল।

আর কিছু জানতে চাইল না অমল।

কয়েক মিনিটের ভেতর ল্যান্সডাউনে পৌঁছে গেল ট্যাক্সিটা। জয়তীদের বাড়ির সামনে তাকে নামিয়ে দিয়ে অমল চলে গেল।

পরে দিন হতে না হতেই গেস্টরা আসতে শুরু করলেন। জয়তীদের পুরনো আমলের বাংলো টাইপের দোতলা বাড়ির সামনে দেশী এবং বিদেশী গাড়ির লাইন লেগে গেল।

কনকেন্দুর জন্মদিন উপলক্ষে একতলার বিশাল হলঘরটা দারুণ সাজানো হয়েছে। চারিদিকে অজস্র ফুল, পাতা রঙিন আলোর ফোয়ারা। সোফায় কার্পেট – নাকি সারা ঘরেই দামী বিদেশী সেন্ট স্প্রে করা হয়েছে; তার গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্টিরিওতে খুব নিচু পর্দায় খুব চেনা মন-কেমন-করা ওয়েস্টার্ন মিউজিক বেজে চলেছে।

আজ দুর্দান্ত সেজেছে জয়তী। পার্ক স্ট্রিটের এক সেলুনে গিয়ে চুল বাঁধিয়ে এনেছে। তুঁতে রঙের দামী মাইশোর সিল্কের সঙ্গে ম্যাচ করে পরেছে ব্লাউজ। গলা কান হাত বুক —সব হীরের গয়নায় মুড়ে ফেলেছে। নক এবং ঠোঁটে লাগিয়েছে গাঢ় রং আর চোকে মাসকারা।

তবু অতিথিরা জয়তীর দিকে বিশেষ তাকচ্ছেন না। হল-এ ঢুকেই প্রথমে কনকেন্দুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা. অভিনন্দন বা 'মেনি হ্যাপি রিটার্নস' জানিয়ে, তার হাতে দামী উপহার তুলে দিয়ে, পাশে দাঁড়ানো জয়তীর উদ্দেশে একটু ঘাড় হেলিয়ে বা হ্যালো বলেই দূরে সোফায় গিয়ে বসেছেন। কিংবা দু-চারজন মিলে থোকায় থোকায় এধারে-ওধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। হাসি, ঠাট্টা, আড্ডা, সৌজন্য বিনিময়, পান এবং আতসবাজির শব্দের মতো হঠাৎ হঠাৎ হাসির শব্দে পার্টি জমে উঠতে লাগল।

জয়তী জানে চেহারা নষ্ট হয়ে যাবার পর তার সম্বন্ধে কারো আর আগ্রহ নেই। এজন্য আগে আগে খুব কষ্ট পেত ; এখন ও নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

একটা নামকরা হোটেলকে ক্যাটারিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাদের ধবধবে ইউনির্ফর্ম-পরা বেয়ারারা ট্রেতে করে হুইস্কি, রাম, ভদকা, কাবাব ফ্রায়েড প্রন বা ফিশ ফিঙ্গার নিয়ে ছোটাছুটি করেছে। গেস্টরা নিজের নিজের পছন্দমত পানীয় এবং চাট তুলে নিচ্ছেন। বেয়ারারা ঠিকমত সার্ভ করছে কিনা. অমল ছোটাছুটি করে তা তদারক করতে লাগল।

জয়তীর মনে হচ্ছিল সে এখানকার কেউ না, নিতান্তই আউটসাইডার। মনে যাই হোক জয়তী কিন্তু অতিথিদের তেমন লক্ষ্য করছিল না। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে দায়সারাভাবে মাঝে মাঝে এককেজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে; বেয়ারাদের ডেকে হুইস্কি কি কাবাব নেবার জন্য অনুরোধ করছে. কিন্তু তার চোখ রয়েছে দরজার দিকে। রাত যত বাড়ছে ততই অস্থির হয়ে উঠছে জয়তী। তবে কি নীনা আসবে না? কথা দেওয়া সত্ত্বেও সে কি কনকেন্দুর সঙ্গে দেখা করে সব বলে দিয়েছে? কিন্তু কাল দুপুর থেকে আজকের এই রাত পর্যন্ত কনকেন্দুর কোনো কথায় বা আচরণে তা একেবারেই বোঝা যায়নি। নীনা

তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে নিশ্চয়ই সে একবার না একবার ফেটে পড়ত।

আটটা বাজার পর জয়তী ধরেই নিল নীনা আর আসবে না। খুবই হতাশা বোধ করল সে। যুদ্ধের প্রথম যে ছকটা মনে মনে সে ঠিক করে নিয়েছিল সেটা খুব সম্ভব নষ্ট হয়ে গেল। আবার নতুন করে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে। কিন্তু তার আর দরকার হল না; হঠাৎ দেখা গেল দরজা পেরিয়ে হল-এ ঢুকছে নীনা। তার পরনে সাদা ধবধবে সিল্ক, সাদা ব্লাউজ, সাদা কর্ডিগান, পায়ে সাদা স্লিপার, গলায় মুক্তো বসানো সরু হার, কানে মুক্তোর দুল, আঙুলে মুক্তোর আংটি, ডান হাতে মুক্তোরই ব্রেসলেট, বাঁ হাতে সাদা ব্যাণ্ডের ঘড়ি। বিরাট এক রক্ত গোলাপের তোড়া নিয়ে এসেছে।

নীনা হল-এ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের আলোর জোর যেন হঠাৎ দশগুণ বেড়ে গেল। সবার চোখ গিয়ে পড়ল তার ওপর।

জয়তীর সেই কথাটা দ্রুত একবার মনে পড়ে গেল। যতই নিজের শরীরের ধ্বংস স্তূপকে সাজাবার চেষ্টা করুক, নীনার সঙ্গে একটা অসম যুদ্ধেই হয়ত সে নেমেছে। পরক্ষণেই যান্ত্রিক কোন নিয়মে তার চোখ ঘুরে গেল কনকেন্দুর দিকে।

এই বার্থ-ডে পার্টিতে নীনাকে দেখে চমকে উঠেছে কনকেন্দু। চমকটা থিতিয়ে এলে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কনকেন্দুর প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দিচ্ছে, নীনা জয়তীর কথা জানায়নি।

অমল নীনার দিকে ফিরেও তাকায়নি। সে যেন নীনাকে চেনেই না।

জয়তী প্রায় ছুটে গিয়ে নীনার হাত ধরে হল-এর ভেতরে নিয়ে এল, 'এস ভাই এস' নীনা অল্প হেসে সোজা কনকেন্দুর কাছে চলে এল। তার হাতে গোলাপের তোড়াটা দিয়ে বলল, 'মেনি হ্যাপি রিটার্নস। ইনভিটেশন পাইনি, তবু চলে এলাম।' কনকেন্দু বিব্রতভাবে বলল, 'তুমি এসেছ, ভারী খুশি হয়েছি।'

নীনা হাসল। বলল, 'আমি কিন্তু থাকতে পারব না. এখনই চলে যেতে হবে।'

'সে কি, এখনই যাবে মানে!'

পাশ থেকে দু'জনকে লক্ষ্য করছিল জয়তী। আচমকা নীনা এসে যাওয়ায় কনকেন্দু কিছুটা বিব্রত এবং আড়ষ্ট হয়ে পড়লেও তার চোখ দারুণ চকচক করছে। এই চমকানির মানে বোঝে জয়তী।

নীনা বলল, 'মায়ের শরীরটা ভাল না। হার্টের ট্রাবল হচ্ছে। সবসময় কাছে থাকা দরকার।'

জয়তী ভীষণ ব্যস্তভাবে বলল, 'বেশিক্ষণ তোমাকে আটকাব না। ওনলি ফিফটিন মিনিটস। আজকের দিনে একটু কিছু না খেয়ে গেলে আমাদের খুব খারাপ লাগবে। তাছাড়া অন্য গেষ্টদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি।'

আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই সবাইকে চেনেন। কিন্তু আশ্চর্য-সুন্দর অচেনা একটি

'ঠিকানা পেলে কোথায়?'

'যোগাড় করেছি।'

হঠাৎ খেপে গেল কনকেন্দু, 'কে ঠিকানা দিয়েছে, আমি জানতে চাই?'

জয়তী বলল, 'সোর্স বলব না। তুমি কি কখনও বলেছ, নীনা এখন তোমার নাম্বার ওয়ান ফ্যান–'

বিষাক্ত চোখে তাকিয়ে রইল কনকেন্দু।

পরের দিন সন্ধ্যায় নীনাকে ফোন করল জয়তী। 'একটু বিরক্ত করছি নীনা, কিছু মনে করো না।'

নীনা বলল, 'না না, বিরক্ত কিসের —'

'কাল মা'র হার্ট ট্রাবলের কথা বলছিলে । বেশ চিন্তায় ছিলাম। কেমন আছেন উনি?'

আজ একটু ভাল।'

'কাল পার্টিতে এলে আর গেলে। কিছু খেলেও না। একদিন কিন্তু অনেকক্ষণ তোমার কোম্পানি চাই। খুব গল্প করব, একসঙ্গে খাব।'

একটু চুপ করে থেকে নীনা বলল, 'আচ্ছা'।

'কথা দিলে কিন্তু –'

টেলিফোনের তারের ভেতর দিয়ে হালকা হাসির শব্দ ভেসে আসে। নীনা বলল, 'কথা আদায় করে নেবার ব্যাপারে আপনি এক্সপার্ট'।

এরপর মাঝে মাঝেই নীনাকে ফোন করতে লাগল। প্রথম দিকে দু-চারদিন বাদে। পরে রোজ নিয়মিত।

জয়তী লক্ষ করেছে, তার কথার উত্তর সহজভাবে দেয় না নীনা। ফোনে কণ্ঠস্বর শুনে টের পাওয়া যায়, সে খুবই সতর্ক, নাকি সন্দিগ্ধ। জয়তীর এই নিয়মিত ফোন করার পেছনে যে সূক্ষ্ম সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য আছে, সেটা কি ধরে ফেলেছে নীনা?

জয়তীর ভয় ছিল. নীনা হয়ত তার ফোনের কথা কনকেন্দুকে জানিয়ে দেবে কিন্তু এখন পর্যন্ত কনকেন্দু তাকে কিছু বলেনি। মনে হচ্ছে, কিছু দিন নীনা তাকে লক্ষ্য করবে। তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে কনকেন্দুকে জানাবে।

বার্থ-ডে পার্টির পর মাসখানেক কেটে গেছে। সেই যে নীনা কথা দিয়েছিল, একদিন এসে জয়তীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়ে যাবে, সেটা নানা কারণে এখনও হয়ে ওঠেনি। আজ সকালে ফোনে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিল জয়তী, 'তুমি তো আর এলে না'

নীনা বলল, 'হ্যাঁ, অনেক দিন হয়ে গেল ; এবার শিগ্‌গিরই একদিন যাব।'

'কবে আসবে একটা ডেফিনিট ডেট দাও–'

নীনা তক্ষুনি উত্তর দিল না। একটু ভেবে বলল 'কবে গেলে আপনার অসুবিধা হবে না।'

তরুণীকে দেখে তাঁরা এতই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন যে হাতের গেলাসে চুমুক দেবার কথা পর্যন্ত মনে থাকছে না। সেটা লক্ষ্য করেছিল জয়তী। বলল 'আগে ওঁদের সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিই'।

নীনার পরিচয়টা এভাবে দেওয়া হল । সে আর্টের বিরাট সমজদার এবং কনকেন্দুর পেইন্টিং - এর অনুরাগিণী।

অতিথিরা এর মধ্যে দু-এক পেগ খেয়ে একটু আধটু টিপসি হয়ে গিয়েছিলেন। হুড়মুড় করে এগিয়ে এসে নীনার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। তারই মধ্যে শুধু একটা সন্দেশ খেয়ে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বলে সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে হল থেকে বেরিয়ে গেল নীনা। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে রাস্তা পর্যন্ত এল জয়তী।

নীনা একটা ফিয়াট ড্রাইভ করে একাই এসেছিল। গাড়িটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে. আছে। চাবি দিয়ে দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছি'।

কৃতজ্ঞ সুরে জয়তী বলল, ' কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব, বুঝতে পারছি না'

নীনা বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন আমি আসব না'–

হকচকিয়ে গেল জয়তী। দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, ' তা ঠিক ভাবিনি। তবে তোমার দেরি দেখে চিন্তা হচ্ছিল, তুমি হয়ত কোন ব্যাপারে আটকে গেছ'।

'আপনি যে আমাদের ফ্ল্যাটে ইনভাইট করতে গিয়েছিলেন তা আপনার স্বামীকে জানাননি।'

জয়তী অস্বস্তি বোধ করল ; উত্তর দিল না।

নীনা এবার বলল, 'একটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে।'

'কী?

'আমাকে ইনভাইট করেছিলেন কেন?' বলে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল নীনা।

জয়তী চমকে উঠল. বিমূঢ়ের মত বলল 'না, মানে ইচ্ছে হল—'

অদ্ভুত একটু হেসে নীনা বলল, 'আচ্ছা চলি'। গাড়িতে উঠে সে স্টার্ট দিল।

আস্তে আস্তে ক্লান্ত পায়ে হলের দিকে ফিরতে ফিরতে —জয়তী ভাবল তার রণকৌশল কি নীনার কাছে ধরা পড়ে গেছে?

মাঝরাতে পার্টি শেষ হলে, হলঘর যখন ফাঁকা সেই সময় কনকেন্দু থমথমে মুখে জিজ্ঞেস করল, 'নীনাকেকে নেমন্তন্ন করেছে?'

জয়তী জানত, অতিথিরা চলে গেলে নীনার কথা কনকেন্দু তুলবেই।

সে ভয় পেল না। নার্ভাস হয়ে পড়লে যুদ্ধ চালাবে কী করে? তার চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল,'আমি'।

'তুমি নীনাকে চিনলে কী করে? ও তো কখনও আমাদের বাড়ি আসেনি।'

'আমিই ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

জয়তী বলল, 'তোমার যেদিন ইচ্ছে আসবে। কোনদিনই আমার অসুবিধে নেই।': বলতে বলতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল পরশু কনকেন্দু বাড়ি থাকছে না। মর্ণিং ফ্লাইটে দু'দিনের জন্য বম্বে যাবে। নীনা এবার যখন আসবে, কনকেন্দু না থাকলেই ভাল। কনকেন্দু বাড়িতে থাকলে নীনার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যাবে না। জয়তী বলল 'পরশু, মানে বুধবার চলে এস। ধর ন'টা সাড়ে ন'টায়। তোমার কলেজ নেই তো?'

কথা মত ঠিক ন'টায় চলে এল নীনা। তাকে দেখামাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জয়তী। হাত ধরে সোজা ড্রইংরুমে নিয়ে বসাল। যত্ন করে নিজের হাতে চা করে খাওয়াল। তারপর বলল, 'সেদিন এসেই চলে গেলে। চল, আমাদের বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাই।'

প্রথমে নিচের তলাটা দেখাল জয়তী। এখানে চারটে বড়বড় ঘর, একটা বিরাট হল, একটা প্রকাণ্ড ড্রইংরুম, কিচেন, ডাইনিং রুম ইত্যাদি। হলের এক ধারে দোতলায় যাবার সিঁড়ি।

কিছুক্ষণ বাদে নীনাকে নিয়ে দোতলায় চলে এল জয়তী। এখানে তিনটে বেডরুম, একটা হল। ড্রইংরুম, কিচেন বা স্টোর নেই। এসব মিলিয়ে কনকেন্দুর বিরাট স্টুডিও।

দোতালায় বেডরুম-টুম দেখানো হলে জয়তী বলল, 'তুমি যার অ্যাডমায়ারার, চল এবার তার স্টুডিওটা দেখাই।' বলে চোখের কোণ দিয়ে নীনাকে দেখল।

এ বাড়িতে আজ ঢোকার পর থেকেই নীনার চোখেমুখে ভয়ানক সতর্কতা; স্নায়ুগুলোকে সে যেন টান টান করে রেখেছে। নীনা কিছু বলল না।

কনকেন্দুর আঁকা অসংখ্য পেইন্টিং দেখতে দেখতে স্টুডিওতে অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর সোজা নীনাকে নিজের বেডরুমে নিয়ে গেল জয়তী। স্টুডিওতে ঘোরার সময় কনকেন্দুর ছবির ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। তারই জের টেনে নীনা বলল, 'ওঁর ছবি আমার কি ভাল যে লাগে।'

জয়তী মনে মনে হাসল ; একদিন নীনার মতই কনকেন্দুর পেইন্টিং দেখে সেও মুগ্ধ হয়েছিল। সে কিছু বলল না ; অল্প হাসল শুধু।

নীনা এবার বলল কত, 'জানেন জয়তীদি, একজিবিশন দেখতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তারপর—'

কনকেন্দুর সঙ্গে নীনার আলাপের ইতিহাস অমলের কাছে আগেই শুনেছে জয়তী। সে বলল, 'তারপর কী?'

নীনা বলল 'রাগ যদি না করেন, তাহলে বলব।'

'কি আশ্চর্য রাগ করব কেন? তুমি বলো তো –'

আলাপ হবার পর আমি ওঁর সঙ্গে অনেকবার দেখা করেছি। উনিও আমাদের ফ্ল্যাটে বেশ কয়েকবার গেছেন।'

ভেতরে ভেতরে হকচকিয়ে গেল জয়তী। এসব কথা জানিয়ে নীনাও কি কোন পাল্টা কূট চাল চালছে? বুঝতে চাইছে তার প্রতিক্রিয়া? কিন্তু কথায়বার্তায়, আচরণে

কোনভাবেই নিজেকে ধরা দেবে না জয়ন্তী। হেসে হেসে সে বলল, 'এ তো হতেই পারে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।'

এরপর কনকেন্দু সম্বন্ধে আর কিছু বলে না নীনা। একেবারে অন্য প্রসঙ্গে যার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই জয়ন্তীর।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নীনা বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার যাই।'

জয়ন্তী বলল, এই সবে খেয়েছ. একটু রেস্ট নাও; বিকেলে চা খেয়ে যাবে।' একটু থেমে কি ভেবে হঠাৎ একটা আলমারি থেকে আট-দশটা অ্যালবাম বার করে নীনার সামনে রাখতে রাখতে বলল, 'প্লীজ তুমি এগুলো একটু দেখতে থাক। আমি মালীকে একটু কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আসি। আধ ঘন্টার ভেতর ফিরে আসব।':

'এগুলো কিসের অ্যালবাম?'

'তোমার মোস্ট ফেভারিট আর্টিস্টের ছবির।' বলে বেরিয়ে গেল জয়ন্তী।

আধ ঘন্টার জায়গায় পুরো একটি ঘন্টা কাটিয়ে যখন সে ফিরে এল তখন নীনা একটা অ্যালবামের দিকে তাকিয়ে আছে। এক ধারে অনেকগুলো চিঠি ছড়িয়ে রয়েছে।

নীনার চোখের মণি স্থির ; তাতে পলক পড়ছে না। তার ফর্সা মুখে কিসের যেন ছায়া দেখতে দেখতে জয়ন্তীর একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, নীনার খেয়াল নেই। একসময় হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে জয়ন্তী বলল, 'কিছু মনে করো না ভাই অনেকক্ষণ তোমাকে একা বসিয়ে রেখেছি। আমাদের নতুন মালীটার মাথায় কিচ্ছু ঢোকে না। তাকে বোঝাতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়।'

নীনা তারপর কথা কিছুই শুনছিল না। সে বলল 'ওই ফোটোগুলো কাদের?'

সব মিলিয়ে বারো চোদ্দটা ফোটো ; প্রতিটি ফোটোই একটি করে সুন্দরী যুবতীর। সেগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছে, এমনভাবে জয়ন্তী বলল, 'আরে এগুলো পেলে কোথায়? অ্যালবামের ভেতর ছিল নাকি?'

হ্যাঁ। এরা কারা?

'তোমার প্রিয় পেইন্টারের ফ্যান।' বলতে বলতে হঠাৎ গলা নামিয়ে জয়ন্তী বলল, 'জানো নীনা, এরা সবাই আমার স্বামীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।' আঙুল বাড়িয়ে খাটে ছড়ানো চিঠিগুলো দেখেছ নাকি?'

'হ্যাঁ।' বিপন্ন মুখে নীনা বলল, 'মানে আমি ঠিক—'

'বুঝতে পারনি যে ওগুলো লাভ-লেটার —প্রেমপত্র তাই নয়?'

আস্তে মাথা নাড়ল নীনা।

জয়ন্তী বলল, 'ফোটোর ঐ মেয়েগুলো এই সব চিঠি লিখেছে। এখনও লিখে যাচ্ছে।' ক্রমশ গলার স্বরটা চাপা এবং খসখসে শোনাতে থাকে, 'আমার স্বামীও ওদের উসকে দেয়। মানে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর প্যাশনটা একটু বেশি কিনা। শুনতে পাই এক এক সময় সে ঠিক করে ফেলে আমাকে ডিভোর্স করে এদের কাউকে বিয়ে টিয়ে করবে।'

ফ্যাকাসে রক্তশূন্য মুখে শ্বাসরুদ্ধের মত শুনে যায় নীনা। অনেকক্ষণ পর বলে, 'আজ যাই জয়তীদি–'

এরপর একতরফা জয়তীই শুধু না, নীনাও তাকে ফোন করতে থাকে। কনকেন্দু এবং ফোটোর মেয়েগুলো সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জানতে চায়। তার মনোভাব খানিকটা যেন ধরতে পারে জয়তী। নীনা হয়ত তার মত ভাঙাচোরা চেহারার মধ্যবয়সী এক মহিলাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই ভাবে না। কিন্তু ফোটোর দারুণ দারুণ মেয়েগুলো এভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে, বলা মুশকিল।

ফোনই শুধু করে না জয়তী; কনকেন্দু বাড়িতে না থাকলে তাকে আসতেও বলে। আশ্চর্য, আপত্তি করে না নীনা; বলামাত্র চলে আসে।

একটা ব্যাপারে জয়তী নিশ্চিত, নীনা এখনও ফোন করা বা এ বাড়িতে মাঝে মাঝে আসার খবরটা কনকেন্দুকে দেয়নি। তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই বিস্ফোরণ ঘটে যেত।

দুই অসম বয়সী প্রতিদ্বন্দ্বিনী যেন একটা বিচিত্র কূট খেলায় মেতেছে।

আজ সকাল থেকেই আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে আছে। বঙ্গোপসাগরে কী কারণে যেন নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে; তারই ফলে কলকাতার মাথায় দুর্যোগ নেমে আসছে। যে কোন মুহূর্তে প্রবল বৃষ্টি শুরু হতে পারে।

এরই মধ্যে জরুরি কাজে সকালে দুর্গাপুর যেতে হল কনকেন্দুকে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

কনকেন্দু বেরিয়ে যাবার পর জয়তী একজন কাজের লোককে দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করাল, একজনকে বাজারে পাঠাল, কুককে বুঝিয়ে দিল কী কী রান্না হবে। এভাবে অনেকটা সময় কাটল। তারপর শোবার ঘরে এসে নীনাকে ফোন করল। কনকেন্দু বাড়ি নেই। এই সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগানো দরকার। নীনা এবং কনেকেন্দুর বিরুদ্ধে যে সূক্ষ্ম স্ট্র্যাটেজি মাথায় রেখে ক-মাস ধরে আস্তে আস্তে সে এগুচ্ছে, আজই তার শেষ মারাত্মক চালটা দিতে হবে। অবশ্য সব কিছু নির্ভর করছে নীনার ওপর। সে যদি এখানে আসতে রাজী হয়– তবেই।

ফোনে নীনাকে পাওয়া গেল। জয়তী জিজ্ঞেস করল, কী করছ?'

নীনা বলল, 'কিছু না। আজ কলেজের ফাউণ্ডেশেন ডে ; তাই ছুটি।'

'ফাইন। চুপচাপ বাড়িতে বসে কী করবে। এখানে চলে এসো।'

আজকাল নীনা বুঝতে পারে, জয়তী তখনই তাকে ফোন করে যখন কনকেন্দু বাড়ি থাকে না। সে বলল, 'কিন্তু আকাশে ভীষণ মেঘ রয়েছে যে–'

'ও কিছু হবে না, বেরিয়ে পড়ো তো–'

ঘন্টাখানেক বাদে নীনা যখন ট্যাক্সি করে এ বাড়িতে এল তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর জয়তীরা শোবার ঘরে এসে বসতে না বসতেই আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এখন এমন প্রবল তোড়ে বৃষ্টি পড়েছে যে বাইরের রাস্তা সব কিছু ঝাপসা। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালে পাঁচ ফুট দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। বঙ্গোপসাগরের সব জল যেন মেঘ হয়ে কলকাতার আকাশে উঠে এসেছিল; এখন শহর ভাসিয়ে দিচ্ছে।

নীনা বলল, 'এ বৃষ্টি থামবে বলে তো মনে হয় না জয়তীদি ; ফিরব কী করে?'

জয়তী ভরসা দিয়ে বলল, 'থামবে থামবে। ফিরতেও পারবে।'

কিন্তু সন্ধ্যে পর্যন্ত বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। রাস্তায় এর ভেতরে তিন ফুটের ওপর জল জমে গেছে। অগুণতি ডাবল-ডেকার, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার ব্রেক ডাউন হয়ে কত দাঁড়িয়ে গেছে। চারপাশে সব কিছু অচল অনড়।

অস্থির পায়ে একবার ব্যালকনিতে যাচ্ছে নীনা পরক্ষণেই ফিরে আসছে। বিপন্ন মুখে বলেছে, কী মুশকিলে পড়লাম বলুন তো। যা অবস্থা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি কিছুই পাব না। পেলেও এই জল ঠেলে যাব কী করে?'

জয়তী বলল, 'বৃষ্টি যদি না-ই থামে, রাত্তিরটা এখানে থেকে যাবে। বাড়িতে ফোন করে বলে দাও। এক বন্ধুর বাড়ি এসে আটকে গেছ ; বেরোতে পারছ না ; কাল সকালে ফিরবে।'

আরও কিছুক্ষণ একটানা বৃষ্টিপাত দেখল নীনা। যখন বোঝা গেল এই দুর্যোগ দু-চার ঘন্টার ভেতর থামবে না নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তখন বাড়িতে মাকে ফোন করে দিল। বিধবা মা, এক চিরকুমার মামা আর সে—এই নিয়ে তাদের ছোট ফ্যামিলি।

জয়তী বলল, 'বাড়িতে তো জানিয়ে দিয়েছো এবার স্থির হয়ে বসো। কফি খাবে?

'খেতে পারি।'

দশ মিনিটের ভেতর কফি আনিয়ে একটা বড় ব্রাউন কাগজের প্যাকেট এনে কাগজপত্র বার করতে করতে বলল, 'এক মিনিট ভাই ; আমি ডাক্তারের সঙ্গে ফোনে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিই।'

নীনা জিজ্ঞেস করল, 'কার জন্যে'?

'আমার'।

'কী হয়েছে আপনার?'

'বলছি। তাঁর আগে ডাক্তারকে ফোনটা করি। এরপর আর ওঁকে পাওয়া যাবে না।'

প্যাকেট থেকে যে সব কাগজ বার করে ছিল তার থেকে দু-তিনটে বেছে নিয়ে কী দেখল। তারপর ফোন করে ডাক্তারের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল।

একটু দূরে বসে নীনা বুঝতে পারছে জয়তীর হাতের কাগজগুলো প্রেসক্রিপশন। ওতে যে সব ওষুধের কথা লেখা আছে সেগুলো আর খাবে কিনা তা ডাক্তারের কাছে জানতে চাইল জয়তী এবং চারদিন তাঁর চেম্বারে গিয়ে দেখা করার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট

করে ফেলল।

আজই এই মুহূর্তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার খুব দরকার ছিল না। কিন্তু নীনাকে তো চাইলেই এভাবে আর কাছে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এটা জায়তীর রণকৌশলেরই সব চাইতে জরুরি অংশ।

ফোন নামিয়ে নীনার কাছে চলে এল জয়তী। তারপর অভাবনীয় এক কাণ্ড করে বসল। শাড়ি সরিয়ে ব্লাউজটা খুলে শুকনো প্রায় সমতল বুকের চামড়ার চাকা চাকা শুকনো দাগ দেখাতে দেখাতে বলল, 'আমার কী হয়েছে জানতে চাইছিলে না? —এগুলো দেখ।'

চমকে উঠল নীনা, বলল 'কী কী এগুলো?'

'তোমার প্রিয় শিল্পীর উপহার'।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—' বিমূঢ়ের মত জয়তীর বুকের দিকে তাকিয়ে রইল নীনা।

তার নাকে আলতো করে টোকা মেরে অদ্ভুত হাসল জয়তী। বলল, 'নিষ্পাপ সরল বালিকা, —ভেনারেল ডিজিজ কাকে বলে জানো?' একটু থেমে বলল 'রোগটা সেরে গেছে ঠিকই ; তবে মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখিয়ে নিই।'

শুনতে শুনতে শিউরে উঠল নীনা। অজানা আতঙ্কে তার বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসতে লাগল। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কলকাতা অচল না হয়ে গেলে এ বাড়িতে আর ও এক মুহূর্ত সে থাকত না।

অনেক রাত্রে বৃষ্টি অনেকটা ধরে এল। কিন্তু দুর্গাপুর থেকে এখনও ফেরেনি কনকেন্দু; আজ আর ফিরতে পারবে মনে হয় না।

নিজের বেডরুমে চুপচাপ শুয়ে আছে জয়তী; কিন্তু ঘুম আসছে না। দোতলারই আরেক ধারে স্টুডিওর পাশে অন্য একটা ঘরে নীনার বিছানা করে দেওয়া হয়েছে। জয়তী নিজের ঘর থেকেই টের পাচ্ছে নীনাও জেগে আছে।

হঠাৎ নিচের তলায় জড়ানো গলায় প্রচণ্ড চেঁচামেচি শোনা গেল। জয়তী চমকে উঠল না, কেননা এটা প্রায় দৈনন্দিন রুটিনের মতো ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, দুর্গাপুর থেকে প্রচণ্ড মাতাল হয়ে ফিরে এসেছে কনকেন্দু।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে হলে চলে এল জয়তী। এখান থেকে নিচের হলটা দেখা যায়। চাকরবাকরেরা ধরাধরি করে কনকেন্দুকে ওপরে নিয়ে আসছে। তাদের কাঁধে চড়ে সমানে চেঁচাচ্ছে সে, আর অকথ্য খিস্তি করছে।

আচমকা পাশ থেকে ভয়ার্ত চাপা গলায় নীনা বলল, 'এসব কী জয়তীদি?'

কখন যে নীনা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে টের পাওয়া যায়নি। তার দিকে ফিরে জয়তী একটু হাসল। উত্তেজনাশূন্য শান্ত মুখে বলল, 'মদটা বেশি খেলে ভীষণ ভায়োলেন্ট হয়ে যায়। আজকাল ড্রিংকের মাত্রাটা খুব বাড়িয়ে দিয়েছে।'

'রোজই উনি এভাবে বাড়ি ফেরেন নাকি।'

'হ্যাঁ, প্রায় রোজই, কিন্তু ও তোমার প্রিয় আর্টিস্ট ; এসব বাজে দৃশ্য তোমার দেখা ঠিক নয়। যাও ঘরে চলে যাও'।

নীনা একরকম দৌড়েই হল পেরিয়ে ওধারে চলে গেল।

পরের দিন খুব ভোরে কনকেন্দু জাগবার আগেই নীনা চুপচাপ এ বাড়ি থেকে চলে গেল। জয়তী টের পেলেও তাকে আটকালো না।

দু দিন পর কী একটা কাজে দুপুরে বেরিয়ে গিয়েছিল কনকেন্দু। সন্ধ্যেবেলা থমথমে মুখে ফিরে এসে কনকেন্দু প্রায় ফেটে পড়ল, 'নীনা এ বাড়িতে অনেকবার এসেছে তুমি তার সঙ্গে ফোনে কথা বল— এসব তো আমাকে জানাওনি!'

জয়তী বলল 'তুমি যে ওদের বাড়ি যাও, ওর সঙ্গে এখানে ওখানে বেড়াও, আমাকে জানিয়েছ?'

উত্তর না দিয়ে কনকেন্দু দাঁতে দাঁতে ঘষল। বলল, 'আমার সম্বন্ধে ওকে কী বলেছ তুমি? কী দেখিয়েছ?' তার নাক মুখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল ।

'নীনার যা জানা বা দেখা উচিত শুধু তা-ই সেটুকুই বলেছি, দেখিয়েছি।

'আচ্ছা, ঠিক আছে তোমাকে আমি ছাড়ব না। এমন শিক্ষা দেব—' বলে স্টুডিওতে চলে গিয়েছিল।

এর কিছুক্ষণ পর নীনার ফোন এল। 'আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন জয়তী দি। সারা জীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।'

যেন নীনার কথা কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন ভঙ্গিতে জয়তী বলল, কী ব্যাপার? কীভাবে তোমাকে বাঁচালাম?'

নীনা বলল, 'আমাকে সে কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না, প্লীজ—' বলে লাইন কেটে দিল।

ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে একটু হাসল জয়তী। এখনও যুদ্ধ করার শক্তি তার শেষ হয়ে যায়নি।

করাত



বারোশ টাকা দিয়ে একটা টেপ-রেকর্ডার কেনার ক্ষমতা আর যার থাকে থাকুক সুবলের ছিল না। তবু কো-অপারেটিভ থেকে ধার নিয়ে সে যন্ত্রটা কিনে ফেলল। প্রথমদিন যখন ওটা তার নজরে আসে তখনই বুকের বেতর উত্তেজনা শুরু হয়েছে। কেমন নিটোল, মোলায়েম দেখতে, জাপানে তৈরি, শব্দ শুনলে মনে হয় কেউ যেন বুকের মধ্যে বসে

কথা বলছে। একটা রাত খুব অস্বস্তিতে কেটেছে তার। যার জিনিস সেই কান্তিদা বলেছিল, 'এসব স্মাগলড জিনিস। বাজারে দু হাজারেও পাবে না। হঠাৎই আমার হাতে এসে গিয়েছে। ভাল খদ্দের পেলে বিক্রি করে দেব।'

'কত দাম নেবেন।'

'আমি তো ব্যবসা করি না। যা দাম মানে বারোশ পেলেই হবে। তুমি তো সরকারি অফিসে কাজ কর। দেখ তো কেউ যদি আগ্রহী হয়।' কান্তিদা বলেছিল।

রাত্রে খাটে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল সুবল। খাট চার বাই সাত। জানলা একটা। মাথার ওপর পাখা ছত্রিশ ইঞ্চির। এছাড়া একটা আলমারি আছে যার পাল্লা দুটো খোলার সময় খাটে লাগব লাগব হয়। এছাড়া আছে একটি তিন বছরের পুত্র এবং পঁচিশ বছরের স্ত্রী। সুবলের বয়স ত্রিশ।

সরকারি অফিসে সুবলের অবশ্য কিছু উপরি আয় আছে। ছয়শ টাকা বেতনের পর সেগুলো যোগ করলে আরও শখানেক তো বটেই। তবে সেটা সাহেবের চরিত্র অনুযায়ী কমে বাড়ে। এখনকার সাহেব খুব কড়া। পার্টিদের কাছ থেকে ঘুষ খান না। ফলে বাজার মন্দা যাচ্ছে সুবলের। সেকশনের বাবুরাও অখুশি। এই অবস্থায় বারোশ টাকা খরচ করার কোন উপায় ছিল না। সারারাত ছটফট করল সুবল। এমন মোলায়েম টেপ-রেকর্ডার। কি শব্দ। লতার একটা ক্যাসেট চালিয়েছিল কান্তিদা, যেন কোকিল ডাকছিল। খাটের নীচে বাচ্চা নিয়ে শুয়েছিল মালতী। তাকে উসখুস করতে দেখে বলল, 'কি হল? আমার শরীর খারাপ।'

'তোমাকে কে ডেকেছে?'

'তা তো বলবেই! আজ সেই ডাইনি বুঝি নজর দিয়েছিল।'

'বাজে বকো না।'

'হ্যাঁ, কথা তো সহ্য হবেই না। নতুন বাড়ির কি হল?'

'চাইলেই বাড়ি পাওয়া যায়?'

'আমি এসব জানি না। এক মাসের মধ্যে যদি বাড়ি না বদলাও তাহলে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব বলে দিলাম।'

'যাবে যাও, আমি কি করব।'

'তাইতো। আমি বাপের বাড়ি গেলে তোমার পোয়াবারো। এই ডাইনির সঙ্গে লীলা করতে আর বাধা থাকবে না। ও ভগবান, আমি যে কি করি।'

'আঃ, কত জোরে চেঁচিও না। রাত দুপুরে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙবে।'

'বেশ করেছি। তিনি স্বর্গে গেছেন। কত পূণ্যবতী ছিলেন। তিনি আমাকে বলে গিয়েছেন, বউমা, একটু সাবধানে থেক। নিচের তলার ওই ভাড়াটে বউটা ঠিক সুবিধের নয়। খোকার দিকে নজর ছিল।'

কথাটা এ পর্যন্ত বোধহয় হাজারবার, শুনেছে সুবল। মালতীর রক্তে মিশে গিয়েছে কথাটা। খুব ভাল মুহূর্তের পরেই আচমকা বলে বসে কথাটা। সেই মুহূর্তে হয়তো মোটেই আশা করেনি সুবল কথাগুলো। আর তখনই মায়ের প্রতি এক ধরনের আক্রোশ মনে পা ক খায়। কোন মা নিজের সন্তানের এমন ক্ষতি করতে পারে?

যৌবনের শুরুতে যেকোন যুবকেরই একটু আধটু চিত্তচাঞ্চল্য হয়। সুবলেরও হয়েছিল। তখন সে এই ঘরে একা থাকত। নিচের ঘরগুলোর দুটোয় মা আর দাদা-বউদির বাচ্চারা সিঁড়ির মুখটায় হরিপদদা ও তার বউ। হরিপদদা রেলে কাজ করেন। টি টি। বউদি এতকাল দেশে ছিলেন। এখানে নিয়ে এসে হরিপদদা মাকে বলেছিলেন, 'মাসীমা, আপনার ভরসায় ওকে নিয়ে এলাম। আমার তো ঘোরাঘুরি চাকরি। ওকে একটু দেখবেন, একা থাকবে।'

মা বলেছিলেন 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই? একই ছাদের তলায় ভাড়টে দেখব না? বাঃ, বেশ সুন্দব বউ তো। কোলে একটা বাচ্চা না এলে মানায় ?'

প্রথম দর্শনেই চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছিল। মনে হয়েছিল হরিপদদার সঙ্গে মানায় না। যেমন লম্বা তেমন ফিগার। কি চুল মাথায়? বাচ্চা হয়নি বলেই শরীর অমন নিটোল। দু-একদিনের মধ্যেই চোরা চাহনি, টেপা হাসি শুরু হল। সেইসব হাসি দেখে ঘরে ঢুকে সুবলের মনে হত সে মরে যাবে। রক্তে যেমন কুলুকুলু শব্দ বাজত। সুবলের ঘরের সামনে দিয়ে সবাইকে ছাদে কাপড় মেলতে যেতে হয়। ভেজা কাপড়ে নতুন বউদি যখন সেখানে যেত তখন পায়ের ডিমটা আচমকা সুবলের চোখ লেপ্টে দিত। কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি, কথাবার্তা হয়নি কখনও। তাকে দেখলেই যে নতুন বউদির বুকের আঁচল ঝুলে পড়ে সেটা বুঝে চমৎকার আরাম লাগত। বাক্যালাপ ছাড়াই পরস্পরের বেশ জানাশোনা হয়ে গিয়েছিল। একদিন শুনল মা বলছে, 'আমার ছোট ছেলে সরকারি চাকরি করে, বড় লাজুক, তা তোমার যদি বোন-টোন থাকে তো বল, সম্বন্ধ করি।'

নতুন বউদি হেসে বলেছিল, 'অত লাজুক ছেলে বিয়ে করবে তো!'

গোলমালটা পাকালনে হরিপদদাই।

সাহেবের ছেলের টিকিট কাটতে হাওড়ায় গিছেল সুবল। যাওয়া-আসার ভাড়া বাবদ পাঁচটা টাকা দিয়েছে সাহেব। এ থেকে ভাল থাকবে তাই মনে ফূর্তি ছিল। টিকিট নিয়ে কয়েক পা যেতেই হরিপদদার সঙ্গে দেখা। ওকে দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'সত্যি মাথার ওপর ভগবান আছেন। কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। শোন, বিকেলে তোমার কাজ আছে কোন?' হরিপদদা তার হাত ধরল।

'কাজ? না।' সুবল বুঝতে পারছিল না।

'তাহলে আমার একটা উপকার কর। আজ ইভিনিং শো-তে তোমার বউদিকে নিয়ে 'সাগরিকা' দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। ও সোজা চলে আসবে হলে। কিন্তু ভাই, হঠাৎ আমার যা ডিউটি পড়েছে তাতে রাত দশটার আগে বাড়ি পৌছতে পারব না। ওকে যে খবর দেব তারও উপায় নেই। তুমি টিকিটটা রাখ। যদি ইচ্ছে হয় দেখ, নইলে বেচে

দিয়ে সাত তাড়তাড়ি ওকে খবর দিয়ে দিও। বেচারা একা হলে বসলে বিপত্তিতে পড়তে পারে।'

সুবল মাথা নেড়েছিল। কিন্তু দ্রুত একটা টিকট নিয়ে পালিয়ে এসেছিল হরিপদদার সামনে থেকে। তার শরীরের সব রক্ত মুখে চলে আসছে, হৃদ্‌পিণ্ড জোর শব্দ করছে। একবার মনে হল আগেভাগে বাড়ি গিয়ে নতুন বউদিকে জানিয়ে দেয় ঘটনাটা। কিন্তু সেটাকে উড়িয়ে দিতে মুহূর্ত লাগল না। সারাটা বিকেল জরাগ্রস্ত হয়ে রইল সুবল।

রাস্তাঘাটের এমন অবস্থা যে পাড়ার হলে পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল সুবলের। তখন বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে। দম বন্ধ করে টর্চের আলো অনুসরণ করে আসনে বসতেই চাপা গলা শুনতে পেল সে, 'এত দেরি হল যে? আমি কি ফ্যালনা?'

সুবলের মনে হয়েছিল ওর গলায় কোন স্বর নেই। তবু কোনরকমে বলেছিল, 'আমি সুবল।'

'ওমা! কি করে হল?' যেন খুব চমকে গেছেন নতুন বউদি।

যত কম কথায় পারে ঘটনাটা বলল সুবল। এবার নতুন বউদি বললেন, 'ভাগ্যিস! নইলে তো বাবুর সঙ্গে কথাই হত না। যা গম্ভীর!'

'মোটেই আমি গম্ভীর নই।'

'সে আমি তাকান দেখেই বুঝতাম।'

'কিভাবে তাকাতাম?'

'গিলতে।'

এই সময় পেছন থেকে একজন বলল 'দাদা, আস্তে। বাড়িতে কথা শেষ করে আসেন না কেন?'

সেই শুরু। তবে নতুন বউদি খুব খেলুড়ে মেয়েমানুষ। হাত ধরাধরি, চুমু খাওয়া-খাওয়ি কিংবা আর একটু পর্যন্ত যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল। ছাদে গেলেই চট করে নেমে আসত তার ঘরে। তারপর মিনিট পাঁচেক ওইসব কর্ম। তখন পাগল হয়ে যেত সুবল। কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে বাধা দিত নতুন বউদি, 'না, সুবল ঠাকুরপো, ওটা না। তোমার দাদা টের পেলে কেটে ফেলবে আমাকে।'

'কি করে টের পাবে?' মরিয়া হয়ে উঠেছিল সুবল।

'পাবে। তাছাড়া আমার নিজেকে কেমন নোংরা মনে হয়। আর সব করো না, আমিতো তোমার আছি।' নতুন বউদি মোহিনী হাসি হাসত।

'না, আমি তোমার ছলনায় ভুলব না।'

'বাবা, এ দেখছি হেলে থেকে গোখরা। তোমার দাদার বাচ্চা হবে না, বড় ডাক্তার বলে দিয়েছে। ফট করে যদি আমার একটা কিছু হয়ে যায় তাহলে কি জবাব দেব?'

তখন শরীরের নিমকানুন ভাল বুঝত না সুবল। ফলে এই কথার পর গুটিয়ে যেত সে। আর তখনই নতুন বউদি বলত, 'তোমার দাদা আমাকে খুব ভালবাসে।'

'তাই নাকি!' খুব খারাপ লাগত কথাটা।

হুঁ। আমাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না মোটা একটা উপরি পেলে বলেছে টেপ-রেকর্ডার কিনে দেবে। তাতে আমি তোমার গলা ধরে রাখব। যখনই ইচ্ছে হবে তখনই বাজিয়ে শুনব। অনন্তকাল তুমি থাকবে আমার কাছে।'

সেই চিত্তচাঞ্চল্যের সময়ে পৃথিবীতে আর সব কিছু মুছে গিয়ে শুধু নতুন বউদির মুখ, হাসি লাস্য তাকে ঘিরে রেখেছিল। সে সময় অফিস ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখেছে কত। বাসে চেপে আজ বারাকপুর কাল কল্যাণী। এমনভাবে যাওয়া হত যাতে বিকেলের মধ্যে নতুন বউদি বাড়িতে ফিরতে পারে। কিন্তু এসবে মন ভরত না সুবলের। কিন্তু নতুন বউদি বলত 'তুমি একটা বোকা। আমার তো ছেলেপুলে হবে না কখনও। সারাজীবন বেশ দুজনে প্রেম করে যাব। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'তোমার বিয়ে করা চলবে না।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে সম্পূর্ণ পাচ্ছি না।'

অনেকক্ষণ ভেবেছিল নতুন বউদি। তারপর রহস্য করে বলেছিল 'পেলেই তো সাধ মিটে যাবে। বেশ, তুমি যদি কথা দাও বিয়ে করবে না তাহলে এই আড়ালটা আমি রাখব না। এখনই কথা দিতে হবে না, ভেবে বলো।'

মন যখন প্রায় ঠিক তখনই মা কাণ্ডটা করল। রবিবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বলল, 'খোকা, আজ তোকে মেয়ে দেখতে যেতে হবে। বেশি দূরে নয়, মানিকতলায়। খুব ভাল বংশ। ফুলের নামে মেয়েটির নাম, মালতী।'

আকাশ থেকে পড়েছিল সুবল, 'কার জন্যে যাব?'

'কার আবার? তোর। আমি আর এসব বেলেল্লাপনা চোখ চেয়ে দেখতে পারছি না। ও ডাইনির হাত থেকে তোকে বাঁচাতে হবে।'

আঁতকে উঠেছিল সুবল, 'কি যা তা বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলেছি। আমরা তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চিরকাল চলতে পারি না। তোর দাদা অনেক খুঁজে ওই সম্বন্ধটা এনেছে। তুই যদি না যাস তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি বলে দিলাম। তোর দাদা-বউদি তিনটের সময় যাবে।'

হাতে সময় মাত্র দু ঘন্টা। অথচ কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না সুবল। মালতী নামক যুবতী সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। খবরটা নতুন বউদিকে জানানো দরকার। একটা পরামর্শ করলে। সে ভেবে পাচ্ছিল না মা এই গোপন ব্যাপার কি করে জেনে গেল? একবার মনে হল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সেটা করলে তো নতুন বউদিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সেই যন্ত্রণা একা যখন বিদ্ধ করছে তখন হরিপদদা এসে দাঁড়াল দরজায়। ভুত দেখার মত চমকে উঠেছিল সে। ঘটনাটা কি হরিপদদাও জেনে গিয়ে তাকে চার্জ করতে এসেছে?

হরিপদদা বললেন 'কিহে, এখনও সাজুগুজু করনি? রেডি হও জলদি। তোমার মা দাদা বললেন আমাকেও সঙ্গে যেতে। বিনিপয়সায় বেশ খ্যাটন মারা যাবে। জলদি কর। আর দেরি নেই।'

মেয়ে দেখা মানেই বিয়ে হয়ে যাওয়া নয়। নিজেকে বোঝাল সুবল। যখন বের হল তখন ধারে কাছে নতুন বউদি নেই। মনটায় খিঁচ ধরল। সামনে থাকলে অন্তত ইশারায় বোঝাত ভয়ের কিছু নেই। মায়ের কথা রাখতেই যাওয়া।

মালতী মেয়েটা খারাপ নয়। তবে কিনা নতুনবউদির ধার ওর নেই। হরিপদদা বললেন, 'বউ যদি আনতে হয় তো এইরকম মেয়েই উপযুক্ত। শিখিয়ে-পড়িয়ে নিজের মত করে নিতে পারবে। ধেড়ে মেয়ে আনলে তার মুখে লাগাম বাঁধার সুযোগ পাবে না হে সারা জীবন।'

আর ভাগ্যটা এমন সেই রাত্রেই কিনা হরিপদদার শালার অসুস্থতার খবর এল। পরদিন বাড়ি ফাঁকা। নতুন বউদিকে রেখে এল হরিপদদা দেশের বাড়িতে।

বিয়েটা চুকে গেল। সুবলের কোন উপায় ছিল না। মা এমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে ভয় হচ্ছিল হরিপদদা তো বটেই সমস্ত পাড়াটা না জেনে যায়। এমনকি সুবলের নিজের বউদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানাল, বাড়িটা এখন বেশ শান্ত। তিনি থাকলে তো এপাশের রায়বাবুর জানলা বন্ধ হতেই চায় না।'

কথাটা শুনে চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল সুবলের। নতুন বউদিদের উল্টোদিকে রায়বাবু থাকেন পাড়ার সেরা লম্পট। পঞ্চাশ বছর বয়সেও রোজসন্ধ্যেবেলায় গিলে করা পাঞ্জাবী পরে বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। ব্যাটা নতুন বউদির সঙ্গে ?

খুব রাগহ হলেও মনে হয়েছিল একবার নতুন বউদির সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু সেই যে দেশে গিয়েছে আর ফেরার নাম নেই। সেখানে যাওয়া যে অশোভন তা বোঝার মত বুদ্ধি ছিল।

বউভাতের দিন ফিরে এল নতুন বউদি। একদম ঘরে ঢুকে নতুন বউদি মালতীকে দেখে বলল, 'ইস, কি সুন্দর বউ এনেছ। কিন্তু ভাই, সাবধানে থেক।'

মালতী বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। নতুন বউদি হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'উপোসী বাঘের মুখে পড়েছে তো, হাড়গোড় আস্ত রাখলে হয়।'

সেই রাত্রেই মা সর্বনাশটি করলেন। ফুলশয্যায় মালতী যখন সেজেগুজে এল তখন সুবলের বিবেক জ্বালাটা কমেছে। একটা সম্পূর্ণ নারীকে পাওয়ার জন্যে সে তৈরী। মালতী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, ওই ভাড়াটে বউটার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ?

হোঁচট খেল সুবল। কোনরকমে বলল, 'মানে!'

'মা বললেন, বউমা, একটা কথা বলে দিই, ছেলে আমার খুব ভাল, কিন্তু ওই বউটা একটা ডাইনি। খবরদার খোকাকে ওর কাছে যেতে দিও না। দিলে তোমার কপাল পুড়বে। কেন বললেন উনি একথা?'

'সেটা মাকেই জিজ্ঞাসা করলে না কেন? সেই মুহূর্তে মায়ের প্রতি ক্রোধে তার শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। প্রথম রাত্রেই বউকে এসব না বললেই চলছিল না!

'আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'এমনি ঠাট্টা ইয়ার্কি করতাম, আর কিছু না। কথা ঘোরাতে চাইল সুবল।'

'আর কিছু না?'

'তাহলে তুমি ওর সঙ্গে কোনদিন কথা না বলে থাকতে পারবে?'

'কেন পারব না?' সেই মুহূর্তে সুবল প্রসঙ্গটা শেষ করতে চাইছিল।

'বেশ। কথাটা মনে রেখ।'

মালতীর শরীরে তেমন কোন আকর্ষণ নেই। একবার বর্ধমানে গিয়েছিল সুবল। নতুন জায়গার আকর্ষণ ফুরিয়ে যেতেই একবেলাও লাগেনি। আর একবার দিল্লীতে গিয়েছিল বেড়াতে। সাতদিনেও আকর্ষণ শেষ হয়নি। এ যেন সেইরকম ব্যাপার। কিন্তু তারপর থেকেই যে ব্যাপারটা শুরু হয়েছে সেটাই মারাত্মক।

এই বাড়ি থেকে বের হতে গেলে নতুন বউদির ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হয়। সিঁড়ির আড়াল থাকায় ওই ঘরের সামনেটা এ পাশের ঘরগুলো থেকে দেখা যায় না। ফুলশয্যার পরদিন যখন সুবল নিচে নামছে তখনই নতুন বউদিকে দেখতে পেল। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে খোলা চুলে। চোখ জ্বলছে। মুখ নীচু করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল সুবল, চাপা গলায় ডাক এল, 'দাঁড়াও'।

মুহূর্তে পা থেমে গেল।

'খুব মজা লুটলে কাল রাত্রে না?'

জবাব দিতে পারেনি সুবল। তাড়াতাড়ি আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর ওখান দিয়ে যেতে গেলেই শোনে, 'কবে বিয়োবে বউ'?' কিংবা 'বেশ তো জড়িয়ে ধরে শোয়া হচ্ছে পাটকাঠিটাকে।' এসবই বলা হয় চাপা গলায় যাতে সুবল ছাড়া অন্য কেউ শুনতে না পায়। ওই আড়ালটুকু পার হতে সুবলের বুক ফেটে যায়। দিনের পর দিন একই সংলাপ। একই যন্ত্রণা। প্রথম প্রথম সুবলের মনে হত সে পাগল হয়ে যাবে। এখন ভাটা পড়ে যাওয়ার অবস্থায়।

এতগুলো বছর কাটল। মালতী সত্যি পুরনো হয়ে গিয়েছে। এই স্বল্প সময়েই সুবলের শরীরের নখগুলো ঝরে খাটো হয়ে গেছে। সংসারে অভাব বেড়েছে। সেটা সমলাতেই প্রাণ জেরবার, প্রেম-ফ্রেমের চিন্তা মাথাতেই আসে না। রাত্রে রুটি-তরকারি পেটে দিয়েই মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই শান্তি। মালতীরও কোনো দাবি-দাওয়া নেই। যত দিন যাচ্ছে তত শুকিয়ে যাচ্ছে শরীর, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, গাল ভেঙেছে। রমণীসুলভ কোনো কমনীয়তা নেই। মালতীকে দেখলেই ত বোঝা যায় ওদের সংসারটা খুব অভাবী। এর মধ্যে মা স্বর্গে গিয়েছেন কিন্তু চারাটি পুঁতে গিয়েছিলেন, সেটি বড় হয়েছে। মালতীর

মনে সন্দেহ থিকথিক করছে। তার শরীর যত চিমসে হচ্ছে নতুন বউদির তত জেল্লা বাড়ছে। পাড়ার ছেলেরা তো জিভভর্তি জল নিয়ে বসে আছে রকে রকে দিনরাত। ওপাশের জানলা ঝড়-বৃষ্টিতেও বন্ধ হতে চায় না। কিন্তু সুবলের চোখে পড়লেও আজকাল মনের থেকে কোনো সাড় আসে না। সারাদিনের অর্থচিন্তা আর ধকল এত ক্লান্ত করে শরীরটাকে যে, কোনোরকম কামনা-বাসনা মাথায় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আশ্চর্য, নতুন বউদির কিন্তু সেটা দেওয়ার বিরাম নেই। আর বিরাম নেই মালতীর শাসানির, নতুন বউদির সঙ্গে একটিও কথা নয়।

এই অবস্থায় কো-অপারেটিভ থেকে ধার করে টেপ-রেকর্ডার কেনার কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এর ওপর আছে মালতীর নতুন বাড়ির আবদার। তাতেও তো মোটা খরচের ধাক্কা। কিন্তু টেপ-রেকর্ডার না কিনে তার উপায় ছিল না।

সেদিন বাজার ফেরত নিত্যর চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছিল সুবল। নিত্য এখনও কুঁড়ি পয়সায় চা বেচে। সেখানে যোগীন এসেছিল। যোগীন জাহাজে কাজ করে। প্রত্যেক বছর বেশ কিছু বিদেশী মাল নিয়ে এসে পাড়ার লোকেদের কাছে ঝেড়ে দেয়। সুবল দেখল হরিপদদা যোগীনের সঙ্গে কথা বলছে। যোগীন বলল, 'না, না এবার কোনো ইলেকট্রনিক জিনিস আনতে পারিনি। শুধু পারফিউম আর জামাপ্যান্ট।'

হরিপদদা বলল, 'কিন্তু তোমায় গতবার বলেছিলাম একটা টেপ-রেকর্ডার আনতে।'

'আরে হরিদা, এ আপানার রেল কোম্পানি নয়, মাঝে মাঝে কাস্টমসের বাবুরা এমন কড়া হয় এসব আনা যায় না। এখন তো দেশী কত ভাল মাল বেরিয়েছে, তাই কিনুন।' যোগীন বিদেশী সিগারেট ধরিয়েছিল।

'না না। আমার বউয়ের বিদেশী জিনিস পছন্দ।'

এই সময় যোগীন তাকে দেখতে পেল, 'এই সুবল, তোদের সঙ্গে কান্তিবাবু বলে কেউ কাজ করে? কান্তি হালদার?'

সুবল ঘাড় নাড়ল। কান্তিবাবু অনেক উঁচু পোস্টে আছেন। বেশ বড়লোক।

যোগীন হাসল, 'হরিদা সুবলকে ধরুন। ওই কান্তিবাবুর কাছে বিদেশী মাল আছে। ওর ভাই আমাদের সঙ্গে জাহাজে কাজ করে। একমাত্র ওই এনেছে ম্যানেজ করে।'

সুবলের সঙ্গে হরিপদর আজকাল বাক্যালাপ কমে গেছে। কোনো গোলমাল হয়নি। সুবলই এড়িয়ে চলে, মালতীর ভয়ে কম কথা বলে। হরিদা নেমে এল দোকান থেকে, 'ভাই সুবল, তুমি তাহলে উপকারটা করো। আমাকে কান্তিবাবুর কাছে নিয়ে চল। তোমার নতুন বউদির আবদার তো জান। যা চাইবে তা না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না।'

ওই সব ঝামেলায় থাকতে চায়নি সুবল। বলেছিল, 'ঠিক আছে, আগে কথা বলে দেখি উনি কি বলেন। অফিসার মানুষতো।'

'আজকালের মধ্যেই করে ফেল ভাই। আর কোন কোম্পানির কি মডেলের জিনিস তাও জেনে এস। বাজারে দামটা যাচাই করে আসতে হবে তো।'

কান্তিদার কাছে মালটা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। শব্দ শুনলে মনে হয় কেউ যেন বুকের মধ্যে বসে কথা বলছে। তার যদি টাকা থাকত তাহলে—! ভাবতে ভাবতে সে মরিয়া হয়ে উঠল। বারোশ টাকা কি এ জন্মে শোধ হবে না? মালতীকে বললে কাঁইমাই করে উঠত। চুপিচুপি কো-অপারেটিভ থেকে টাকাটা তুলে জিনিসটা ঘরে নিয়ে এল সুবল। বেশ লম্বা, দুটো স্পিকার দেখতে চমৎকার। কিন্তু এক সেট ব্যাটারিও কিনতে হল সেই সঙ্গে। পুরনো আমলের বাড়িতে এ সি কারেন্ট আসেনি। ব্যাটারির খরচটা গায়ে লাগল।

মালতী জিজ্ঞাসা করল 'ওটা কি?'

'টেপ-রেকর্ডার'।

'কি?'

'টেপ-রেকর্ডার। এখানে গান বাজে। তুমি ইচ্ছে করলে কথা বলতে পার, সেটাও রেকর্ড করা যাবে। কিন্তু দোকান থেকে বলে দিয়েছে আমি ছাড়া যেন কেউ হাত না দেয়।'

'হাত দিতে বয়ে গেছে আমার! কত দাম নিল?'

'নেয় নি এখনও। আগে বাজিয়ে দেখি।'

'কাকে শোনাবে গান?'

'কাকে আবার নিজেরাই শুনব।'

'ঢং।' মালতীর মুখটা কুৎসিত হল, 'মেয়ের একটা ভাল জামা নেই, উনি গান সোনার যন্ত্র নিয়ে এলেন!'

সযত্নে টেপটা চালাল সুবল। কান্তিদা একটা ক্যাসেট দিয়ে দিয়েছিল। কি সুন্দর আওয়াজ। বাচ্চাটা এগিয়ে এসেছিল যন্ত্রটার দিকে, এক ধমক দিল সুবল। নাঃ, বাইরে রাখা চলবে না। আলমারিতেই বন্ধ রাখতে হবে। এরা এর কি মর্ম বুঝবে! লতার গান হচ্ছে। আর তখনই খেয়াল হল নতুন বউদির আজো টেপ-রেকর্ডার কেনা হয়নি। নিশ্চয়ই এই গান নিচে পৌঁচাচ্ছে। শব্দটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিল সুবল।

'কানের মাথা খেয়েছ নাকি? হাঁটার জায়গা নেই ঘরে উনি মাইক চালাচ্ছেন। বন্ধ কর। আমার মাথা ধরে গেল বাবা।'

বাধ্য হয়ে আওয়াজ কমিয়ে দিল সুবল।

সত্যি এই টেপ-রেকর্ডার তুলনায় ওদের ঘরটা খুই ছোট। তারপর কি মনে হতেই গানটাকে বন্ধ করে রেকর্ড করার বোতাম টিপে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার এটাকে পছন্দ হচ্ছে না'।?

'আমার কোন পছন্দটা তুমি জান? যে কদিন পেরেছ আমার শরীরটাকে ছিবড়ে করে এখন সোহাগ জানানো হচ্ছে? আজ রেশন না আনলে কাল হাঁড়িও চড়বে না।'

চট করে বোতাম টিপে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার মেসিন চালু করতে মালতীর মুখটা বিস্ফারিত হল। নিজের গলা নিজের কানে যেতেই একহাত জিব বের করেল সে, 'এ মা এইসব হয় নাকি?'

'হুঁ। এখন থেকে সাবধানে কথা বলবে। নইলে রেকর্ড করে পাঁচজনকে শোনাব!'

খবরটা চাপা থাকল না। হরিপদদা পরদিনই তাকে ধরলেন! 'এনেছ?'

'হুঁ!'

'কত দাম পড়ল?'

'পনেরশ?'

'পনেরশ।'

'হুঁ।'

'কেমন দেখতে ?'

'ভাল, তবে বিক্রি করব না।'

'সেকি? তুমি আমার জন্যেই তো এনেছ!'

'না, বিক্রি করব না'।

'সুবল ভাই, কাল থেকে ও আমার মাথা খেয়ে ফেলছে। তুমি না হয় আর একটা কিনে নিও। এটা আমাকে দিয়ে দাও। আমার সংসারে শান্তি থাকবে না।'

'আমি পারব না।'

'বেশ, আমি তোমাকে ষোলশ দিচ্ছি। একশ তোমার লাভ থাকল।'

শক্ত হয়ে গেল সুবল। বারোশ টাকায় কিনে তেরশ লাভ? সে বলল, 'দেখি'।

সেদিনই বাড়ি ফিরে বাড়ির আড়ালে আসতেই শুনতে পেল, 'কাল সারারাত বউকে জড়িয়ে টেপ শোনা হয়েছে। তার চেয়ে একটা পাটকাঠি জড়ালেও আরাম বেশি হত।'

সুবল কোন কথা বলল না। ঘরে ফিরে শুনল, 'শোন, ওই যন্ত্রটা ফিরেয়ে দিয়ে এস। রাজ্যের লোক সারাদিন এসে দেখতে চায় শুনতে চায়।'

'দেখুক না।'

'না।'

'বেশ, বিক্রি করে দেব ওটাকে ।'

'তোমার জিনিস নাকি যে বিক্রি করবে?'

'যার জিনিস সে আমাকে কমিশন দেবে বেচে দিতে পারলে। তা ধর চারশ টাকা লাভ হবে আমার।'

'চারশ?' মালতীর চোখ কপালে উঠলো, 'সে যে অনেক টাকা।'

'হুঁ'।

'ভালই হবে। বাচ্চার জামা, আমার শাড়ি, তোমার একটা ভাল প্যান্ট। একেবারে পুজোর সব খরচ ওটা দিয়েই করে ফেলা যাবে। যাও আজকেই বেচে দিয়ে এস।'

'আজকেই?'

'কেন দেরি করবে? যদি খদ্দের ফসকে যায়।'

সুবল উঠল। হরিদা নিশ্চয়ই এতকক্ষণে ফিরেছে। খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর। বড্ড মায়া লেগেছে এর মধ্যেই। মালতীর থেকেও যন্ত্রটা ওর কাছে বেশি আদরের যেন। কিন্তু চারশ টাকা কম কথা নয়।

জিনিসটা নিয়ে নিচে নেমে সে ডাকল, 'হরিদা!'

'এস ভাই। আমি এইমাত্র ফিরলাম। এনেছ? ঘরে ঢোক না।'

সুবল আড়চোখে দেখল ওপরের বারান্দায় কেউ নেই। সে টুক করে পর্দা সরিয়ে ঘরে পা দিল। খাটের ওপর রাজরাণীর মতন নতুন বউদি বসে। হরিদাকে যেন চাকর চাকর দেখাচ্ছে। ঘরটাও বেশ বড়।

টেপ-রেকর্ডার টেবিলে নামিয়ে রাখতেই নতুন বউদি ছুটে এসে হাত দিল, 'বাঃ, কি সুন্দর। ঠিক এই রকমই চেয়েছিলাম আমি।'

'দামটা বেশি।' হরিদার পছন্দ হয়েছে।

'বাজারে দু হাজারেও পাবেন না।' সুবল বলল।

নতুন বউদি নিজেকেই যেন প্রশ্ন করছে, 'সাউণ্ড কেমন? ক্যাসেট আছে।'

'এক পিঠে লতার গান আছে।' বলতে বলতেই খেয়াল হল মালতীর গলাটা মোছা হয়নি। তার শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কোন পিঠে গলাটা? কিছু করার আগেই নতুন বউদি বোতাম টিপে দিল আর লতার গান ভেসে এল। শব্দ শুনে খুব খুশি ওরা। এই নতুন বউদিকে যেন চেনাই যাচ্ছে না।

টাকা দিয়ে দিল হরিপদদা। অত টাকা ঘরে রাখে যে, সে কত ঘুষ খায় কে জানে। তারপর সারাটা সময় নিচের ঘরে গান বাজতে লাগল।

মালতী জিজ্ঞাসা করল, 'ওই গান নিচে বাজছে কেন?'

'হরিদাকেই বেচে দিলাম।'

'কেন? এত লোক থাকতে সেখানে কেন?'

'আর লোক ছিল না। একদম চেঁচাবে না। চারশ টাকা আয় হয়েছে, ধরো।'

পরদিন বারোশ টাকা সযত্নে নিয়ে সুবল ঘর থেকে বের হল। কো-অপারেটিভে জমা দিয়ে দিতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনল, 'যে কদিন পেরেছ আমার শরীরটাকে ছিবড়ে করে এখন সোহাগ জানানো হচ্ছে?' মালতীর গলা। তারপরেই হাসি, নতুন বউদি হেসে চাপা গলায় বলছে, 'ওই তো পাটকাঠি। তাকেও ছিবড়ে করা মরণ!'

রাগে শরীর জ্বলে গেল সুবলের। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেখল ঘরের দরজা খোলা।

নতুন বউদি ঘরে নেই দূরে আর এক ভাড়াটের বউয়ের সঙ্গে গল্প করছে যেন খুব তন্ময় হয়ে। কোনো উপায় নেই ধরার। সে আসছে বুঝতে পেরে টেপটা আগে থেকে চালু করে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুবলের মাথায় চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল। এখন থেকে নতুন বউদিকে আর প্রত্যেক দিন কথা বলতে হবে না। যতদিন সে বেঁচে থাকবে ওই একটি কথাকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শোনালে চলবে।

এই করাতের ধার এক জীবনেও ভোঁতা হবে না।

বাতাবরণ



সবেধন নীলমণি। অবশ্যি আরেকটি ঠিকে মেয়ে আসে মোটা কাজ সারতে । তার মাসের মধ্যে আট দশদিন কামাই লেগেই থাকে। শর্মিলা তখন একা হাতেই নিজের কাজের ওপরও ঘর ঝাড়ামোছা , বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কাচড়া ফেলা সব সামলায়। মেয়েটা চৌকস। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে মনে হয়। আট বোনের তিন নম্বর। ডায়মণ্ডহারবারের দিকে বাড়ি। বাপ নাকি জুয়া খেলে আর তাড়ি খেয়ে বিঘে দেড়েক ধানী জমি ছিল সেটাও উড়িয়ে দিয়েছে। মা গ্রামের গেরস্ত ঘরের বৌটি। একা গিয়ে বাস ধরতেও ভয় পায়।

'লেখাপড়ার কথা ছেড়েই দিন বৌদি—একটু সাবান-টাবানও নয়। ছেঁড়া ট্যানা ছাড়া আর কিছু জোটেনি।' গঙ্গামণি আজও আসেনি। ঘর ঝাড়ু দিয়ে মুছতে মুছতে শর্মিলা ওর দুঃখের কথা বলছিল নন্দিতাকে। 'বড়দিটার কোনমতে বিয়ে হল। জামাইদাদা ডেরাইভার। মেজদি বেড়াতে এল দিদির কাছে কলকাতায়। দেখে শুনে চোখ খুলে গেল। বাবুদের বাড়ি রাতদিনের কাজ ধরে নিল। আমায়ও নিয়ে এল। আমি তখন ফ্রক পরি। আমিও কাজ ধরলাম। পরের বোনটাকেও এনে লাগিয়ে দিলাম। তার পরেরটাকেও এনেছি। ঐ যে বুঁচি। সেদিন এসেছিল? এখন অবিশ্যি ওর নাম হেমা।'

'কে দিয়েছে তোমাদের নামগুলো?' নন্দিতা দিব্যেন্দুর শার্টে বোতাম লাগিয়ে সুতোটা দাঁতে কাটতে কাটতে জিগ্যেস করল। 'কে আবার দেবে?' আমরা নিজেরাই দিয়েছি। বড়দির নাম এখনো হেনাই আছে। মেজদি বীণা এখন নাম পাল্টে মীনা রেখেছে। আমি ছিলুম ছেনো তো আমিও আমার নাম পালটে শর্মিলা করে নিলুম। ছেনো নামটা কেমন শোনায় না? যেন দুধের ছেনো। আমার পরেরটার নাম ছিল আন্না। তার নাম দিয়েছি রাখী। বুঁচিরটা তো বললামই হেমা। এরপর অমলি কমলি। ওদেরও নাম পালটে দিচ্ছি। কলকাতায় আনলেই অমলিকে ডাকব রেখা বলে আর কমলিকে ডাকব টিনা। ছোটকুটাকে তো এখন থেকেই রতি বলে ডাকছি। মা ডাকে রত্তি।' শর্মিলা খিলখিল করে হাসল।

নন্দিতা হাঁ করে শুনছিল। আর ভাবছিল ভাগ্যিস বম্বেতে নন্দিতা বলে কোনো ফিল্মস্টার নেই। থাকলেই বা কি করা? নামে কি আসে যায়? সকলেরই সাধ হয় সুন্দর নামের। জিগ্যেস করল, 'তোমাদের ভাই নেই?' 'আছে বৌদি। ভোঁদা আর ন্যাদা। আন্নার পরে ভোঁদা আর বুঁচির পরে ন্যাদা। ভাল নাম উত্তম আর সৌমিত্র।'

'কি করে ওরা? লেখাপড়া ? কাঁচকলা। ভোঁদা মানে উত্তমটাকে এনে গাড়ি ধোবার কাজে লাগিয়েছিল বড়দি। জামাইদাদাই যোগাড় করেছিল। চারখানা অ্যামবেসাডার। একশো কুড়ি টাকা। দিদির কাছেই থাকছিল।'

'থাকছিল মানে? এখন কোথায় থাকে' 'বাড়ি চলে গেছে। ওকে দিয়ে কিস্যু হবে না।' নন্দিতা অবাক গলায় বলল, 'কেন? কুঁড়ে বুঝি?' 'সে তো আছেই। বাবুর ঘুমই ভাঙতে চায় না সাতটা আটটার আগে। চার খানা গাড়ি দুখানায় গিয়ে দাঁড়াল। অত বেলা অবদি কে আর গাড়ি বাড়িতে রাখে বলেন? ইস্কুলে নিয়ে যেতে হয় - বাবুদের আপিসে যেতে হয়। সাড়ে আটটার মধ্যেই তো সব গাড়ি হাওয়া। একশো কুড়ি টাকার ষাট টাকাও গেল। একশো কুড়ি টাকা বড়দিকে দিতে হচ্ছিল খোরাকি হিসেবে। সেও আজ দেব কাল দেব বলে কাটাচ্ছিল। বড়দি যাই কোনমতে বাঁচিয়ে রাখছিল ওকে। জামাইদাদা কেন করবে?

ন্যাতা আর বালতি নিয়ে এবার উঠল শর্মিলা। একটু সরিয়ে রেখে আবার ন্যাতা ভিজিয়ে নিংড়ে হাতের সঙ্গে মুখও চালাল। 'জামাইদাদা আবার একটু মদটদ -মানে আপনাদের ওই বেরাণ্ডি টেরাণ্ডি খায়। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে গা ম্যাজম্যাজ করে তো? তো একদিন ভোঁদাকে অট্টু গা-হাত-পা টিপে দিতে বলল রাত্তিরে।' ভোঁদা সোজা বলল—

ও সব পারবে না। জামাইদাদা উঠে লাথি কষাল। পরদিন সকালে আমাদের এই বোনগুলোকেই খেটে খেটে বাপ মা ভাই বোনদের খরচ ওঠাতে হবে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল শর্মিলা।

এবারে এ ঘর মোছা শেষ করে ন্যাতা আর বালতি নিয়ে অন্য ঘরে গেল। নন্দিতা বাঁচল। কথা বলতে আরম্ভ করলে আর সহজে থামে না শর্মিলা। সবই ভাল শর্মিলার - শুধু বড্ড লোক আসে ওর কাছে। সকাল থেকে সারাদিন কাজের সময় যখন তখন দরজার বেল বাজে। কখনো ও খোলে দরজা, কখনো নন্দিতা। মাঝে-সাঝে দিব্যেন্দুও।

নাইলনের দু-তিন রঙা টি-শার্ট কিংবা ছাফা শার্ট – কালো কিংবা ফিকে নীল বেলবটম পরা বচ্চনি ছাঁটের লম্বা চুল– কালো শুকনো ব্রণধরা চোয়াড়ে ধরনের চেহারার লোক। লোক না বলে যুবক বলা উচিত। এদেশের যুবসমাজের সিংহভাগ প্রতিনিধি।

'সোরমিলাকে একটু ডেকে দিন তো–' শুনে নন্দিতা কিংবা দিব্যেন্দু হয়ত বলে, 'এখন ব্যস্ত আছে, পরে এস।' ওরা কোমরে দুহাত তুলে মাথা চুল ঝাঁকিয়ে উদ্ধত চোখে চেয়ে বলে, 'ডেকে দিন। কাজ আছে।' বিরক্তি চেপে ডেকে দিতেই হয়। মিনিট পনের থেকে দু আড়াই ঘন্টা কখনো কখনো উধাও থাকে শর্মিলা কাজ -টাজ ফেলে।

নন্দিতা ওর ফেলে যাওয়া কাজকর্ম শেষ করতে করতে গজ গজ করে। দিব্যেন্দু বলে, 'ছাড়িয়ে দিলেই পার।'

রাঁধাবাড়া, ধোয়ামোছা, জলখাবার তানির টিফিন– স্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা ইস্ত্রি-টিস্ত্রি সবই করে শর্মিলা। ভালভাবে গুছিয়ে যত্ন নিয়ে করে। অতএব ওকে ছাড়িয়ে দেবার কথা উঠলেই নন্দিতার মনে আতঙ্ক জাগে। তাই দিব্যেন্দুর কথা শুনে উল্টো ঝামটা দেয়; 'ছাড়িয়ে দিলেই হল? তারপর?' 'তারপর আবাব কি? কদিন পরেই আবার একটা পাবে।' 'অত সোজা নয়। সেটা হয়ত আরো খারাপ হবে।' 'তবে সহ্য কর।' দিব্যেন্দু আরো বিরক্ত হয়।

'এরা কারা? এত আসে তোমার কাছে?' নন্দিতা একদিন জিগ্যেস করেছিল শর্মিলাকে। 'বন্ধু বৌদি।' 'বন্ধু? এই এত এত ছেলে তোমার বন্ধু?' শর্মিলার গলায় আওয়াজ শুকনো শোনায়। 'সবই কি আর বন্ধু বৌদি? বন্ধুর বন্ধু চেনার চেনা। 'তা তাদের সঙ্গে তোমার এত কিসের দরকার?' আরো শুকনো গলায় শর্মিলা জবাব দেয়, 'দরকার থাকতে পারে না? তাছাড়া দেখা করতেও তো আসতে পারে?'

মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। তবু রাখতেই হয় আখেরের কথা ভেবে। ভবিষ্যতে এত ঘন ঘন ছুটি যেন না চায়– এই প্রতিশ্রুতি নিয়েও লাভ নেই। কারণ জানাই আছে সে প্রতিশ্রুতি শর্মিলা রাখতে পারবে না। ওর 'বন্ধু' আর 'দরকার' শব্দ দুটোই সব চেয়ে মূল্যবান ওর কাছে।

নন্দিতা বিশ্বাস করেতে চায় না দিব্যেন্দু যখন বলে, 'দরকার আবার কি? দেখ গিয়ে তোমার শর্মিলা আজ বয়ফ্রেন্ডদের নিয়ে সিনেমা দেখবে, রেস্টুরেন্টে খাবে। তারপর

হয়ত বা কোথাও রাত কাটিয়ে কাল সকালে ফিরবে।'

ঠিক ফলল না কথাটা। তবে শর্মিলা বাড়ি ফিরল প্রায় মাঝ রাতে। সন্ধ্যাটা কিভাবে কাটাল জানার উপায় নেই। রাত্তিরে যে ঘরে ফিরেছে তাতেই বর্তে গেল নন্দিতা। খানিকটা বকাঝকা করে বিরক্ত মুখে আবার ঘুমোতে চলে গেল। যাবার আগে আজও দশটা টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে গিয়েছিল শর্মিলা। ওইতেই হয়ত সিনেমা এবং খাওয়া দাওয়া হয়েছে। মাইনের দেড়শো টাকার অর্ধেকের ওপরই অ্যাডভান্স যায়। এরও ওপরে প্রতি মাসেই খেপে খেপে দেড়শো টাকাই দিতে হয়। অ্যাডভান্সের আর জীবনে পুরোপরি মেটান হয় না।

'তোমারা না বাড়িতে সাহায্য কর? তাতেই তোমাদের বাবা-মার চলে? তো এত অ্যাডভান্স নিয়ে খরচ কর— মাস গেলে হাতে তো থাকেই না কিছু প্রায়। কতটুকু সাহায্য কর? নন্দিতার প্রশ্নের উত্তরে এক দিন শর্মিলা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'মেজদি আর আমি গোটা পঞ্চাশ করে দিই। আন্না আর বুঁচি তিরিশ আর পঁচিশ। এর চেয়ে বেশি দিলে বাবা সব শুঁড়ির দোকানে ওড়াবে। তাছাড়া আমাদেরও তো সখ-সাধ আছে বৌদি? ভাবছিলুম বলব দাদাবাবুকে বলে আরো পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিন বৌদি।' আবদারের গলা শর্মিলার। 'আপনার গঙ্গামণি যা কামাই করে— সেসব কাজ তো আমিই ওঠাই?'

তা ওঠায়। অথচ গঙ্গামণির মাইনে কাটতে গেলে সে বড় কান্নাকাটি করে। পাঁচটা বাচ্চার দোহাই দেয়। পালিয়ে যাওয়া স্বামীর মুণ্ডুপাত করে। নিজের হাড় জিরজিরে স্বাস্থ্যের জন্য খেদ করে। 'আমরা তো আর আপনার আহ্লাদী সোরমিলার মতন দুটো ভালমন্দ খেতে পাইনে বৌদিমণি! ছেলেপুলের খিদে মিটিয়ে দু মুঠো ভাত কি দুখানা রুটিও আসে না বৌদিমণি। কি করব বলুন? কামাই করা কি আমার সাধ?'

তা হয়ত নয়। কিন্তু নন্দিতারাও এমন কিছু রাজা মহারাজা নয় যে চাইলেই হাতের মুঠোয় বাড়তি টাকা ঝরে পড়বে। গঙ্গামণির কামাইয়ের টাকাও কাটা যাবে না— আবার তার জন্য শর্মিলাকেও উপরি দিতে হবে। কোত্থেকে আসবে তা? চাল ডাল তেল নুন থেকে শুরু করে সব জিনিসের দামই তো আকাশের দিকেই উঠছে শুধু।

শর্মিলাকে বাড়তি দেয় না এমনও নয়। টাকা না হোক—শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট- সস্তা হলেও শৌখিন মালা চুড়ি অনবরত দিচ্ছে। যে কোনো শখ সাধের বাইরে থেকে কিনে আনা জিনিস খাচ্ছে তারও ভাগ দিচ্ছে।

শর্মিলার আবদার শুনে নন্দিতার মুখ গোমড়া হল। এইতো সেদিন একখানা সুন্দর দামী শাড়ি বাগাল শর্মিলা। 'উঃ এই একটা শাড়ি আর কতদিন পরবেন বৌদি ? ওটা এবার আমায় দিয়ে দিন। এই হপ্তার ছুটিতে ওটা পরে আমি বাড়ি যাব।'

নন্দিতার মনটা প্রসন্ন ছিল সেদিন। চমৎকার কড়াইশুঁটির কচুরি বানিয়েছিল শর্মিলা। নন্দিতা শিখিয়েছে। তবে নিজে থেকেই—। 'আজ দাদাবাবুকে কড়াশুঁটির কচুরি খাওয়াব বৌদি। আপনি আসবেন না রান্নাঘরে।' বলে সত্যিই খুব ভাল কচুরি আর তার সঙ্গে

পাঞ্জাবী ধরনের চমৎকার আলু-ফুলকপির সবজি। নিজেই কোত্থেকে শিখেছে।

নন্দিতা হাসি চেপে বলেছিল, 'আবার এখুনি কি শাড়ি? এই তো সেদিন দিলাম। তাছাড়া এটা আমার ফেবারিট শাড়ি। বিয়ের তারিখে দাদাবাবুর দেওয়া। এক্ষুনি মোটেই দেব না।'

'আচ্ছা দাদাবাবু আবার আপনাকে দেবেনখন। আপনার কত শাড়ি।'

যত সৎকাজের লোকই হোক না কেন– সব গিন্নিরাই জানেন, গুঁড়ো সাবান আর চিনির ওপর লোভটা ওদের সাঙ্ঘাতিক। পয়সা-কড়ি গয়নাগাটি চোখের সামনে পড়ে থাকলেও ছোঁয় না– ও দুটি জিনিসের সম্বন্ধে ওদের 'আপনা হাত জগন্নাথ' ভাব থাকবেই।

শর্মিলা সাবানের বেলায় নন্দিতার চোখের সামনেই নেয়। 'নিচ্ছি বৌদি একটু বেশি। আজ বিছানার চাদরটা কাচব।' কিন্তু চিনির বেলাতেও খুবই সংযম। এবং গঙ্গামণির পেছনে –ওই এই দুটো জিনিস সম্বন্ধে তক্কে তক্কে থাকে।

অথচ ইদানীং দুটো জিনিস সম্বন্ধে নন্দিতা একটু বিভ্রান্ত বোধ করেছে। শ্যাম্পুর শিশি বড্ড তাড়াতাড়ি খালি হচ্ছে আর ক্যানাডায় থাকা দিদির পাঠান ব্রাগুলোর গোটা দুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে। শর্মিলাও খুঁজেছে বাড়িঘরের আনাচ-কানাচ সব। কিন্তু মেলেনি। চট করে সন্দেহ মনে আসে না। বাইরে উড়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। ধাঁধার উত্তর একটাই – ভাবতেও মন খারাপ লাগে। চোখের সামনে পড়ে থাকার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব বলা যায় না কিছু। বাকিগুলোকে শুধু আরো সাবধানে রাখা যায়– এইমাত্র।

তবে শ্যাম্পুর শিশি কেন এত তাড়াতাড়ি খালি হচ্ছে তার হদিস কিছুটা মিলেছে। মাসে আড়াই শো গ্রাম করে নারকোল তেল দেওয়া সত্ত্বেও শর্মিলার চুল– আজকাল যেদিনই দুপুরে –'একটু বেরোচ্ছি বৌদি– পাঁচটার মধ্যে ফিরব' বলে বেরোয় –দেখা যাচ্ছে বেশ চকচকে। এবং ফেরার পরে বেশ ফোলান-ফাঁপান। সাজগোজের ঘটাও উত্তরোত্তর বাড়ছে।

রাগ হয় বৈকি! শ্যাম্পুর বোতল বাথরুমে রাখা যাবে না? চাবি দিয়ে রাখতে হবে? দিব্যেন্দু শুনে বাঁকা হেসে বলে, 'নামেই তো বুঝতে পারছ ওর কাজ কোন পথে চলেছে। সাবধান থাকা ছাড়া আর কি করার আছে? ওদের ছাড়া যখন চলবেই না ? বিদেশে তো ওদের রাখলে ফার্নিশড রুম, টিভি, রেডিয়ো দিতে হয়। 'দিতে হয় তো দিলেই পার? নন্দিতা রাগ দেখায়। 'টিভি যেন রোজ হুমড়ি খেয়ে দেখছে না!'

সেটা কোন কথাই নয় আজকাল। বরং যেদিন বিশেষ বিশেষ নাচগান কিম্বা ফিল্মী প্রোগাম থাকে সেদিনগুলিতে ঐ সময় কোনও কাজের ফরমাস দিতেও বাধো বাধো ঠেকে। কোনও কারণে না এলে ডাকাডাকি করা হয়। বাইরের লোক থাকলেও গ্রাহ্য করে না। গান শুনতে পেলেই ঠিক এসে আড়াল করে দাঁড়িয়ে যাবে।

কদিন থেকেই একটি যুবক বারবার আসা যাওয়া করছে শর্মিলার কাছে। ফ্ল্যাটের দরজা ভেজিয়ে রেখে এরা ওপরে ওঠার সিঁড়িতেই বসে গুজ গুজ করছে। একদিন বড্ড সময় নিচ্ছে দেখে নন্দিতা দরজা খুলে ডাকতে গেল। তানিকে আনতে যাবার সময় হয়ে গেছে। অথচ এখনো ওর পাত্তা নেই। রান্না-বান্না তো আধ-খেঁচড়া অবস্থায় পড়ে আছে। বেলা দশটা থেকে সোয়া এগারোটা হয়ে গেছে। সাড়ে এগারটার মধ্যে তানির স্কুলে পৌঁছন চাই। রাঁধাবাড়াও বেশির ভাগ তার মধ্যেই হয়ে যাবার কথা।

দরজা খুলেই নন্দিতা দেখল সামনে ওপরে ওঠার সিঁড়িতে ওরা বসে আছে। শর্মিলা একবার ধমকাচ্ছে ছেলেটাকে। একবার মাথার চুল ধরে ঝাঁকাছে, একবার হাঁটুতে চাপড় মারছে। আড়াআড়ি করে বসে আছে এবং নিজেদের মধ্যে এমন মগ্ন যে দরজা খোলায় যে বাড়তি আলোটুকু পড়ল তার আভাসও বুঝতে পারেনি। নিঃশব্দে নন্দিতা দরজাটা বন্ধ করে আবার শব্দ করে খুলল এবং তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল, শর্মিলা? এই শর্মিলা?'

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল শর্মিলা। সামান্য বিরক্ত গলায় বলল 'যাচ্ছি। আপনি যান। আমি আসছি'। 'তানির স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে—তাড়াতাড়ি কর!' বলে নন্দিতা চলে এল ভেতরে।

চার পাঁচ মিনিট পর ভেতরে এসে ছাতা নিয়ে চটি পরে বেরল শর্মিলা । ছেলেটিও সঙ্গেই যাবে বুঝতে পারল নন্দিতা। তা যাক।

তানিকে নিয়ে ফিরল যখন এর চোখ মুখ থমথমে ফোলা। তানি এসে মাকে জড়িয়ে ধরেই প্রথম কথা বলল 'শর্মিলাদিদি কাঁদছে কেন মা? 'কাঁদছে ? কেন কাঁদবে? 'হ্যাঁ কাঁদছিল। আর ঐ লোকটার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। ওকি দুষ্টু লোক? ওকে এত বকছিল কেন শর্মিলাদিদি?'

নন্দিতা কথা ঘোরায়। 'যাগগে। এস তুমি হাত ধুয়ে. খেয়ে নেবে চল।' তানি তক্ষুনি তক্ষুনি এসব ভুলে গেলেও –দুপুরে মার গা ঘেঁষে শোবার সময় আবার ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, মা --বয়ফ্রেণ্ডরা কি খারাপ লোক হয়?' '! আঃ তানি! এসব কথা তুমি কোথায় শোখো?' 'শর্মিলাদিদিই তো বলেছে – ঐ লোকটা – এর নাম পোসান্ত, ও ওর বয়ফ্রেণ্ড। বয় মানে তো ছেলে আর ফ্রেণ্ড মানে তো বন্ধু। বন্ধুর সঙ্গে তো ভাব করে সবাই। অবিশ্যি আমার স্কুলের বয়গুলো সবাই দুষ্টু। খালি মারামারি করে।'

'ওকি রোজ যায় শর্মিলার সঙ্গে তোকে আনতে?' নন্দিতা তানিকে উল্টো পাশ ফিরেয়ে কাঁধে মৃদু চাপড় দিতে দিতে জিগ্যেস করল। হ্যাঁ তো! রোজ যায়। অন্যদিন কত গল্প করে– হাসে– পয়সা চায়। আজকে কেন করল না।' ' না করুক। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। তিনটের সময় উঠে হোমওয়ার্ক করতে হবে না?'

বিকেলে তানি নিচে খেলতে যাবার পর রান্নাঘরে লুচির ময়াদা মাখছিল শর্মিলা। দিব্যেন্দু অফিস থেকে ফিরে একটু পেটভরা খাবার না পেলে মেজাজ খারাপ হয়। নিদেনপক্ষে ম্যাগি নুড্‌লস। আজ লুচি আলুর দম হচ্ছে। মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে দুধ খাইয়ে নিচে

পাঠিয়ে রান্নাঘরে এল নন্দিতা। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক বা মেজাজ খারাপ থাকলে শর্মিলা সব কাজে ভুল করে। আজও হয়ত সেইরকমই একটা দিন— এই ভাবনা ছিল।

'আলুর দমটা হয়ে গেছে তো? জিগ্যেস করল? হ্যাঁ।' মাথাটা বড্ড বেশি ঝুঁকিয়ে জবাব দিল শর্মিলা। খামোখা আরো কতটা জল ঢালতে যাচ্ছিল ময়দায়। নন্দিতা বলে উঠল, আরে অতটা জল দিও না। সামান্য দিয়ে ভাল করে ডলে নাও।' হয়েছে কি তোমার বলতো? কাঁদছ মনে হচ্ছে।' আঁচল তুলে চোখ মুখ মুছল শর্মিলা। 'কিছু হয়নি।' নন্দিতা একটু বিরক্ত হল। ময়দা মাখার সময় অত চোখ-নাক মোছামুছি পছন্দ হল না। 'সরো আমি মাখছি। তোমাদের যে কখন কি হয় ভগবানেরও বোঝার অসাধ্য।'

সরে গেল শর্মিলা। রান্নাঘরের কলেই হাত ধুয়ে নিল। 'গরিব হলেও বৌদি – পেটের খিদে ছাড়া অন্য অনেক দুঃখ থাকতে পারে। আপনারা তা বুঝবেন না। বুঝতে চাইবেন না।'

'ওভাবে কথা বোলো না। বলতে পার কোন কথাটা না বুঝতে চেয়েছি আমি? নিজেরা যখন ঝামেলা বাধাও তখনি শুধু গরিব গরিব করো। অন্য সময় তো কিছু গরিবি দেখতে পাই না।'

পাবেন না বৌদি, পাবেন না। আজ যদি একটা অনুরোধ করি রাখবেন?' আঁচলে হাত মুছে শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে একটা পা পেছনে তুলে দেওয়ালে ঠেকাল শর্মিলা।

নন্দিতা এর দিকে পেছন ফিরে ময়দা ডলছে। 'বলেই দেখ! ক্ষমতায় থাকলে রাখতেও পারি, যদি অন্যায় আবদার না হয়!' 'ন্যায় অন্যায় জানি না বৌদি। দাদাবাবুকে বলে একটা লোকের চাকরি পাওয়া বন্ধ করতে হবে।'

নন্দিতার হাত থেমে গেল। 'বন্ধ করতে হবে? কেন? কে সে? কিসের চাকরি? 'পোসান্ত। পোসান্ত পাড়ুই। দাদাবাবুদের অফিসে পিওন নিচ্ছে। ও খবর পেয়ে দরখাস্ত করেছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় আসবে দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।'

'পোসান্ত? না প্রশান্ত?'

'ওই হল। আমরা পোসান্তই বলি।' তো চাকরি দিতে বারণ করছ কেন? 'তুমি তাকে চেন?' 'চিনি বৌদি – খুব ভাল করে চিনি। আমার বন্ধু।

'ওমা! তো বন্ধুর চাকরি হোক তুমি চাও না? কি সব উল্টোপাল্টা কথা বলছ? একজন বেকারের যদি চাকরি হয় তো ভাল কথাই!'

'আপনি বুঝবেন না বৌদি। ও বেকার নয়। মাদার ডাইরিতে কাজ করে। সকালে বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়ে আসে। একশোটা টাকা মাইনে, হয়ত আরও বাড়বে।'

'অ! তা তোমার দাদাবাবুদের অফিসে পিওন হলে নিশ্চয়ই এর চেয়ে অনেক বেশি মাইনে পাবে?'

নন্দিতা অবাক গলা বের করেল। 'হ্যাঁ খুশি হওয়ার কথা!' শর্মিলা রাগ রাগ গলায় বলে। 'ওখানে সব মিলিয়ে নাকি সাড়ে তিনশো চারশো পর্যন্ত পাবে। ও যা হাঁদা-বোদা ছেলে— অত টাকা হাতে পেলে নচ্ছার হয়ে পড়বে না?'

'ওম্মা! তাই বলে তুমি ওর উন্নতি চাও না?' নন্দিতা সত্যি ভীষণ অবাক হল। 'না বৌদি না এখনই না। বললাম না ও বড্ড বোকা। মা বাড়ি বাড়ি ঠিকে কাজ করে, বাবা কোন সায়েবের বাড়ির বাবুর্চি। ওর খোরাকি হিসেবে একশোটা টাকা দিলেই চলে যায়।'

এর সঙ্গে প্রশান্তর উন্নতি না হওয়ার কি যোগ – নন্দিতা বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল! ওর রোজগার বাড়লে তোমার এত অস্থির হবার কি আছে? তুমি ওর বন্ধু না?' মাথা নাড়ল শর্মিলা। হ্যাঁ।' 'তবে? বন্ধুর উন্নতি চাইছ না? শর্মিলা হঠাৎ কাতর গলায় বলল, বৌদি আপনি গঙ্গামণিকে ছাড়িয়ে দিন। আমি ওর অন্য কাজ যোগাড় করে দেব। আর ওর কাজও আমিই তুলে দেব। আমায় ওর মাইনেটা দেবেন।' 'তার মানে?' নন্দিতার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

শর্মিলার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল? 'কি হয়েছে কি। খুলে বলতো?' নন্দিতা একটু ভারিক্কি গলায় বলল। 'ও মানে প্রশান্ত তোমার কে হয়? ভাই-টাই কেউ?' 'না বৌদি – ভাই-টাই নয়। বন্ধু!'

'বন্ধু? তো বন্ধুর উন্নতিতে ব্যাগড়া দিচ্ছ কেন? ঝগড়া হয়েছে বুঝি? তাই রাগ করে ক্ষতি করতে চাইছ?' 'না বৌদি না।' শর্মিলার শরীর এবার আরও এলিয়ে পড়ে। 'নিজের ক্ষতি যাতে না হয় তাই চাইছি। বেশি টাকা হাতে পেলেই ওকে অন্য মেয়ে বন্ধুগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। আমার আর কতটুকু সময় থাকে বলনু? আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারব না!' বলে– হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেই শর্মিলা মুখে কাপড় গোঁজে।

'তুমি –তুমি ওকে ভালবাস?' নন্দিতা সঙ্কোচ কাটিয়ে বলেই ফেলল। ওপরে নিচে জোরে জোরে মাথা দোলাল শর্মিলা।

তবে তো ভালই হচ্ছে। ওর বেশি মাইনের চাকরি হলেই তোমরা বিয়ে করে ফেল। ঝামেলা মিটে যাবে।'

'না-না!' আবার মাথা নাড়ায় শর্মিলা। 'ঝামেলা না মিটে আরও বাড়বে। বিয়ে করলেই চাকরির জায়গায় ঝগড়া করে চাকরি ছাড়বে। আমার ঘাড়ে বসে খাবে – আর অন্য জায়গায় লপচপানি করবে। আমার পেটে আর কোলে দুটো বাচ্চা দিয়ে উধাও হবে।'

'সেকি? তবে তোমার ইচ্ছেটা কি? ভালবাস অথচ বিয়ে করতে চাও না? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'পারবেন কি করে বৌদি? আপনাদের তো আমাদের মতন কাঁটার ওপর দিয়ে হাঁটতে হয় না? মা-বাপ ভাইবোন বয়সের নেশা সবই গায়ে খেটে চালাতে হয়। তাই খাটনিতে ভয় পাই না আমরা। এই লক্কাগুলোকে কোনও মতে আটকে রাখতে চাই। নইলেই ওরা কেবল উড়বে। পোথম পোথম আমিও বুঝিনি। আমিও উড়িয়েছি। এখন বয়স হয়ে যাচ্ছে বৌদি– একটু একটু বুঝেছি!'

নন্দিতা চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে। কি বলবে ভেবে পায় না। বয়স হয়ে যাচ্ছে? তাই শ্যাম্পু লিপস্টিক আর ক্যানাডার অন্তর্বাস?

'ওরা বড্ড বোকা বৌদি। সিনেমার হিরো সেজে থাকতে চায়। বোকার মতন হয় নেতাদাদাদের হাতে নয়ত মস্তানদের হাতে গিয়ে পড়ে। পেটো ছুরি মারতে শেখে, সিনেমার টিকিট বেলাক করতে শেখে! ওদের বেরোজগারির ফায়দা নেতারা ওই ভাবেই ওঠায়। পোসান্তটা ঐরকম ছিল না। কিন্তু হাতে এ কবার কাঁচা টাকার সোয়াদ পেলেই হয়ে যাবে। সে আমি সইতে পারব না। মাস গেলে আমার রোজগারের সত্তর আশি টাকাই আমি ওর ওপরে খরচ করে ওর শখ বাবুয়ানি মেটাই। বেলাক ছেনতাই করতে দিই না। আপনি দাদাবাবুকে বারণ করে দিন বৌদি, আমাকে বাঁচান। পোসান্তকেও বাঁচান।'

শর্মিলার মধ্যে যে এত কিছু লুকিয়ে আছে – এত শুভচিন্তা–নন্দিতা কোনও দিন ধারণাই করতে পারেনি। ভেবেছে খাটিয়ে মেয়ে হলেও ওড়া টাইপের মেয়ে। এখন একটা হঠাৎ ভালবাসা মাখান মমতা এসে ওর মনটাকে ধরল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। 'তারপর? ক তদিন আগলে রাখবে ওকে? এ চাকরি ফসকালেও অন্য চাকরি তো পেয়ে যেতে পারে? তখন ? তাছাড়া – তাছাড়া–' অন্যদিকে তাকাল নন্দিতা – 'এমনিতেও তো তোমাদের বাচ্চা হয়ে যেতে পারে? তখন হয়ত আর ওর নাগাল পাবে না। কি করবে তখন?'

'যতদিন পারি বৌদি। ওর মনটা নরম আছে এখনও। বকলে কাঁদলে -টাঁদলে শোনে। আর আপনার যে পিলটা দিদির জন্য লিখিয়ে নিয়েছিলাম –সেটা আমিও খাই বৌদি' শর্মিলার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল আরও। নন্দিতা শুধু হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আর কোনও কথাই ওর মুখ দিয়ে বেরোল না!

অবেলায়

নিখিলচন্দ্র সরকার



ভুবন অনেকদিন পরে এলেন এদিকটায়। দুবার বাস পাল্টেছেন। বাসে বসেই তাঁর সময় গেল আড়াই-তিন ঘন্টা। খানিকটা এগিয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। গায়ে গায়ে সব বাড়ি। রকমারি ডিজাইন। রঙের অনেক বাহার। তাক লাগার মতন। আশে-পাশে কিছু দোকানপাট। রেস্টুরেন্ট, চায়ের স্টল। ছোটখাটো একটা বাজারও। এগোতে এগোতে কোথাও ফাঁকা জায়গা আর চোখে পড়ে না তাঁর। আগে এখানে অনেক গাছ ছিল। জারুল, কৃষ্ণচূড়া, বট, জাম। যতদুর মনে পড়ে, কিছু খেজুর, নারকেল গাছও

ছিল। লতা গুল্মের ঝোপ ছিল। তিনি সেখানে অনেক পাখি দেখেছেন। গাছে গাছে ওরা ঘুমোতো। কিচ কিচ করতো। ঘাসে ঘাসে ফড়িং উড়ত। দুরে দুরে এক একটা বাড়ি। হাওয়া তখন পাগলা ঘোড়া। হা হা করে ছুটত। ঝিলের জলে ঢেউ উঠত। ঝিলটা আজও আছে। কিন্তু ওর চারিদিক ঘিরে এখন বড় সব বাড়ি। ভিড়! চেঁচামেচি। বাড়িটা চিনতে প্রথমটায় তাঁর একটু কষ্টই হল। একটু দ্বিধাও ছিল মনে। তাঁকে চিনবে তো ওরা। ওরা মানে তো সুষমা। এতদিন পবে এই অবেলায় তাঁকে দেখে কিছু মনে কববে না তো ও? আজ কদিন ধরেই ওর কথা খুব মনে পড়ছিল তাঁর। পেছনেব দিনগুলো সুযোগ পেলেই তাড়া করেছে। তিনি অস্বস্তি বোধ কবেছেন। কষ্টও। শেষবাবেব মতন সবার সঙ্গেই একবার দেখা করে যাবেন। তাছাড়া সুষমার কাছে তিনি সেই কথাটাও বলে যেতে চান। না হলে স্বস্তি পাবেন না তিনি। পরে আর সময় পাবেন না। বেশ কয়েক বছর আগে এক বিয়ে বাড়িতে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভুবনেব। ভুবন চিনতে পেরেছিলেন সুষমাকে। সুষমাও ওঁকে। মৃদু হেসে ও এগিয়ে এসেছিল তার কাছে। হেসে হেসে ও বলেছিল, 'ভীষণ মোটা হয়ে গেছ, চেনাই যাচ্ছিল না!'

'যাঃ, এই তো বেশ চিনতে পেরেছ।'

'আগে অনেক ছিপছিপে ছিলে তুমি।'

'বয়েসও তো হচ্ছে।'

'তা হচ্ছে।' একটু চুপ করে থেকে ফের সুষমা বলেছিল, 'তোমার অনেক খবরই রাখি আমি।'

'যেমন?'

'এই ধর, তোমার এখন অনেক নামডাক হয়েছে।'

'ঠাট্টা করছ?'

'বারে, ঠাট্টা হবে কেন, তোমার কবিতা তো এখানে ওখানে প্রায়ই পড়ি। তুমি তো এখন রীতিমত বিখ্যাত।'

'যাক গে, তোমার কর্তাটিকে তো দেখেছি না!'

'আছে কোথাও।'

'আলাপ করিয়ে দাও।'

'সুষমাও পাল্টা প্রশ্ন করল, বউদিরা আসেননি?'

'না'।

'তোমার ছেলেমেয়ে?'

'এক ছেলে। নাইন-এ পড়ে। তোমার?'

'দুই মেয়ে। কলেজে পড়ছে ওরা।

একদিন তো আমাদের ওখানে এলে পার।

যাব।'

'বউ ছেলেকেও নিয়ে যেও।'

'পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন তাকিয়ে তাকিয়ে। হাসি হাসি মুখ। সুষমা ডাকল, 'এই ,শোন'।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন। সুষমা বলল, 'তোমাকে ভুবনদার কথা বলেছিলাম না, এই সেই কবি।'

'আচ্ছা!' লোকটি কপালে হাত ঠেকালেন। হাসি মুখ। বললেন, 'নমস্কার ওর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল। ভাল লাগল। ও তো আপনার কবিতার ভীষণ ভক্ত। এই সেদিনও বইমেলা থেকে আপনার অনেকগুলো বই কিনে আনল। আমি কিন্তু কবিতা-টবিতা বুঝি না!'

'সবাইকে সব কিছু বুঝতে হবে এমনকি কথা। আমিও তো অনেক কিছু বুঝি না।'

'তাহলে আমার দৈন্যের কথাটা আগে ভাগেই বলে রাখলাম।'

'অত বিনয়ের কিছু নেই, পড়েন না বেশ করেন।'

'তাহলেও আমার দৈন্যর কথাটা আগে ভাগেই বলে রাখলাম।'

'অত বিনয়ের কিছু নেই, পড়েন না বেশ করেন।'

'তা একদিন সপরিবারে চলে আসুন না আমাদের ওখানে। খুব হইহই করা যাবে। আপনি কবিতা পড়বেন, ওর সঙ্গে আমিও না হয় শ্রোতা হবো, কি বলো সুষমা? ভদ্রলোক তাকালেন বউ-এর দিকে।

'তাহলে তো দারুণই হয়।' সুষমা হাসল। ওর চোখেমুখে খুশির রেণু। ভুবনের দিকে চেয়ে পরে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চলে এস একদিন ভুবনদা।'

'যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। সুষমাও চলে যাচ্ছিল। কি ভেবে হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার যা ভুলো মন. আবার ভুলে যেও না। কতদিন পরে এই দেখা।' হাসিটা একটু একটু করে তখন ওর মুখ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছিল। কেমন থমথমে। বিষণ্ণ।

ভুবন কি ভেবে এক পা এগিয়ে গেল। একটু ইতস্তত করল। বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলব সুমি?'

সুষমা চমকে উঠেছে। বুকটা ধক করে উঠল। শব্দটার মধ্যে এখনও এত নেশা? চোখের দৃষ্টি নরম। ওর মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকতে সুষমা বলল, 'বলো কি বলবে'।

'এখনও তুমি কবিতা এত ভালবাস?'

'সুষমা চোখ নামিয়ে নিল। অস্ফুটে বলল দোষ তো তোমারই।' ও চলে গেল।

যেতে যেতে আরও রাত হল। তখনও সানাই বাজছিল। ওরা গাড়ি করে এসেছিল। চলেও গেল এক সময়। যাওয়ার আগে এক মুঠো নরম ব্যথা বাতাস তাঁর বুকের মধ্যে

আবীরের মতন ছড়িয়ে দিয়ে গেল সুষমা। কতদিন পরে দেখা। তবু সুষমা তাঁকে ভোলেনি। বাসায় ফিরে স্ত্রীর পাশে শুয়েও তিনি সেদিন ছটফট করেছেন। ভাল করে ঘুমোতে পারেননি। কত টুকরো টুকরো ঘটনা এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। এখনও সুষমা তাঁর কবিতা ভালবাসে? সুষমা চাইত, ও যেন একদিন খুব বড় হয়, খুব নাম হয় ওর। ও বলত, 'তুমি দেখে নিও ভুবনদা, একদিন খুব বড় কবি হবে তুমি। সেদিন হয়তো আর আমাকে চিনবেই না।' ভুবন আবেগ বোধ করতেন। ওকে আরও কাছে টানতেন। বলতেন, 'কেন চিনব না সুমি, তুমি তো আমারই। সেই সুনাম না হয় আমরা দুজনেই ভাগাভাগি করে নেব।' ভুবন ভুল করেছিলেন। সেই সুষমা একদিন অন্যের ঘরে চলে গেল।

এরপর কয়েকবারই তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল ওর ওখানে যাওয়ার। শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়নি।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়। ওর কাছে কথাটা তাঁর বলা দরকার। কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে দুপুরের পরেই বেরিয়ে পড়লেন ভুবন। বাস থেকে নামার পরই একটা পুরেনো গন্ধ পেলেন।

মনে হলো, এখন তাঁর বয়েস কত? মনে মনে হিসেব করলেন। আসছে ডিসেম্বরের পনেরোয় তাঁর চুয়ান্ন পূর্ণ হবে। আর সুষমার? ওরও পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই।

শরতের আকাশ। গাঢ় নীল। দুধ সাদা মেঘ। থমেক দাঁড়িয়ে গেছে। দু-একটা শালিখ, কাক দেখলেন।

বাড়িটা খুঁজে পেলেন ভুবন। কলিং বেল টিপলেন। সুষমাই দরজা খুলে দিল। ওঁকে দেখে থ।

ভুবন হাসলেন। ম্লান হাসি। বললেন, 'কি, চিনতে কষ্ট হচ্ছে?'

'ওমা, একি চেহারা হয়েছে তোমার?'

'তা হোক, চিনতে পারলেই হল।'

'আমি তো চমকেই উঠেছিলাম।'

'যাক, ভয় পাওনি তো?'

'ভয়ের কথা হচ্ছে না, তোমাকে দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'কিছুই করার নেই আমাদের। শরীরের জোয়ার-ভাটা তো থাকবেই।'

'এস, ভেতরে এস।'

সুষমা ওর ঘরেই নিয়ে গিয়ে বসাল ওঁকে। ও বলল, 'এতদিনে সময় হল তোমার?'

'আসি আসি করেও আর আসা হয়নি।'

সুষমা চোখে চোখে তাকাল। ভুবনও। কি ভেবে ও গম্ভীর হল একটু। ভুবন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জীবনে অনেক কথারই তো খেলাপ করলেন তিনি। আজও তাঁর বুকে সেগুলো

কাঁটার মতন বিঁধে আছে।

তিনি অপলকে ওর দিকে তাকালেন । তাকিয়েই থাকলেন খানিকক্ষণ। কি ভেবে শেষে বললেন, 'তোমার মেয়েদের দেখছি না?'

' এক মেয়েকে তো গেল বছর বিয়ে দিলাম। তোমাকে যে একটা খবর দেব, ঠিকানাটাই জানি না। ছোটটা তো সায়ান্স কলেজে রিসার্চ করছে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়।'

'তোমার কর্তা কখন ফেরে?'

'ঠিক নেই, ফিরতে ফিরতে এগারোটা বারটা হয়ে যায়। কোন কোনদিন আবার ফেরেই না।

'তাহলে আর দেখা হল না'।

'আর একদিন এস। এবার বউকে নিয়ে এস। তোমার বউকে তো দেখলামই না।'

ভুবন চুপ করে থাকলেন। মুখের ওপর ম্লান ছায়া। মনে মনে বললেন ঃ আর আমার আসা হবে না সুমি, এই শেষ। শেষবারের মতন তোমাকে একবার দেখে গেলাম। তাছাড়া, তোমাকে আমার একটা কথা বলারও আছে। ভাবতে গিয়ে বুকটা খচখচ করে ভুবনের। ঠোঁট কাঁপে। চোখের কোলে দুঃখের মেঘ জমে থাকে। না, সেসব কথা ওকে বলা যাবে না। তিনি তা বলতে আসেননি। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি অন্য প্রসঙ্গে গেলেন। বললেন, 'এখানকার অনেক কিছুই দেখছি বদলে গেছে। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল আমার, তোমাদের বাড়িটাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

সুষমা ভুরু কোঁচকাল, 'পাবে কি করে, কত বছর পরে আবার এলে বল তো!'

'হ্যাঁ, তা প্রায় ত্রিশ-ত্রিশ তো হবেই।'

'তবে?'

'দেখতে দেখেতে দিনগুলো সব হারিয়ে গেল।' চুপ করে রইলেন ভুবন। একটু অন্যমনস্ক. মুখের ওপর শেষবেলার বিষণ্ণতা। স্মৃতির কাটাকুটি। কি একটা ভাবতে ভাবতে এক সময় বললেন, 'তোমার মনে আছে সুমি, আমরা হাঁটতে হাঁটতে কত দূরে চলে যেতাম বিলটা আছে এখনও?'

'না না, ওসব কিছুই নেই এখন।'

'কত পাখি দেখতাম। কত বক উড়ে যেত মাথার ওপর দিয়ে। সন্ধ্যে নামত। আমবা ফিরে আসতাম। তোমার ভয় করত।

'মনে আছে, সব মনে আছে আমার।'

'ওখানে একটা বিশাল বটগাছ ছিল। অনেক ঝুরি নেমেছে। অনেকেই ওখানে মানত করতে আসত। মাটির ঢেলা বাঁধত। আমারাও মাটির ঢেলা বেঁধেছিলাম। এখানে এলেই প্রণাম করতাম। তারপর...'।

সুষমা চোখ নামিয়ে নিল। তার মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে এই বয়সেও।

ভুবন আচ্ছন্ন। পুরনো দিনের হাওয়া এসে লেগেছে তাঁর গায়ে। তুমি বলতে এখানে তোমার ভাল লাগে না, আমার কিন্তু দারুণ লাগত।'

সুষুমা হাসল, 'সে তুমি কবি বলে।'

'তা নয় সুমু, এখানে তোমাকে খুব কাছে পেতাম।'

'তাও তো দূরে ঠেলে দিলে।'

'দোষ তোমার নয় সুমু, আমার।'

'থাক ভুবনদা, আজ আর এসব কথা তুলে কি লাভ! এজন্মে তো আর সেই দোষ শোধরানো যাবে না।'

'তা যাবে না, তবে আমি অন্তত খানিকটা হালকা হব।'

'তোমার ওপর আমার খুব রাগ হয়েছিল সেদিন।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'আমি তোমার কাছে ছুটে গেলাম মত জানতে, আর তুমি আমাকে ওভাবে তাড়িয়ে দিলে।'

'এটা তুমি বাড়িয়ে বলছ। আমি তোমাকে ওই বিয়েতে শুধু রাজী হয়ে যেতে বলেছিলাম।'

'এ তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর, ভাবতে পারিনি।

'এতে তো লাভই হয়েছে তোমার। বাড়িটা তো জব্বর করেছ?'

'হ্যাঁ, চেনাজানা সবাই বাড়িটার খুব তারিফ করে।' কি ভেবে সুষমা হাসল।

ভুবন ওকে দেখলেন ভাল করে। চেহারায় পড়ন্ত বেলা। সর্বত্র স্বচ্ছলতার ছাপ। স্বামী ভাল চাকরি করে। এক মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই সুপাত্র। আর এক মেয়েও কৃতী। সুখী পরিবার। তবু কেন জানি ভুবনের মনে হল, ওর মুখের তলায় চাপা এক দীর্ঘশ্বাস। খাণিক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন 'তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।'

কি? সুষমা তাকাল চোখে চোখে।

ভুবন ব্যাগ থেকে একটা বই বের করলেন। ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, এটাই আমার শেষ কবিতার বই।'

'কই, দেখি দেখি।' সুষমা খুশি হল। তাড়াতাড়ি করে বইটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টোতে লাগল। বইটা তাকেই উৎসর্গ করা। ভীষণ চমকে উঠল ও। এরকম একটা মুহূর্তের জন্যে তো তৈরি ছিল না সুষমা। বুকের ভেতরে আবেগ। অনেক দিন পরে আবার নতুন করে ওঁকে চিনল। এই মুহূর্তে আবার পুরনো দিনগুলোতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে তার। হাসতে হাসতে বলল, 'জান ভুবনদা, সেদিনের ওই ঘটনার পর তোমার ওপর

আমার ভীষণ ঘেন্না হয়েছিল। কিন্তু তোমার কবিতা পড়তাম খুঁজে খুঁজে। খুব ভাল লাগত। একদিন সব রাগ, ঘেন্না আবার থিতিয়ে গেল।'

আজ সেই কথটাই তো স্বীকার করতে এলাম সুমি।' ভুবন ওর মুখের দিকে চাইলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন,! 'না, তোমার ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। বরং আমার মধ্যেই ভেজাল ছিল। আমি কিছুই ভুলিনি। বি. এ. পরীক্ষার মাসখানেক আগে আমার পক্স হয়েছিল। তুমি আমার কাছাকাছি বসে টেম্পেস্ট, ম্যাকবেথ পড়ে পড়ে শুনিয়েছ। পূজোর সময় তুমি আমার জন্যে একটা দিন বরাদ্দ রাখতে। আমরা একসঙ্গে ঘুরতাম। সিনেমা দেখতাম, ব্যাণ্ডেল চার্চ যেতাম। দক্ষিণেশ্বর গিয়ে মন্দিরে পূজো দিতাম। হ্যাঁ, মনে আছে, সব মনে আছে আমার। তুমি আমাকে আলাদা করে প্রসাদী ফুল দিতে।'

'দোহাই ভুবনদা, ওসব আর মনে করিও না।'

'এরপরও তোমাকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আসলে আজ স্বীকার করছি, তখন আরও একটি মেয়ের সঙ্গে আমার মনের খেলা চলছে। দেখতে খুবই ভাল। মেয়েটিই আমাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল। সেই মেয়েও চলে গেল একদিন। তোমার কথা খুব মনে পড়ত। তোমাকে আঘাত দিয়েছি। দুঃখ তো আমার নিয়তি। তারপর সবই হল। সংসার করলাম। কিন্তু তোমাকে তো ভুলতে পারি না।'

সুষমার কণ্ঠ মৃদু, 'তোমার কবিতা পড়ে আমারও অনেক কথা মনে আসত। মনে মনে তোমার চেহারাটা আঁচ করতাম। কষ্ট পেতাম।'

ওরা চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। ভুবন এখন নিজেকে হালকা বোধ করছিলেন। শব্দগুলো তখন ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু আচ্ছন্ন। ওরা বয়েস ভুলে গেল। জায়গা ভুলল। শেষ বিকেলের মরমর আলোটাও কখন জানালা দিয়ে চলে গেল টের পায়নি ওরা। ঘরময় নরম ছায়া।

সুষমার হঠাৎ খেয়াল হল। তাড়াতাড়ি করে ঘরের আলো জ্বালাল, এই দেখো, তোমাকে খেতে দিতেই ভুলে গেছি।'

ভুবনেরও অন্যমনস্কতা ভাঙল। তাকাল 'অত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, এক গ্লাস দুধ আর দুটো বিস্কুট, এই আমার খাওয়া।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ।'

'এরকম দশা কবে থেকে?'

'তা বছর তিনেক।' ভুবন হাসলেন একটু।

'হবে না, তখনই তোমাকে কত বারণ করতাম, অত চা সিগারেট খেও না।'

'যা হবার তা তো হয়েই গেছে।' ভুবন ফের তাকালেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চোখের তলায় আরও এক বিষণ্ণতার ছায়া ছড়ায়।

'তুমি বড় কোন ডাক্তার দেখাও ভুবনদা। চেহারাটা তোমার ভীষণ ভেঙে গেছে। তাকালে বুকের ভেতরটা কি রকম করে।' একটু দাঁড়িয়ে থেকে সুষমা ভেতরে চলে গেল।

ভুবন হাসলেন শুধু। কষ্টের হাসি। কি একটা ভাবলেন। না, এ খবরটা ওকে দেওয়া যাবে না। মনে মনে বললেন ঃ সুমি, আমিও এখন আমার চেহারা দেখে আঁতকে উঠি। রাতে ঘুমোতে পারি না। ছটফট করি। দূরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি। ভাল লাগে না। তুমি জান না, আমার এখন এক কঠিন রোগ। এ রোগ সারে না। ডাক্তারের হাতের বাইরে। অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি। চিকিৎসা চলেছে। ওরা যা বলার বলে দিয়েছে। আমার চলে যাওয়ার দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আর বড় জোর ছমাস কি এক বছর। এ জীবনের মতনই চলে যাচ্ছি। আর দেখা হবে না। কেন যে এই জন্ম, আর কেনই বা এত অপমান!

ভুবনের চোখ ছলছল।

সুষমা ফিরে এল। এক গ্লাস দুধ, সন্দেশ আর বিস্কুট প্লেটে রাখল ওঁর সামনে।

একসময় উঠে পড়লেন ভুবন। সুষমা তাঁকে ফের আসতে বললেন। ভুবন কোন জবাব দিলেন না। শুধু তাকালেন একবার। বুকের ভেতর তাঁর আজ কেন এত কান্না জমেছে? সুষমা একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ভুবন আকাশের দিকে তাকালেন। নক্ষত্র দেখলেন। অন্ধকার দেখলেন। মাথার ওপর দিয়ে একটা ক্লান্ত পাখি তখন ডানায় অন্ধকার মেখে দূরে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। ভুবন ছটফট করে উঠলেন।

তিনকন্যের কাহিনী



সেদিনের দর্পণ আর আজকের দর্পণে আশমান-জমিন ফারাক, ভোরের কুয়াশা আর হিমেল রাতের তফাত, তিল -তেলের পিদিমে জ্বালা শান্ত শিখা আর পাহাড়ী কেউটের হিংস্র ছোবলের তফাত। সেদিন চলে গেছে পনেরোটা বছর আগে-- যেদিন সে বুক দিয়ে ভালবেসেছিল জমিদারের সেই সুন্দরী কিশোরী কন্যাকে, যার দুই চেখের পিঙ্গল তারকায় ছিল নাগিনের আকর্ষণ, যার হিলহিলে বরতনুর রেখায় রেখায় ছিল আগামী যৌবনের

ইশারা, যার কচি ঘাসের পাতার মতো হাল্কা ঠোঁটের কোণে কোণে ভাসত দুর্মর হাসির সঙ্কেত।

সেদিন আর এদিনে অনেক তফাত... অনেক ,...অনেক। সেদিনের সেই শিক্ষক পিতার এককপাল ছেলেমেয়ে ভর্তি দারিদ্র্য-মলিন ভাঙা ঘরের দর্পণ আর এদিনের ঝকঝকে চেহারার কালো আকাশের বুকে লকলকে বিদ্যুৎ শিখার মতো দর্পণের সঙ্গে তাই আকাশ পাতাল, তফাত– মাঝখানে রয়েছে পনেরোটা বছরের ব্যবধান।

সেদিন সেই জামিদারের কিশোরী কন্যার উগ্র রূপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল দর্পণ। পিঙ্গল নয়না চিত্তল হরিণীর মতো ক্ষিপ্রচরণা সেই কিশোরী যেদিন কচি ঘাসের পাতার মতো পাতলা রাঙা ঠোঁটে ভয়ানক দুর্মর হাসি ফুটিয়ে নিষ্ঠুর আনন্দে বিদায় দিয়েছিল দর্পণকে– সেদিন আর এদিনে অনেক তফাত .....অনেক... অনেক। যার তপ্ত নিঃশ্বাসে একদিন তিল তেলের পিদিমের শান্ত শিখা শুধুমাত্র চঞ্চল হয়েছিল, যার উষ্ণ কোমল বাহুপাশে লাজুক ভীরু দর্পণে শীতার্ত কিশলয়ের মতো শিউরে শিউরে উঠেছিল। যার ঝলকিত নয়নের আর বাঁকা আধারের ইলেকট্রিক আমন্ত্রণকে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়ার মতো পরম প্রসাদ মনে করে বারে বারে স্কুল পালিয়ে ছুটে গিয়েছিল নিস্তব্ধ দুপুরে দোতলার সেই বাইজীর ছবি--এসরাজ-নূপুর বাঁয়া তবলা আর মদের খালি গেলাস-বোতল গড়াগড়ি যাওয়া রোমাঞ্চিত নিশীথের উদ্দামতা - শ্রান্ত শূন্য নাচঘরে– সে আর এখন নেই দর্পণের এখনকার উদ্দাম ঝকঝকে দুরন্ত বেগবান জীবনপ্রবাহের কোনো উপলখণ্ডেই: সেদিনের সেই কিশোরী প্রয়োজন মিটিয়ে যাকে সরিয়ে দিয়েছিল অনেক মানে-জমে-ওঠা ঠোঁটের হাসি দিয়ে, সেই দর্পণ এখন পাল্টে গেছে একেবারেই ... একেবারেই।

আজকের দর্পণকে চেনে এ শহরের সব্বাই – শুধু চেনে না – জানে নিতান্ত আপনজন বলে। বিশেষ করে জানে সেই সুন্দরী মেয়েরা অথবা সুন্দরী হওয়ার সাধ নিয়ে যারা রঙ আর রূপের ওড়নায় নিজেদের মুড়ে পুরুষের চোখে ঝলক সৃষ্টি করার বাসনা নিয়ে থাকে-তারা। জানে কুমারী কিশোরী থেকে ঘরের বউরা ,অমুকের ননদিনী থেকে তমুকের বউদিরা। দর্পণ আজকে একটা শরীরী আকর্ষণ, একটা প্রচণ্ড চুম্বক, একটা কুলিশ-কঠোর বজ্রশিখা। সেদিনের দর্পণ আর নেই। সেদিনের সেই জমিদার-তনয়ার বাঁকা হাসির আগুনে পড়ে মরা ছাইয়ের মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছে আজকের দর্পণ– তার সঙ্গে কোনো মিল নেই সেদিনের সেই দর্পণের।

এ শহরের নাম ব্যাঙ্গালোর শহর। দক্ষিণ দেশের বাগিচা শহর। এ-শহরের সুন্দর ঝকঝকে সাজানো পথঘাটে রূপের বিদ্যুৎ খেলিয়ে যেমন বরনারীরা ছন্দিত হিল্লোলের মতো হেঁটে যায় লঘুচরণে মায়া-রহস্যের আবর্ত রচনা করে, ঠিক তেমনি রহস্যময় থেকে গিয়েছে সাজানো -গোছানো পথঘাটের আনাচে-কানাচে, সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারে হোটেলের ঘরে ঘরে নক-করা বারবিলাসিনীরা। একটু ভাল খাওয়া, একটু ভাল সাজগোজ করা, একটু

বিত্তের আস্বাদ পাওয়ার লোভেই শুধু যারা এ পথে নামেনি, যারা বাবা-মা-ভাই-বোনের অনাহার শুষ্ক রোগজীর্ণ মুখে এতটুকু হাসি ফুটিয়ে তুলতে অগুরু ধূপের মতো নিঃশেষে তিল তিল করে পুড়িয়ে চলেছে নিজেদের দেহ-বিবেক-আত্মা-মনকে – তারাই আজ রাতের অন্ধকারে শরীরের খাঁজে খাঁজে ভীষণ ইশারার চমক ফুটিয়ে, চোখের তারায় তারায় কালো হীরের ঝলক দেখিয়ে রাঙা ঠোঁটের কোণে কোণে রঙিন কাচের সিরাজির পেয়ালার মদির আহ্বান জানায়। তাদেরও এদিন আর সেদিনে অনেক তফাত... অনেক... অনেক।

এমনি তিনটে কন্যে এইমাত্র নিজেদের কাহিনী শুনিয়েছে পরস্পরেকে। তারা বসে আছে মুখোমুখি ভারী সুন্দর একটা মর্মরমূর্তি -তৈলচিত্র-মদের বোতল আর রকমারি গেলাস দিয়ে সাজানো ঘরের চুনির মতো রাঙা আর ঝরা পালকের কোমল আস্তরণের মতো কাশ্মীরী কার্পেটের ওপর। প্রতিটি কাহিনীই বুকের কলজে নিংড়ে রক্ত ঝরানো গল্প, প্রতিটি কাহিনীই ঝড়ের বুকে কাতর বাতাসের হাহাকারের গল্প, প্রতিটি কাহিনীই না-জেনে না-বুঝে ফুলভ্রমে কাঁটা মাড়িয়ে চরণ রক্তাক্ত করে ফেলার গল্প। কারও জীবনে প্রেমিক পুরুষ এসেছিল আপন কাকারূপে, কারও জীবনে দাদার বন্ধুরূপে, কারও জীবনে নিজের মামারূপে। সব খুইয়ে আজ এরা এসেছে এই পথে। এসেছে শুধু এ পথের অনায়াসলভ্য বিত্তের আকর্ষণে নয়, বড়লোকের বাড়ির ঝাড় লণ্ঠন-শোভিত নাচঘরের জলুসের মতো চোখ ধাঁধানো চাকচিক্য দেখে নয়– এমনকি দেহের তাড়নাতেও নয়– এসেছে শুধু প্রাণের প্রদীপটাকে কোনমতে দেহের মন্দিরে টিকিয়ে রাখার তাগিদে।

তারপর একদিন শুনেছে রহস্যময় সেই মানুষটার কথা। যে মানুষটা ধনীর দুলালীদের নিঃশেষে শোষণ করে নেয় প্রেমের ফাঁদ পাতার পর ব্ল্যাকমেলিংয়ের জাঁতা ঘুরিয়ে। কেউ পার পায় না ... কেউ পার পায় না। তারপর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এনে বিলিয়ে দেয়. দেহপসারিণীদের ঘরে... কিন্তু বসে না ,... কোনদিনই না।

আজ সে আসছে এই তিনজনের সামনে আঁচল ভরে টাকা দিয়ে যেতে। রহস্যময় সেই মানুষটির চকিত দর্শন পাওয়ার আকুল আকাঙ্খায় জাগ্রত বিগ্রহের সামনে ভক্ত পুণ্যার্থীর মতোই এরা অধীর প্রতীক্ষায় বসে থাকার সময়ে কখন জানি মন দেওয়া -নেওয়া করে ফেলেছে তিনজনের কাহিনী বিনিময় করে।

এখন তারা নিশ্চুপ। গভীর বেদনায় নিথর।

ঘরের পেণ্ডুলাম ঘড়ি এগিয়ে চলেছে টিকটিক করে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। সে এসেছে। সে এসেছে। লঘু চরণধ্বনি স্তব্ধ হল খোলা দরজার সামনে।

উৎসক উৎকণ্ঠিত উদ্‌গ্রীব তিন কন্যে ভোরের সূর্যের টানে টানে তিন -তিনটে সূর্যমুখীর মতো মুখ তুলে তাকালো দরজার পানে। তিনজনেরই চোখ বড় বড়, অবাক বিস্ময়ে থর থর।

চৌকাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে রহস্যময় সেই পুরুষ— যার পনেরো বছর আগেকার জীবন আর পনেরা বছর পরের জীবনে আশমান-জমিন ফারাক। কিন্তু এ কী! হিমশীতল নির্দয়-কঠিন গ্র্যানাইট শক্ত দু চোখের তারায় ও কিসের বিস্ফোরণ? কিসের বিস্ময়? কিসের ঐ সাগরের তলা পর্যন্ত ঘুলিয়ে ওঠা ভাবাবেগ?

অকস্মাৎ অস্ফুট চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে তিন কন্যের একজন – পিঙ্গলনয়না সেই কন্যেটি যার কাহিনী এই মাত্র শুনেছে অন্য দুই কন্যে। ছিল জমিদারের কিশোরী দুলালী– প্রেম প্রেম খেলায় ছিনিমিনি খেলেছে বহু কিশোর-তরুণ যুবকের হৃৎপিণ্ড নিয়ে– কলেজে থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া রক্তধারায় নেয়ে উঠে অট্ট অট্ট হেসেছে দর্পণের সামনে আপন হিল্লোলিত বরতনু দেখতে দেখতে। পনেরো বছর আগে তাদের মধ্যে ছিল একজন নির্বোধ শিক্ষক-পুত্র।

পনেরো বছর পরে পাল্টে যাওয়া সেই নির্বোধ শিক্ষক-পুত্রটিও চিনেছে তাকে – ভালো করেই চিনেছে।

রহস্যময় এই সেই পুরুষ। নাম যার–দর্পণ!

ডালিমফুল



এমন আকাশ ভেঙ্গে নামলে কিছু আর করার থাকে না। কেবল বার বার জানলা দিয়ে বাইরে তাকান, কান পেতে শোনা যায় বৃষ্টির শব্দ। বিরামহীন ধ্বনিতরঙ্গ আর বুঝি আগের মতন জলদে বাজছে না—এই ধরণের মিথ্যে আশাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় দু-পাঁচ সেকেণ্ড। প্রথম দিকে মানে সন্ধ্যের মুখে, কখন বৃষ্টি আর কতক্ষণ চলতে পারে, এবারে নিশ্চয়ই থেমে যাবে—এই জাতের আশা ছিল, তখন ওই আশা ছিল বলেই অস্থিরতাও বেশি ছিল। তখন মিত্রা আর চন্দন অস্থির পায়ে অনেকবার জানলার ধারে গিয়েছে। অসহিষ্ণু গলায় অনেকবার বলেছে, 'কী করা যায় বল তো? এ বৃষ্টি কি সত্যিই থামবে না!'

সন্ধ্যে পেরিয়ে গিয়ে রাত নেমেছে প্রায় দু ঘন্টা হল। বৃষ্টি থামবার আশা আর কেউ করছে না এবং আশা করছে না বলেই ছটফটানিও থিতিয়ে গেছে। যাদের আজ এখানে আসবার কথা তাদের বেশিরভাগই আসেনি, এরপর আর আসবার সম্ভাবনাও নেই। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছিল চল্লিশের কাছাকাছি। তার মধ্যে সাত-আটজন এসেছে বোধহয়। যারা আসেনি, আসলে আসতে পারেনি, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অভিমান করাও কোনো অবকাশ নেই।

বৃষ্টি নেমেছিল কাল রাতে। সারারাত ধরে ঝরেছে। আজ দিনে দু-তিনবার বৃষ্টির তোড় কমে গিয়েছিল। তখন শুধু মিহি গুঁড়ো উড়ে আসছিল হাওয়ায়, যা দেখে আশা হচ্ছিল, এবার বুঝি একদম থেমে যাবে। থামেনি। তার বদলে আজ শেষ বিকেল থেকে আবার তুমুল বৃষ্টি।

আজ মিত্রা আর চন্দনের পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী। ওদের এই নতুন তিনঘরের ফ্ল্যাট সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। নিমন্ত্রিত বন্ধুর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ, মানে প্রায় কুড়ি জোড়া। তার সিকিভাগও আসতে পারেনি। একটু খেয়াল করে তাকালে মনে হচ্ছে, এসেছে মোট সাতজন। বিজোড় সংখ্যা হতেই পারে, কারণ সবাই স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে আসবে না, আগে পরে আসবে জানাই ছিল, নিমন্ত্রিতরও তো কাজকর্ম আছে। লিভিং কাম ডাইনিং রুমের এক কোণে একটা সোফায় নূপুর আর অর্পিতা অনেকক্ষণ থেকে শুধু নিজেদের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছে একটানা। এক একবার কথা বলা তর্কবিতর্কের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এরকম হতেই পারে। ওরা পড়াশোনা করেছে একসঙ্গে। অবশ্য আজ যারা এসেছে এবং যাদের আসবার কথা ছিল তাদের বেশ কয়েকজনের বন্ধুত্বের পটভূমি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। অর্পিতার স্বামী রঞ্জন তার পাশেই বসেছিল এতক্ষণ। এইমাত্র চন্দনের ডাকে উঠে গেল অন্য কোনো ঘরে। দেড়ঘন্টা আগে একবার চা হয়েছে। এখন আবার সামনের নিচু টেবিলে তিন কাপ কফি। একটা কাপ খালি। রঞ্জন তার কফি শেষ করেই উঠে গেছে।

'তুই যে কেমন সংসার করছিস এই চার বছর, আমি বুঝি না। বিভাসকে বিয়ে করবি, আমরা তো তখনই জানতাম। কিন্তু বিয়ের পর এই চার বছর ধরে দুজনে কলকাতা আর দুর্গাপুর ছোটাছুটি। বিয়ের আগে এসব চলে, মন্দ লাগে না। সপ্তাহে কদিন দেখা হল, কদিন হল না। বিয়ের পরেও চার বছর ধরে এরকম! প্ল্যাটফর্মে বাসরঘর!'

অর্পিতা কথাগুলো বলল খুব দ্রুত লয়ে। চিরকাল বৃষ্টির মতন কথা ঝরান অভ্যেস। কথা বলার সময় চোখ সরু করে আনছিল। নূপুরকে একটু খোঁচা দিতে চায় হয়ত। বিভাসের সঙ্গে নূপুরের চেনাশোনা হওয়ার আগেই অর্পিতা আর বিভাসের আলাপ ছিল। অথচ চেনাশোনা হতেই নূপুর আর বিভাস ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। অন্তত সদ্য কৈশোর পেরিয়ে আসা সেইসব দিনে মনে হত, অর্পিতার ভাল লাগেনি ওদের ঘনিষ্ঠতা।

কফির কাপ নিচু টেবিলে নামিয়ে রেখে নূপুর মৃদু শব্দ করে হাসল। – 'প্ল্যাটফর্মের নয় রে, বরং বলতে পারিস- ফার্স্টক্লাস ওয়েটিংরুমে বাসর।'

মিত্রাদের ইনভার্টার আছে বলে তাদের ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে, পাখা চলছে। রাস্তা অন্ধকার। পাওয়ার কাট নয় মনে হয়। সন্ধ্যের পরেই যখন আলো নিবল, ভিজে অন্ধকার নামল সারা এলাকায়, তখন আলো কমতে কমতে একটু মাত্র হলুদ আভা হয়েও ছিল কিছুক্ষণ, তারপর একদম নিবে যায়। চন্দন তখন মন্তব্য করেছিল, 'এভাবে লোডশেডিং হয় না। এদিককার ট্রান্সফর্মার খারাপ হয়ে গেল বোধহয়।'

নূপুর মৃদু শব্দ করে হাসলেও অর্পিতা মোটেই হাসল না।– 'চার বছর কম সময় নয়। এভাবে চলতে থাকলে তোদের বাসরঘরে ফাটল ধরতে পারে না?'

নূপুর তখনো হাসছে।–"দেয়াল অত পলকা ভাবছিস কেন? পরস্পরের ওপর বিশ্বাস থাকলে অত সহজে ফাটল ধরে না।'

'নূপুর, তুই বিভাসকে বিয়ে করেছিস ঠিকই। তুই তাকে বেশি জানিস। তবু আমিও তো চিনি বিভাসকে। তাছাড়া আমিও তো বিয়ে করেছি, ঘর করছি বিভাসের সমান বয়সের একজন পুরুষের সঙ্গে। সারাদিনের কাজের শেষে ঘরে ফিরে বিভাস কখনো-সখনো দু একদিন ছাড়া তোকে পায় না। এভাবে চললে আস্তে আস্তে ওর মনই তেতো হয়ে যাবে না?'

'তুই বলতে চাস আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা অদৃশ্য দেয়াল মাথা তুলছে, অথবা আমাদের মাঝখানে দূরত্বের ওপর সাঁকোটা নড়বড়ে হয়ে আসছে। তুই কি তিলকে তাল করছিস না? আমাদের সমস্যাটা তো সামান্য। আমার চাকরি কলকাতায় আর বিভাসের দুর্গাপুরে। আমি যদি দুর্গাপুরে কোনো কাজ পেতাম অথবা বিভাস যদি এখানে বদলি হয়ে আসত তাহলে কোনো সমস্যাই থাকত না। এই মুহূর্তে তা হচ্ছে না, এই চার বছরে হয়নি। আমি তোর মতন হলে কী করতে পারতাম। বিয়ের পর চাকরিটা ছেড়ে বিভাসের কোয়ার্টারে চলে যেতে পারতাম, তোর মতন মেয়েলি হাতের ছোঁয়ায় ওর ঘর দুয়োর সুন্দর করে তুলতে পারতাম। বিভাস কাজ সেরে বাড়ি ফিরলে আমি সেজেগুজে জলখাবারের প্লেট হাতে সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। বিভাসের মন আহ্লাদে ভরে যেত, ভাবত– আহা, তার সোনে কি চিড়িয়া ঘরেই মজুত। অর্পিতা আমি জানি এরকম হলেই দেয়ালে ফাটল ধরত। আমার বিশ্বাস বিভাসের আত্মসম্মানবোধ আছে, আর তা আছে বলেই সে চায় তার বউয়েরও থাকবে আত্মমর্যাদাবোধ। আমার ওপর বিভাসের বিশ্বাস- শ্রদ্ধা বললেও দোষ নেই – ভাঙতে চাই না বলে আমি চার বছর ধরে এই সামান্য দূরত্বের সামান্য দুঃখ ভোগ করছি।'

সব কথাই শুনল অর্পিতা। একটু বেশি স্পষ্ট হয়ে কানে ঘা দিল একটা কথা –সোনে কি চিড়িয়া। ভাবল, নূপুর তাকেই ওই নাম দিচ্ছে। বেশ রাগ হল।

'তুই চিরকাল বড় পাকাপাকা কথা বলিস নূপুর! তোর ওই চাকরিটা আঁকড়ে থাকার দরকার কী? আমি জানি, বিভাস রঞ্জনের থেকেও বড় চাকরি করে। তোদের অভাব কোথায়? আসলে তুই বারমুখী মেয়ে। জানিস না কেমন করে ঘর সাজাতে হয়। তাই ঘরসংসার এড়িয়ে বাইরে ছুটিস, আর যত রাজ্যের বাজে অজুহাত খাড়া করিস।'

অর্পিতাকে খুশি করতে চাইলে অথবা আদরের গলায় ডাকতে চাইলে তার নামের কর্কশ রেফটেফ বাদ দিয়ে নূপুর তাকে শুধু অপু বলে। এখন বলছিল, 'তুই যা ভাবছিস তা নয় রে অপু। কোনো একটা ছুটির সময় তুই আর রঞ্জন দুদিনের জন্য বিভাসের দুর্গাপুরের কোয়ার্টারে আয়। দেখবি বিভাসের ঘরদুয়োর অসুন্দর নয়। তুই হয়ত রান্নাবান্নার কথাও ভাবছিস। তোরা ওখানে এলে দুপুরে আমার রান্না খাবি, আর রাত্তিরে বিভাসের। ওর রান্নার লোক আছে, তবু বিভাস নিজেও দেখবি দারুণ রাঁধে।'

'আমাদের সেই বিভাস, এখনকার এত বড় অফিসার বিভাস, রান্না করছে ভাবতে পারি না!'

অর্পিতা একটি নিঃশ্বাস ছাড়ল, যাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস বলা হয়।

'কেন যে ভাবতে পারিস না! পৃথিবীর সব বড় রাঁধিয়েরাই পুরুষ। আচ্ছা অপু, ইয়ার্কি থাক। একটু সত্যি কথা শোন। আমি যা করছি তা আমার তেমন ভাল লাগে না। বরং বলা যায় খারাপ লাগে। যা নিয়েছি তা তো কোনোদিন শোধ করতে পারব না। একটা যেমন-তেমন চাকরি করলে আমার কিছু আর্থিক লাভ হয়, কিন্তু সবার কাছে আমার ধার শোধ হয় কতটুকু? আমার কাজটা সবার সম্পদ কতটুকু বাড়ায়? আমি বুঝি আমি নিজেকে, সবাইকে ফাঁকি দিচ্ছি। কিন্তু এর বিকল্প হল সবার থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে বেকার হয়ে বিভাসের কোয়ার্টারে গিয়ে ঘরের শোভা বাড়াতে জ্যান্ত প্রতিমা হয়ে থাকা। অমন হওয়ার কথা ভাবলে আমি আঁতকে উঠি। যা করেছি সেটা খারাপ, আমাকে দূরত্বের দুঃখ দেয়। তবে পরিপূর্ণ বেকার হয়ে যাওয়া আরো হাজার গুণ খারাপ। তাই আমি দুটো খারাপের মধ্যে যেটা কম খারাপ সেটাকে ধরে আছি এই চার বছর। কষ্ট পাচ্ছি, পেতে হয়। যারা বদল চায়, পুরনো চেনা সড়কে যারা আর হাঁটতে রাজী নয়, তারা কষ্ট পায়।'

'আবার ভাষণ! তুই কাদের ধার শোধ দিতে চাস নূপুর?'

'আমাদের অনেক বন্ধু, তুই -আমি, আমরা সবাই এই গরিব নিরক্ষর দেশে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছি। কেমন করে এটা সম্ভব হল? কারা আমাদের এই সুযোগ দিল? অসামান্য সুযোগ-সুবিধা আমরা নিয়েছি, যা এদেশের অল্প কয়েকজন মাত্র পায়। যেমন আমরা পেয়েছি। এটা কেমন করে সম্ভব হল?

'সম্ভব হল এই জন্য যে আমাদের মা-বাবা আমাদের পড়াশোনার খরচ যুগিয়েছেন। আর আমাদেরও কিছু গুণ ছিল, আমরা পড়াশোনায় ভাল ছিলাম।'

'অপু, তোর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার কথাই ধরা যাক। তোদের ক্লাসে দেড়শো ছেলেমেয়ে ছিল। তোরা মাসে মাইনে দিয়েছিস বার টাকা করে। আমার বাবা পঁয়ত্রিশ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। তখনো মাইনে ছিল বার টাকা। মাইনেটা আর বাড়েনি। তোদের অধ্যাপকের সংখ্যা তের। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরবাড়ি, অফিস, অধ্যাপক, লাইব্রেরি ইত্যাদির যে খরচ তার তিলমাত্র আসে দেড়শো ছেলেমেয়ের দেওয়া টাকা থেকে। বাকী টাকা কোথা থেকে আসে?'

'সরকার দেয়।'

সরকার কার টাকা দেয়? সরকারের নিজের তো কোনো টাকা নেই। অপু মিত্রাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় আজ এত জল,– তোরা ট্যাক্সি করে এসেছিস ?'

'আমাদের বাড়ির দরজা থেকে রিকশায় চেপে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে, সেখান থেকে ট্যাক্সি করে এই বাড়ি ।'

'ফুল এনেছিস?'

'হুঁ'। একঝাড় রজনীগন্ধা আর এক বাক্স সন্দেশ।'

' যে রিকশায় চালায়, যে ট্যাক্সি চালায়, যাদের কাছ থেকে ফুল আর সন্দেশ কিনেছিস, তারা সবাই এবং তাদের মতন আরো অনেকে ওই বাকি টাকাটা দিয়েছে? তাদের সবার কাছে তোর ঋণ। এই ঋণ একটুও শোধ না করলে তোর খারাপ লাগে না?'

'আমি নিজে আয় না করলেও রঞ্জনের টাকা তো আমারই, মানে আমাদেরই । আমি বেশ কিছু সমাজ সেবার কাজে অর্থ সাহায্য করে থাকি।'

জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নূপুর জোরে হেসে উঠল। কেমন অপমান লাগল অর্পিতার। রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না, রঞ্জন এসে চোখের কোণ দিয়ে নূপুরকে দেখিয়ে রঞ্জন বলল, 'বন্ধুকে বলেছ অঞ্জনের কথাটা?'

অর্পিতার অস্বস্তি বেড়ে গেল। মুখ নামিয়ে নিচু গলায় জানাল, 'না।'

যেমন এসেছিল তেমন আবার চলে গেল রঞ্জন অন্য কোনো ঘরে। যাবার আগে বউয়ের দিকে যেভাবে তাকাল তাকে আর যা হোক স্নিগ্ধ দৃষ্টি বলা যায় না।

'অঞ্জন কে রে, অপু?'

চার সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে অর্পিতা মুখ খুলল।– 'ওর ছোট ভাই আমার দেওর। অনেক দিন থেকে বেকার। এবারে কী একটা টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা যোগাড় করেছে। ছেলেটার বেকারির লজ্জা। জেনেছে, বিভাস বড় অফিসার। অঞ্জনের একটা চাকরির জন্য তোকে একটু বলতে বলেছিল। আমার এসব খারাপ লাগে, কিন্তু ওরা ছাড়ছে না।'

'বেশ তো, আমি বিভাসকে বলব, আজই এখান থেকে ফেরার সময়। বিভাস তো আজ আসছে এখানে। আগেই বলেছিল, আসতে দেরি হবে, কী নাকি কাজের চাপ চলছে দশ দিন ধরে। আমাকে কথাটা বলতে তোর অস্বস্তির কোনো মানে হয় না। আচ্ছা অপু, তুইও তো বেকার। তোকে কেউ বেকার বলে লজ্জা দেয় না?'

অর্পিতার সন্দেহ হচ্ছিল, সে তর্কে হেরে যাচ্ছে। সন্দেহ হত না, যদি না দেওরের চাকরির কথা অনিচ্ছায় বলতে হত নূপুরকে। হারছে মনে হওয়ায় অর্পিতা সত্যি রেগে উঠছিল। বেশ রাগের গলায় বলল, আমার যোগ্যতা আছে, প্রয়োজন নেই।'আমি কোনো চাকরি নিলে একজন এমন বেকারকে বঞ্চিত করা হয় যার অভাব আছে। তুই একটা চাকরি নিয়ে ওইরকম একজনকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছিস।'

'এতক্ষণে তুই খুব চেনা মোক্ষম যুক্তিটা এনেছিস। তোর কথা অবশ্য ঠিক। আমি কোনো একজনের পথের কাঁটা হয়ে আছি, কারণ সবার জন্য কাজের সুযোগ তো তৈরি হয়নি এখনো। নকশার পুরো বদল না হলে হবেও না?. আমি কিন্তু আমার মতন করে ওই পুরনো নকশাটাকেই ছিঁড়তে চাইছি। সে যাক, তোকে একটা উল্টো দৃষ্টান্ত দিই। আমি একজন বেকারকে কাজ পাওয়ার সুযোগ দিচ্ছি না বলে আমার সমালোচনা করছিস। ধরা যাক একটি যোগ্য যুবক বিত্তবানের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে অলস জীবন কাটাচ্ছে, নিজে কিছু করে না। কাজ পেতে পারে, কিন্তু করে না। সে এই জীবন কাটিয়ে তার সমান যোগ্য কোনো বেকারকে কাজ পাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে বলে তো কেউ তার প্রশংসা করে না, বরং ভুরু কুঁচকে বলে, শ্বশুরের ঘাড়ে বসে আছে। তাহলে ছেলে এবং মেয়েদের নিন্দে-প্রশংসা, বিচার সমালোচনার নিরিখ আলাদা?'

অর্পিতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। মিত্রা অস্থির পায়ে এদিকে এল। 'এবারে খাওয়া-দাওয়া ব্যবস্থা করি কী বলিস? আর কত দেরি করব।'

মিত্রা চলে যাবার পরেই তার তিন বছরের মেয়েটি প্রজাপতির মতন উড়ে এসে বলল, 'আমার মা কোথায় গো?'

মেয়েটিকে রান্নাঘরের দিকে পাঠিয়ে অর্পিতা মন্তব্য করল, 'দেখলি তো নূপুর, ওর মা কোথায় আমার কাছে জানতে চাইল। তোর কাছে জানতে চায়নি। তোকে ওর ঠিক মা মাসির মতন মনে হয়নি।'

নূপুর আবার হাসল।– 'তোর ছেলেকে কার কাছে রেখে এসেছিস, অপু?'

'শাশুড়ি। বুড়ো মানুষি, কতক্ষণ সামলাবেন তাই তো ভাবছি, কখন কীভাবে বাড়ি ফিরব।'

মিত্রাদের একটি কাজের লোক এসে খবর দিল। রাস্তায় কোমর জল। আলো নেই। কোনো কোনো বাড়ির জনলা দিয়ে ছড়িয়ে গিয়ে এক-আধটা আলো ভাসছে নোংরা জলে। গাড়িটাড়ি চলছে না একদম।

এখনো বৃষ্টি সমানে ঝরছে, সঙ্গে বাদলা বাতাস। ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে আছে মিত্রাদের সারা ফ্ল্যাট। বেল, যুঁই, গোলাপ, রজনীগন্ধা। এই বৃষ্টিতে শুধু তাদেরই মজা। একটু বেশিক্ষণ তাজা থাকবে।

টেবিলে খাবারের প্লেট সাজান হচ্ছে, তখন বিভাস এসে হাজির। দরজা দিয়ে ঢুকেই চিৎকার, 'ঠিক সময়ে এসে গেছি!'

রাস্তায় কত জল, গাড়িটাড়ি নেই, হেঁটে এল না সাঁতরে এল — এসব নিয়ে কোন মন্তব্য করল না। বিভাসের পায়ে গামবুট, গয়ে রেনকোট, মাথায় ওয়াটারপ্রুফ টুপি। বিভাসকে বেশ কিছুকাল পরে দেখছে অর্পিতা। ওই সব পরা মাথায় অনেকের থেকেই উঁচু বিভাসের দিকে তাকিয়েই অর্পিতা ছোটবেলায় পড়া বাংলা রহস্য কাহিনীর প্রথম পাতা মনে এসে গেল।– রাত্রি গভীর। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই রাত্রিতে

দীর্ঘকায় ব্যক্তি গোবরা গোরস্থানের মধ্য দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে কোথায় যাইতেছে? গায়ের রেনকোটের উঁচু কলার তাহার মুখের নিম্নাংশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মুখাবয়বের উর্ধ্বাংশ আবৃত রহিয়াছে টুপিতে। কেবল চোখ দুইটি অনাবৃত। সেই চোখের দৃষ্টি কেমন, অন্ধকারে বুঝিবার উপায় নাই।

বিভাস এসেই স্নানের ঘরে ঢুকল। ওই পোশাক ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে, মিত্রার সাজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি চালিয়ে যখন সাদা প্যান্ট পরা বিভাস এদিকে এল, তখন বোঝা গেল, সেই আগেকার বিভাস, তবে আগের থেকে অল্প রোগা হয়েছে। অর্পিতার অন্তত তাই মনে হল। বিভাসকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল অর্পিতা, তার প্রত্যেকটি কথা শুনছিল কান পেতে। নূপুর আর বিভাসের ঘরের দেয়ালে ফাটল খুঁজছিল।

রঞ্জনকে যেমন, বিভাসকেও তেমন চন্দন ডেকে নিয়ে গেল অন্য কোনো ঘরে। বিভাস দেরিতে আসায় সবার খেতে বসতে খানিক দেরি হল।

সাড়ে ন-টা নাগাত খাবার টেবিলে বিভাসের একপাশে নূপুর, একপাশে অর্পিতা। এতক্ষণে নূপুর বুঝতে পারল, চন্দন কোথায় ওদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কোনো ঘরের কোণে বাচ্চাদের চোখের আড়লে ওরা নিশ্চয়ই ছোটখাট মদ্যপানের আসর বসিয়ে ছিল। নূপুর দেখেছে, যাদের একটু ভাল মাইনের চাকরি তাদের বেশির ভাগই ইদানীং এসব করছে, বিভাসও। তবে বাঁচোয়া এই যে, বিশেষ উপলক্ষে ছাড়া এরা এসব করে না, আর এদের এক-আধজন ছাড়া আর কেউ মাতাল হয় না। খেতে বসে বিভাস-রঞ্জনরা কেবল কথা বলছিল স্বাভাবিকের থেকে বেশি।

অর্পিতা ওদের কথার মধ্যে ফাঁক পেয়ে বলে বসল, নূপুর আর বিভাসের বিয়ের বয়েস চার বছর। একবারও আমরা বিবাহবার্ষিকীতে নেমন্তন্ন পাইনি। কোনো অনুষ্ঠান কি হয়নি? ব্যাপারটা কী? দুজন থাকে দু জায়গায়। দুহুঁ হায় চায় বিষাদে, মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা জলধি। আমরা বিভাসের কাছে জানতে চাই, ওদের সংসার কেমন চলছে।'

বিভাস একদা অর্পিতাকে 'তুই' বলত, নূপুরকেও। এখন আর তা বলা যায় না। বেশ শোভন ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি জান না কেমন সংসার করছি আমরা? এসে তো দেখলাম, নূপুরের সঙ্গে সেঁটে বসে আছ। নূপুর তোমাকে এ বিষয়ে ভাষণ-টাসন শোনায়নি?'

দু আঙুল তুলে নেওয়া মাছভাজার টুকরোটা মুখে পুরে ভাল করে চিবিয়ে খেয়ে বিভাস আবার বলল, 'আমি একসময়ে গল্প লিখে তোমাদের পড়ে শুনিয়ে জ্বালাতন করেছি। মনে আছে, অর্পিতা? আজ আবার একটা গল্পের অংশবিশেষ শোনাই খেতে খেতে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র আমার বউ। তোমরা কেউ কেউ জান, এই মহানগরের দক্ষিণ প্রান্তে আমাদের বাস ছিল। স্কুলে পড়ার বয়সে, যখন তোমাদের কাউকে চিনি না, আরো দক্ষিণের একটা এলাকার আশপাশ দিয়ে আমরা ছেলেরা মাঝে মাঝেই ঘোরাঘুরি করতাম। দিনে দিনে আমাদের চোখের সামনে ওই এলাকাটা বদলে গেল। একদল দুঃস্থ মানুষ এল ওখানে। এসে ওখানে থেকেই গেল। কেউ তাদের নড়াতে পারল না। আমরা দেখলাম,

জোর করে বসতি স্থাপন। আমরা ওদের জমির মালিকের সঙ্গে লাঠালাঠি করতে দেখলাম। বারবার ভেঙে দেওয়া ঘর ওদের আবার তুলতে দেখেছি। ওরা জঙ্গল সাফ করেছে, সাপ মেরেছে, সাপের ছোবল খেয়েছে। এভাবে কেটেছে বছরের পর বছর। তারপর আমরা কেউ কেউ যখন কলেজে, ওরা মালিকদের যুক্তিসঙ্গত টাকা দিয়ে নিজেরা জমির মালিক হয়েছে। ওদের এলাকায় ডাকঘর, স্কুল, মাতৃসদন ইত্যাদি হয়েছে। আরো পরে তো কলেজও হয়েছে একটা।

'ওখানে একটা বাড়ির পাশ দিয়ে আমি প্রায়ই যেতাম। ওই বাড়ির দুখানা ঘর। অ্যাসবেস্টসের চাল, ছ্যাঁচাবাঁশের বেড়া। ছোট এক চিলতে উঠোন। সেখানে একটা লেবু আর একটা ডালিম গাছ! কেন জানি না ওই ডালিমগাছটা আমাকে টানত। গালভরা কথায় যাকে বলা হয় আমার চেতনার বৃত্ত, সেখানে ওই ডালিমগাছটা একটুখানি জায়গা জবর দখল করে নিয়েছিল।

'একদিন বিকেলে যেতে যেতে দেখলাম, ডালিমগাছটায় ফুল ফুটেছে। তখনই এদিক থেকে বাতাসের একটা ঝাপটা এল। গন্ধ পেলাম না। তবে বিচিত্র খুশিতে মন ভরে গেল। চলে যাবার আগে থেমে রইলাম কয়েক সেকেণ্ড।

'ইদানীং আমার কোয়ার্টারে কখনো একা লাগলে, বিশেষ করে বৃষ্টির রাত্তিরে, কতদিন আগে দেখা ওই ডালিমগাছটাকে আবার মনে পড়ে, দেখতে পাই ফুল ফুটেছে। আমি ওই ডালিমগাছটার নাম দিয়েছি নূপুর, মানে আমার বউ।

নূপুর কনুইয়ের খোঁচা দিল।— 'চন্দনের সঙ্গে গিয়ে কতটা খেয়েছ?'

কথার খোঁচা দিতে চাইল অর্পিতা।— 'শুধুই ফুল?'

বিভাস নির্লজ্জ। —ফলের কথা বলছ তো? ফলও ধরবে। এত ব্যস্ত কেন?' বিভাসের এই শেষ মন্তব্যের সময় টেবিলে সবার চোখ নূপুরের দিকে। নূপুর ঈষৎ লজ্জায় মুখ নিচু করল।

চন্দ্রমুখী



এমনভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটল, ঠিক যেন ক্যাঙারুর মত। ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে হেঁটে হৃদয় এসে দাঁড়াল উর্বশীর সামনে। উর্বশী ফিক করে হাসল, তারপর নববধূর মত সলজ্জ চোখ করে বলল, সেই দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে, এই তুমি এলে? উর্বশী অভিমান আনল গলায়। সকালেও দাঁড়িয়ে ছিলাম, তুমি এলে না।

হৃদয়চাঁদ উর্বশীর মাথায় চোখ রাখল। বিরল কেশ। তাও আবার গ্যাসের ধকলে এই অকালে সাদা- কালোয় ফিফটি ফিফটি। নামী কবিরাজের মোক্ষম বিধি মাথায় লাগিয়ে নকল খোঁপা সাজিয়েছে কেজি দুই বাঁধাকপির মত। এই নকল খোঁপায় উর্বশীর রূপ যেন শতগুণ বেড়ে গেছে বলে মনে হল হৃদয়ের। হৃদয়চাঁদ বলল, ইচ্ছা তো সবসময় তোমার কাছেই থাকি। কিন্তু সকালে কি করে আসি বল? চন্দ্রমুখী আবার ভোরবেলা থেকে ফেরেনি বাড়িতে।

উর্বশী হৃদয়ের বাসনা শুনে আহ্লাদে গদগদ হল। হয়ে সোহাগ করে ভেঙাতে যাচ্ছিল, কিন্তু আঁতকে উঠল। উঠে বলল, কে চন্দ্রমুখী?

হৃদয় হাঁটার জন্য উদ্যত হয়ে আবার থমকে দাঁড়াল। অদূরে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ। চোখের ওপর প্রশস্ত গড়ের মাঠ। পাতাল রেলের কাজ চলছে ওপাশে। হৃদয় এবার শূন্য দৃষ্টি উর্বশীর খোঁপার ওপর থেকে তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চূড়োয়।

হৃদয়চাঁদ শূন্যে তাকালে কেমন ট্যারা হয়ে যায়। শূন্যে তাকিয়ে থেকে বলল, কিছু দেখছ?

উর্বশী যেন ভয় পেল একটু। কানের কাছে মুখ এনে গুন গুন করে বলল, কি গো মোদক-টোদক খাওনি তো? আঙুল ছেড়ে দিল উর্বশী।

আমার দৃষ্টি এখন শূন্যে। কিছু দেখি না মাটির ধরণীতে। তুমি আমাকে ধরে নিয়ে চল। হৃদয় হাতখানা বাড়িয়ে দিল এবার। দিয়ে গান ধরল— হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখি, আমি তো পথ চিনি না।

উর্বশী আরো ভয় পেল। কিন্তু আঙুলের পরিবর্তে জামার কলার ধরল শক্ত করে। তারপর হিড় হিড় করে টানতে টানতে সামনের রাস্তাটা পার হয়ে এসে বলল, একটু ঝালমুড়ি কি ফুচকা খাবে?

দাঁড়াও। ভিক্টোরিয়া মেমেরিয়ালের চূড়োটা ভাল করে দেখে নিই। ট্যারা হয়ে আবার হৃদয় তাকাল চূড়ো?!

উর্বশী এবার আর ভীত হল না। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তোমার বাবার কোবরেজ-খানায় আর কত মন কামানন্দ আছে বল তো? উর্বশী এখন হাতের কবজিতে মোক্ষম একটা চিমটি কেটে বলল, প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে হলেই কি ওই ছাই পাঁশগুলো গিলতে হয়?

হৃদয়চাঁদ চকিতে অস্ফুট শব্দ করে হাত টেনে নিল। উর্বশী আবার হৃদয়ের হাত টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ফুচকায় তেঁতুলগোলা জল থাকে। হয়ত নেশা কেটে যেতে পারে। উর্বশী আরো কাছের হয়ে ঘনিষ্ঠ গলায় বলল, ছিঃ! ওই সব কুকুরের বিষ্ঠাগুলো গেল কেন, আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

উর্বশীর প্রচণ্ড সোহাগের মৃদুস্পর্শে হাতের কবজি তখনো জ্বলছে। হৃদয় চিমটির দাগে হাত বোলাল। কিন্তু উর্বশী হৃদয় চাঁদের হাত শক্ত করে টানতে টানতে ভিক্টোরিয়ার গেট পার হয়ে ভেতরে যাচ্ছিল। সেই বিচিত্র ভঙ্গিমায় প্রেমিক-যুগলের নিরুপম অভিসার অনেকেই লক্ষ্য করছিল, কিন্তু প্রেমিক-যুগলের তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এতক্ষণ পরে চূড়োর ওপর সেই পরীর গা থেকে চোখ সরিয়ে হৃদয় বিষণ্ণ উচ্চারণ করল, না পেলাম না।

কাকে? উর্বশীও চিমটির দাগের ওপর আঙুলের আলতো পরশ দিল। দিয়ে আবার প্রশ্ন করল, কাকে গো?

তাকে।

কাকে?

তাকে।

উর্বশী এবার চারিদিক ভাল করে দেখে নিয়ে মিঠেকড়া একটা চপেটাঘাত করল হৃদয়ের নাতিদীর্ঘ ভুঁড়ির ওপর। করে বলল তোমার বাবাকে বলে দেব, দিন দিন ভীষণ বদ হয়ে যাচ্ছ তুমি!

কিন্তু তাতেও উর্বশীর ভয় কাটল না। উর্বশী টানতে টানতে একটু লোকবিরল জায়গায় দাঁড় করিয়ে বলল, একটা আইসক্রীম কিনে মাথায় চেপে ধরব?

হৃদয়ের দৃষ্টি বিস্ফারিত। শূন্য। সেই শূন্য দৃষ্টি আবার তুলে ধরল ভিক্টোবিয়ার চূড়োয়। তেমনি তাকিয়ে থেকে বলল, মাথায় কেন, জিব শুকিয়ে কাঠ। কেনো কেনো।

তাই। পুকুরের পাড়ে খোলা হাওয়ায় একটা বেঞ্চির ওপর বসিয়ে উর্বশী কিনতে গেল আইসক্রীম। তারপর সযত্নে খাইয়ে বলল, হ্যাঁ গো?

কি একটা উদ্গার তুলে হৃদয়চাঁদ বলল, তুমি ও জন্মে আমার প্রেমিকা খালি নও, পূর্বজন্মেও কেউ ছিল আমার আসছে জন্মেও যেন তোমায় আবার পাই।

উর্বশী লজ্জায় যেন রাঙা হল। মাটির দিকে চোখ করে থাকল।

হৃদয় বলল, আমি এখন থেকে তোমার কাছে কেনা গোলাম হয়ে যাব।

ভীষণ আনন্দ হল উর্বশীর। এতক্ষণ পরে প্রেমের কথা ফুটছে মুখে। হাসি হাসি চোখে উর্বশী এবার তাকাল হৃদয়ের চোখে। বাবরি চুল। হৃদয়ের কপাল দেখল। বাবরি চুল কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য সুন্দর। শুধু যা একটু ভুঁড়ি হয়েছে এই বয়সে। তা হোক। পুরুষ তো আর মেয়েমানুষ নয় যে দেহের কোনো কিছু বাড়ন্ত হলেই বেমানান হবে। উর্বশী চুল চোখ ভুঁড়ি ইত্যাদি সবকিছু দেখে নিয়ে বলল, অ্যাই–

কি?

চন্দ্রমুখীর বয়েস কত?

হৃদয় তাকাল একক্ষণ পরে ভিক্টোরিয়ার চত্বরে। এই অন্ধকারে ভিক্টোরিয়ার চূড়ো

আর যখন চোখে পড়ল না, তখন বলল, বয়েস?

হ্যাঁ। ঘাড় নাড়ল উর্বশী।

এক মাস চা-চা চারদিন। প্রেমিকার কথার চটচট জবাব দিতে গেলে হৃদয় কেমন তোতলা হয়ে যায়।

কী বকছ এসব? উর্বশী চপেটাঘাত বা চিমটি কাটল না। হাঁটু দিয়ে ঠকাস করে হৃদয়ের হাঁটুতে ঠোক্কর দিল। তরপর একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, অ্যাই—

কি?

বেশ অন্ধকার এখন। কিছু খাবে?

সব তেতো।

কি তেতো?

এই অন্ধকারে কোনো কিছু খাওয়ার আমার ইন্টারেস্টিং নেই। প্রেমিকার সামনে ইংরাজী বল্‌লে পৌরুষ বাড়ে, তাই হৃদয় বলল, আই হ্যাড মাচ ফেড আপ। অনেক তো পেলাম।

আর দ্বিতীয় দফায় হৃদয় ইংরাজী বলে রাগ হলে। কিন্তু রাগের সময় এটা নয় সন্ধ্যা-বেলা। ফুরফুরে হাওয়ায় প্রেমিক-প্রেমিকা এত কাছাকাছি বসে। অতএব সোহাগের কথা বলল, জানো, তুমি আমার কাছে খুব পপুলারিটি। আই লাভ ইউ।

উর্বশীর বেজায় গর্ব হলো। কিন্তু ভয় কাটল না। আরো কাছে সরে এসে বলল, এক মাস চারদিন যার বয়েস সে, বাড়ি ফেরেনি?

না।

সত্যি?

বিশ্বাস কর। হৃদয় দূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল।

মিথ্যুক। এত ম্যাজিকের মত। উর্বশী ক্রোধ আনল গলায়। গ্যাঁজা দিচ্ছ? উর্বশী যথেষ্ট চাপা গলায় বলল, ছিঃ ছিঃ, নেশা করে আর কোনোদিন প্রেম করতে এস না। ছিঃ! আমরা ভদ্রলোকের মেয়ে। বেশ্যা নই। ছলাকলা এত পছন্দ করি না।

যদিও এখন আলো জ্বলছে ভিক্টোরিয়ার চত্বরের কিন্তু এই আলো-অন্ধকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জোড়া জোড়া। এরকম জোড়া জোড়া দেখে উর্বশীই আরো ক্ষেপে গেল। বেজায় গলায় বলল, যখন সকালে এসে দাঁড়ালাম, এলে না। বিকেলে যদি বা এলে তাও মাতলামি করতে। ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করনি কোনদিন বুঝবে কি?

হৃদয় একটু কুঁকড়ে গেল। বলল, ভদ্রলোক বাজারে প্রচুর আছে, কিন্তু তোমার মত খাঁটি আগমার্কা কার কতজন আছে বল? আমি ভগ্যবান। আই হ্যাভ লাকি এনাফ।

উর্বশী এবার আরো চেপে ধরল। কিন্তু চন্দ্রমুখী কে কই তা তো বললে না? হৃদয় গদগদ করে বলল, আমার সাধের পায়রাটা।

উর্বশী হতভম্ব চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলে হৃদয় বলল, সকালে তোমাদের বাড়ির ছাদের দিকে উড়িয়ে দিলুম পায়ে প্রেমপত্র বেঁধে দিয়ে! ব্যাস! ফিরলই না।

প্রেমপত্র? উর্বশী উল্লসিত গলায় ডাকল, এই–

কি?

আমার ঐকান্তিক বাসনার কথা কাল সন্ধ্যাবেলা শুনেই আজ সকালে পূরণ করেছ? তবে? তুমি কি আমার ফ্যালনা?

এই, আমি তোমার চিঠি বুকে করে রাখব। উর্বশী একটু নড়েচড়ে বসে গা দুলিয়ে বলল, আমার খুব সখ প্রেমপত্র পড়ার। প্রেমিকার চিঠি আমি বুকে করে রাখি। ব্লাউজের নিচে হাত ডুবিয়ে হয়ত অন্য চিঠি বের করতে যাচ্ছিল। কিন্তু একটু সচেতন হয়ে বলল, লিখো, হাজার হাজার, লাখো লাখো পত্র লিখো। আমি এখানে রেখে দেব। ব্লাউজ তুলে দেখিয়ে বলল, এই হৃদয়ের কাছাকাছি, কেউ জানবে না। তারপর একটু যেন দম নিল। নিয়ে বলল, পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে পাঠিও ওইরকম। তোমার সাধের চন্দ্রমুখীকে আদর করে আনন্দ করে নাড়ু খেতে দেব। আজই ফিরে গিয়ে বানিয়ে রাখব।

পাঠাব। হৃদয় বলল, ওই সময় হয়ে গেল, ঘন্টি বাজছে। চল উঠি। তারপর উঠতে উঠতে বলল, প্রেমের কথা কটা আর বলা হয় এই মাঠে ময়দানে। তুমি যে আমার কতখানি ভালবাসার ধন, তা তুমি বুঝবে না। হৃদয় অভিমান আনল গলায়, সবসময় তুমি আমাকে নেশাড়ে, নিষ্ঠুর ভাব। উজবুক, অপদার্থ, পাগল গালাগাল দাও। হাতে হাঁটুতে চিমটি কাটো। টোক্কর মার।

উর্বশী বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি বলে। একটু হেসে যেন সোহাগ ঢালল গলায় বাঃ, শুধু প্রেমিকারাই টোক্কর মারবে, প্রেমিকদের কোনো ভূমিকা নেই বুঝি?

হৃদয় উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই ধপাস করে আবার বসে পড়ে হাঁটু নাড়িয়ে পূর্ব প্রেমিকাদের বাসনাগুলো পরপর মনে করতে থাকল। উর্বশীর আগে হৃদয়চাঁদ যার সঙ্গে ইয়ে ইয়ে করত, তারও একটা অদ্ভুত বাসনা ছিল। ঠোঁট লাল করতে হবে।

হৃদয় তাতেই রাজী। তখন প্রেমিকার সঙ্গে পান খেতে হত হৃদয়কে। মিঠে নয়, একেবারে গুণ্ডিপান। অভ্যস্ত প্রেমিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হৃদয়ের মাথা ঘুরত, পা টলত, অথচ পুরুষমানুষ। প্রকাশ করতে পৌরুষে। বাধত হৃদয়ের। গড়ের মাঠের ভেতর একদিন দুজনে অন্ধকারে বসে পান খাওয়া শুরু করল সন্ধ্যায়। চারশ বিশ মার্কা গুণ্ডির ঠেলায় প্রথমে বমি করল হৃদয় প্রেমিকার গায়ে। পরে অজ্ঞান। লোকজন জড় হল। পুলিশ এসে গোটাকয়েক গোঁত্তা মারল পাছায়। জ্ঞান ফিরল হৃদয়ের হাতঘড়ি, মানিব্যাগ সব খোয়া গেছে।

ব্যাস! সেই ইতি। কিন্তু পরের প্রেমিকা অত কড়া নয়। তার আবার অন্যরকমের ঘ্যাঙানি। আাই–মালবাবু?

কি?

তোমার বাবা কত বড় নামকরা কবিরাজ।

তাতে কি?

নিশ্চয়ই কত বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ?

হৃদয় ঠোঁট কামড়ে বলল, ছোটলোকরা বাবার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না। সব ভি আই পি।

তাহলে, বাসনা প্রকাশ করল প্রেমিকা, আমার স্কুল ফাইনালের কোশ্চেন আউট কর না? কতবার আর ধ্যাড়াব?

হৃদয় বাবার গৌরবটা খাটো করতে চাইল না। বলল, তুমি কিচ্ছুটি ভেবো না। এবার শিওর পাশ। ঠিক ঠিক মাঠে এস। যথাসময়ে পেয়ে যাবে।

মেয়েটি পরীক্ষার দুদিন আগেও প্রেমের পাঠ নিল যথারীতি ময়দানে এসে। ফেরার সময় বলল, কি গো?

কি ?

পরশু থেকে তো পরীক্ষা। আমি নতুন সায়ায় বারোটা পকেট বানিয়ে বসে আছি। কিন্তু প্রশ্নপত্র?

পাবে।

কখন?

যথাসময়ে। হৃদয় আমেজ করে সিগারেটে টান দিল।

সময় তো এসে গেল। মাঝে তো মোটে কটা দিন।

কিন্তু কি করব বল? হাওড়া স্টেশনে রোজ তো যাচ্ছি।

কেন?

ধরতে।

ডাগর চোখে বিস্ফারিত তাকায় প্রেমিকা। কাকে?

মালবাবুকে।

মালবাবু? হি হি, একটু বাঁকা করে হেসে সঙ্কোচে বলল, ইস, ওটা তো অসভ্য কথা।

হৃদয় যেন কত জানে। এমন ভাব দিয়ে বলল, খাঁটি সরকারি পরিভাষা। স্টোর-কিপারের বাংলা।

সে আবার কে? তার কাছে কেন প্রেমিকা উচ্ছল গলায় জিজ্ঞাসা করে।

কে আবার? মানুষ। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হৃদয় তড়িঘড়ি বলে, সেজদির সেজো ননদের ছোট মেয়ের রাঙামামার নাতজামাই।

বাঃ! আমি কিন্তু তোমার আশায় বসে আছি।

থাকো, থাকো। হৃদয় সাহস দিয়ে বলল, তিনি কোশ্চেনের শিরোমণি। সেই স্টোরকিপারের স্ট্রংরুমে হাজার রকমের কোশ্চেন। কটা নেবে?

নাকি? উল্লাস প্রকাশ করল প্রেমিকা।

আমি যখন প্রেমিক তোমার, তখন ভাবনায় হৃদয় বলল, কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব থেকে পাটনা, পাটনা থেকে পাটুলিপুত্র খালি কোশ্চেন বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাওড়া এলেই ধরব। জাপটে ধরব। ঠোঁটের ওপর গর্বের হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলল, ভারতবর্ষে যত পরীক্ষা হয় তার ফিফটি পারসেন্ট ছাপার ভার তার ওপর। সাধে অত বড় পোস্ট মালবাবু?

আরো কাছে সরে আসে প্রেমিকা। হাতের ও পর হাত রাখে। হৃদয় প্রেমিকার হাতে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলে পুরো বঙ্গোপসাগরের কোশ্চেন ছাপার ইনচার্জ। পা নাচাতে নাচাতে হৃদয় বলে, বঙ্গোপসাগরের একদিকে ধরা হচ্ছে ইলিশমাছ, অন্যদিকে জাহাজের ওপর টাটকা ইলিশ ভাজা খেতে খেতে ছেপে চলেছে কোশ্চেন। কী বাহাদুরি বলত? রেল কোম্পানি ধরে রেখেছে তাই, এতদিন উড়োজাহাজের চাকরি করবার কথা। ইলিশ মাছ কলকাতায় পৌঁছনোর আগেই কোশ্চেন চলে আসছে পরীক্ষার হলে।

কিন্তু বর্তমান প্রেমিকা উর্বশীর তেমন কোনো আকাঙ্খা নেই। শুধু সমান্যতম বাসনা প্রেমপত্রের। হৃদয় বলল, সাহেবরা যুদ্ধের সময় পায়রাকে কাজে লাগাত। শোননি? পায়রার পায়ে বার্তা বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিত।

তুমি কত জান। উর্বশী বলল সত্যি ঈশ্বর যেন পরজন্মের তোমার জন্য আমাকে তৈরি করেন।

তুমি আমার চোখে শতদল। কিন্তু শতদলের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেল না হৃদয়। তাছাড়া একশত কম বলে নিজের কানেই লাগসই হল না কথাটা। হৃদয় বলল, শতদল নয়, সহস্র দল। তবু যেন মনঃপুত হল না কথাটা। হৃদয় ভেবেচিন্তে বলল তুমি আমার চোখে দলমাদল কামান।

উর্বশী লুটানো আঁচলটা বুকে তুলে হাসি হাসি মুখ করে বলল সে আবার কি?

হৃদয় আবার পণ্ডিতের ভুমিকা নিল। বলল ইতিহাস পড়নি? মহাশক্তিধর কামান। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময় রাজা বংশীবল্লভ বৈবাহিকসূত্রে আমার ঠাকুর্দার বাবার মেজকাকাকে দান করে যায়। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের রাষ্ট্রমন্ত্রী সেটা ধার করে নিয়ে সেই কামান দেগে ইংরেজদের আম বাগান পার করে দিয়েছিল। পড়নি?

নাকি? উর্বশী বিস্ময় আনল গলায়?

হ্যাঁ। গোলন্দাজ গুলবল্লভ দাঁত দিয়ে নলটা চেপে ধরে পা দিয়ে ট্রিগার টিপত। ঠাকুমার মুখে শুনেছি, লর্ড ক্লাইভের আমল থেকে সেই কামানে আগে তোপধ্বনি হত ঠিক বেলা একটার সময়। এখন যেমন সাইরেন বাজে ঠিক নটার সময় কলকাতায়।

হৃদয় এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে উপহাস আনল গলায়। লর্ড ক্লাইভ যদি নিয়মিত তোপ দাগতে পারে, আর আমি তোমায় নিয়মিত প্রেমপত্র লিখতে পারব না? হৃদয় মাথা চুলকে বলল, আজই তো দেখলে পায়ে চিঠি বেঁধে চন্দ্রমুখীকে পাঠালাম তোমাদের বাড়ির দিকে। অথচ ফিরলই না। শালা কার সঙ্গে ফস্টিনষ্টি করে সময় কাটাচ্ছে। হৃদয় মন্তব্য করল, পাখিদেরও বিছানা ধামসাবার শখ আছে শালা।

ব্রীড়ামন্দ্র চোখে মাটির দিকে চোখ করে ফিকফিক করে হাসল উর্বশী। হেসে বলল, লিখো লিখো, খুব লিখো। আমায় সখা বলে সম্বোধন কর।

সখা আবার শুধু হয় নাকি ? হৃদয় বলল, কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া। আমার প্রাণের ডিসকো সখা লিখব।

ওঃ , কী যে ভাল তুমি! আনন্দে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল উর্বশী। কেজি দুই ওজনের বাঁধাকপি ডাইনে বাঁয়ে নড়েচড়ে থেমে গেল।

বাবরি চুলে হাত দিয়ে হৃদয়চাঁদ বলল, লিখে লিখে তোমায় পাগল করে দেব। ডাঁই প্রেমপত্রের ডানলোপিলোর ওপর বিছানা পেতে শুয়ে আরামে ঘুমোতে পারবে তুমি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাঝরাত পার হলে তাজমহলের স্বপ্ন দেখবে।

কী ভাল! উর্বশী আনন্দে নখ ছিঁড়ল দাঁত দিয়ে।

হৃদয় আনন্দে জিভ দিয়ে। নিজের ঠোঁটটা চেটে নিয়ে বলল, তাজমহলের ভেতরে তুমি আর আমি পাশাপাশি বসে আছি। শুকতারাটা মাথার ওপর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তখন। কপালে তোমার কনে চন্দন। তোমার নকল খোঁফায় জড়ানো কদমফুলের মালা। তোমার একটা হাত আমার হতে। আমার শুভদৃষ্টি তোমার ঠোঁটের ওপর। গলায় তোমার শক্ত কাছির মত জবাফুলের লাল টকটকে মালা।

উর্বশী বলল, না না হাঁটব না। চল ট্যাক্সি করি। ট্রামে-বাসে লোক গিজ গিজ করে ভাল লাগে না। কবে যে পাতাল রেলটা হবে? ফাস ক্লাস রিজাভ করে দুজনে ফিরব তখন এখন তাজমহলই আমাদের ভাল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাইরে এসে উর্বশী বলল, তুমি লিখো, অনেক লিখো। লিখে লিখে পায়রার পায়ে বেঁধে রোজ পাঠিও। আমি বিছানা পেতে সেই গদির ওপর আরামে ঘুমোব, স্বপ্ন দেখব।

হৃদয় ততক্ষণে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছে। উর্বশীকে উঠিয়ে নিয়ে নিজে পাশে বসে বলল, পাড়া আমার! কেউ না ভাবে আবার পায়রার পায়ে বেঁধে প্রেমিকাকে ব্ল্যাকমানি পাঠাচ্ছি। এমনিতেই তো পাড়ার বদ ছেলেগুলো পায়রা নামিয়ে মাংস খাবার জন্য গুলতি নিয়ে বসে থাকে ।

বাড়ি ফিরে হৃদয় আগেই ছাদে যাবার জন্য গান ধরল। পায়রার ঘর দেখবে বলে। গানটি তার ঠাকুরদা গেয়েছিলেন বাসরঘরে। মা সন্ধ্যার পরে ছাদে গেলে বাবা উঠত গেয়ে গেয়ে যতদিন বাবার চুল কাঁচা ছিল। সুরটা আগে ছিল খেমটা গোছের। বাবা

সেটাতে গজলের গঙ্গাজলের ছিটে মিশিয়েছিল। ছিটে কয়েক হৃদয় এখন পপ সুর লাগিয়ে অত্যাধুনিক করেছে নিজের যোগ্যতায়। হৃদয় এক সিঁড়ি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে উঠছিল আর গাইছিল –

(সখি) কবে আমার ফুটবে বিয়ের ফুল
আমার বয়সী ছিল যারা
সাতছেলের বাপ হল তারা
আমার এমনি কপাল পোড়া
আইবুড়োতে পাকল চুল।

কিন্তু ছাদে গিয়ে হৃদয় স্তম্ভিত হয়ে গেল। হকচকিয়ে চোখে হাত দিয়ে বিহ্বল দাঁড়াল কিছুক্ষণ। চন্দ্রমুখী ছাদের কোণে পড়ে আছে। পেটে গুলতির দাগ। মরে গেছে।

পেটটা ফুটো হয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ে পশমের মত কচি সাদা পালক রক্তে লাল। চোক দুটো স্থির। ঘাড়টা বেঁকে গেছে। হৃদয় চোখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে ফেলল। তার ভালবাসার কথাগুলো রক্তে ভিজে গেছে বলে নয়, তার এই নিষ্ঠুর খেলায় একটা নিষ্পাপ জীবন তাকে ছেড়ে চলে গেল বলে।

বুকের গভীরে



মনে হচ্ছে একটা পোকা আমার কানের কাছে ফরপর করে উড়ে বেড়াচ্ছে। হাত দিয়ে বার বার তাড়াতে চাইছি, তবু যাচ্ছে না। একটা বিশ্রী অনুভূতিতে মনের ভেতরটা বিরক্তিতে ভরে যাচ্ছে। একবার এই কানে, আবার ওই কানে। পোকাটা উড়ছেই।

অথচ আশ্চর্য আমি দেখতে পাচ্ছি না।

অন্য সব কিছু দেখছি। এই ঘর, টেবিল, চেয়ার, আলমারি, খাট। ঘরের চুনকাম করা সাদা দেওয়াল। দেওয়ালে টাঙানো ছবি, ফুলদানি, বিছানা। ভাল করে চোখ মেলে তাকাই।

সব স্পষ্ট। অথচ পোকাটা নেই। তার উপস্থিতি আছে। আঁতিপাঁতি করে পোকাটাকে খুঁজি। চোখ কচলে নিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করি। নাঃ কোথাও কোনো পোকা নেই। মনে মনে ভাবলাম, বোধহয় ফর্র্ শব্দটাই ভুল শুনেছি।

আমি ছাড়া এখন এই ঘরে জীবিত কোথাও কিছু নেই। আবার ভাবলাম, হয়তো উড়ে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে কোথাও পালিয়েছে।

এই ধারণায় স্বস্তি পেলাম। কী বিশ্রী লাগছিল। একটানা ফরর্ ফরফর শব্দের জন্য কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম না।

একাই ঘরে বসেছিলাম। কিছু ভাল লাগছিল না। নিজের মনটাকে খোলাখুলি দেখতে ইচ্ছে করছিল। আমার শরীরের ভেতর যে মনটা আছে, সেটা কি আমারই, না অন্য কারো! মাঝে মাঝেই আজকাল আমার মনে হয় হয়তো আমার মনটা ঠিক আমার অধিকারে নেই। সে যেন স্বাধীন একটা সত্তা পেয়েছে আর সেই মতো চলছে। তা না চললে এমন হবে কেন?

আবার ফরফর্ করে শব্দ উঠল। চমকে উঠলাম। হ্যাঁ, পোকাটা আবার ফিরে এসেছে। স্পষ্ট আমি তার শব্দ শুনতে পেয়েছি। আমার ডান কানের ভেতরে ঢুকে যেন সে তার পাখা ফরফর করছে। অনুভূতিটাকে তীক্ষ্ণ করে হাত তুললাম। ডান কানে হাত দিলাম। নাঃ আর শব্দ নেই। শব্দটা উবে গেল। একটা কি দুটো মুহূর্ত! আবার বাঁ কানের কাছে ফর্র্ ফর্র্। দুত্তোরি ছাই। বাঁ কানে একটা থাবাই লাগিয়ে দিলাম। যন্ত্রণায় উফ্ করে চেঁচিয়ে উঠলাম। কানের পর্দায় ভীষণ লেগেছে। কোথায় কী। ব্যথাটা নিয়ে নিজেকেই দুষতে লাগলাম।

ব্যথাটা কমে আসতেই আবার, আবার সেই শব্দ। সেই পোকার বাতাস কেটে উড়ে উড়ে বেড়ানোর একটানা ধ্বনি। কী মুশকিলে পড়া গেল আঃ। আমি যেন আর পারছিলাম না।

এবার মনে হল পোকাটা আমার বুক পকেটের ভেতর ঢুকে পড়েছে। সেখান থেকে আওয়াজটা আসছে। তাড়াতাড়ি বুক পকেটে হাত ঢোকালাম। সমস্ত কাগজপত্র বার করে আনলাম। কোথায় পোকা! আমাকে বোকা বানিয়ে আবার সে পালিয়েছে।

একটুক্ষণ চুপচাপ। ভাবলাম বোধ হয় আমাকে ছাড়ল ও। ওঃ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে সিগারেট ধরালাম। ধোঁয়ার রিঙগুলোকে কড়িকাঠের দিকে ছুড়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে ঠিক মতো বসলাম। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে মনে করতে চেষ্টা করলাম, কি ভাবছিলাম যেন?

মনে পড়ল, হ্যাঁ, আমি আমার মন নিয়ে ভাবছিলাম। আমার মন— যা আপাতত মনে হচ্ছে অবাধ্য হয়ে উঠছে।

মনটাকে বাগ মানানো খুব জরুরী। কারণ মনের সঙ্গেই সব কিছুর যোগাযোগ। মন যদি ঠিক মতো কাজ না করে তো যে কোনো মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারি। তাই এখন,

একা এই ঘরে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেলা উচিত। লোক থাকলে, ভিড় থাকলে, ব্যস্ত থাকলে এই কাজটা করা খুবই দুরূহ।

স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়েছে।

গিয়েছে না বলে, বলা ভাল তাকে কদিন আমি একটু একা থাকার জন্য ভজিয়ে-ভাজিয়ে বাপেরবাড়ি পাঠিয়েছি। জানি সে কাছে থাকলে মনের কোথায় কি বিকল হয়েছে খুঁজে পাব না।

অবশ্য সেই প্রথম আমাকে সাবধান করে দিয়েছে এই ব্যাপারে। কিছু দিন থেকেই কত আমার কথায় ও কাজে সঙ্গতি থাকছে না। তাৎপর্য থাকছে না। জল খেতে চাইলাম তো স্ত্রী জল দিয়ে গেল। জল খেতে ভুলে গেলাম। রেশনের ব্যাগ নিয়ে রেশন আনতে বেরিয়ে সেই থলেতে বাজার করে ফিরে এলাম। এই সব দেখে স্ত্রী দু এক দিন বাদে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল 'তোমার কি হয়েছে বল তো?'

একদিন তো দুজনের মন কষাকষিই হয়ে গেল। শনিবার ছিল দিনটা। অফিস যাবার সময় স্ত্রী পই পই করে বলে দিল আড়াইটেয় বাড়ি আসা চাই-ই, সে টিকিট কেটে রাখবে সিনেমার।

ঠিক আছে বলে বেরিয়ে পড়লাম। ফিরলাম রাত নটায়। বাড়ি ফিরে দেখি স্ত্রী গুম হয়ে বসে আছে। তার মুখের চেহারাটা দেখে রাগের কারণ বুঝতে পারলাম না। তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে বললাম, কী ব্যাপার, এমন মুখ ভার করে বসে আছ কেন?'

'একটা কথা বলবে না'– স্ত্রী উঠে গেল, 'ছোটলোক কোথাকার, আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না!'

আমি তো হতবাক। মাথায় কিছুই এল না। কেমন শূন্য হয়ে গেছে। তবু বললাম, 'হঠাৎ রাগ করছ কেন. কি হয়েছে আমায় বলবে তো?'

'ন্যাকা–' স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। তারপরই ডুকরে কেঁদে ফেলল, 'তোমার মত পাষাণ, হৃদয়হীন স্বামী আমি আর দেখিনি।'

তখনও আমি বুঝতে পারছি না।

'তোমাকে কটায় আসতে বলেছিলাম?' কান্না আর গালাগালির প্রথম ভাগ কমতে রক্তচক্ষু মেলে স্ত্রী জিজ্ঞেস করল।

ব্যাস সিনেমায় যাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছি। অফিস ছুটির পর এমন নয়. আমি কোনো বিশেষ কাজে আটকা ছিলাম, কিংবা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। কিছু না–বরং এতক্ষণ একা একা কার্জন পার্কের বসে মনটাকে খুঁজছিলাম। এই অব্দি ভাবতেই আবার সেই শব্দ। ফর্‌র্‌... ফরফর...অনেকক্ষন পর শব্দটা যেন এবার ভেসে এল। চোখ বুজে ভাবছিলাম। সিগারেটটা হাতে পুড়েই এসেছিল ।তাড়াতাড়ি চোখ খুলে সেটাকে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে পোকাটাকে পোকাটাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম। ঠিক করলাম, এবার

শালা পোকাটাকে শেষ করবই।

কিন্তু কোথায় পোকা! সেই ঘর, সেই সব কিছু। ঘরে বাতি জ্বলছে। আমি ছাড়া জীবিত দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই। তবু শব্দটা কানে প্রচণ্ড আর্তনাদ তুলল। ফরফর ফর্‌ফর্‌ ফর্‌র্‌ .... আঃ কী প্যাঁচেই যে পড়া গেল। দু হাত বাড়িয়ে এলো পাথারি পোকা তাড়াতে চাইলাম। কিন্তু সেই শব্দই আমাকে তাড়া করে এল দ্বিগুণ উৎসাহে। ফরফর ফর্‌র্‌ ফরফর ফর্‌র্‌ এক টানা শব্দ হতে লাগল। একঘেয়ে বিশ্রী আওয়াজ। হঠাৎ মনে হল পোকাটা আমার নাকের ভেতর লুকিয়ে পড়ল।

এবার বোধহয় পাগল হয়ে যাব। তাড়াতাড়ি নাকের ফুটোয় আঙুল চালালাম। তাড়া-হুড়োর নাকের ভেতর নখের খোঁচা লাগল। রক্তও বেরল। আহত হয়ে মনে মনে বিরক্ত হলাম। কিন্তু পোকা কোথায়– নাকের ভেতর কিছু নেই। আর শব্দটাও আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই যথারীতি আবার তার আভাষ পাওয়া গেল। শব্দ করে সে জানাতে লাগল ঘরের মধ্যেই আছে। সে আমার মাথার পেছনে মনের আনন্দে বাজনা বাজাচ্ছে। চোখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম, না নেই – তন্ন তন্ন করে দেওয়াল খুঁজলাম, টেবিলে চেয়ারে– কোথায়ও কোনো কিছুর চিহ্ন নেই।

মাথার ভেতর স্নায়ুকেন্দ্রে একটা দপদপানি বাড়তে লাগল। একি উটকো ঝামেলা বাবা! ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পায়চারি শুরু করে দিলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত করে নিলাম, হাঁটাচলা, করলে পোকাটা পালাবে নিশ্চয়।

শব্দটা আবার কমে গেল।

হয়ত সে এতক্ষণে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। মাথার বিশ্রী অনুভূতি আর স্নায়ুর দপদপানি কমতে লাগল। আবার আমি একটু একটু করে মনের ব্যাপারে ঝুঁকে পড়লাম।

সুনন্দাও বলছিল, আমি নাকি একদম ভুলো হয়ে গেছি। আমার মন বলে কিছু নেই। একদিন কথায় কাথায় সে বলল, 'তুমি ভুলে গেলে?'

'কি বল তো?' অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। অবাক হওয়ার মতই ওর চেহারা। যে টকটকে একটা আপেল। সুনন্দা আমার বন্ধুর স্ত্রী। সমরেন্দ্রবাবুকে বন্ধু ছাড়া কী আর বলব। যদিও সে আমার সমবয়সী নয়– কম পক্ষে আট বছরের বড়। সুনন্দা তার স্ত্রী আমার বয়সী।

'কি বল তো!' সুনন্দার মুখ ম্লান হল।

'আমার কথা তোমার কিছু মনে থাকে না!'

'কে বলল?'

'আমার তাই মনে হয়।' সুনন্দা তার বাইরের ঘরের জানালার কাছে সরে গিয়ে দাঁড়াল। সত্যি তুমি অদ্ভুত!' মেয়েদের মন বোঝ না, মন রাখতে হয় তাও জান না।

'আহা কি করলাম, বলবে তো?'

'আজ না আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার কথা ছিল।' সুনন্দা বড় বড় চোখ করে তাকাল।

ব্যাস মনে পড়ে গেল। সুনন্দা অফিসে টেলিফোন করেছিল। বলেছিল, আজ এস দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে যাব। অফিস থেকে বেরনোর সময়ও কথাটা মনে ছিল। কিন্তু ওর বাড়ি পৌঁছে সব ভুল হয়ে গেল। হাত-পা ছড়িয়ে আমি সুনন্দার সামনে বসে রইলাম। বেরোনোর প্রসঙ্গ তুললামই না। এমনকি ও বলার পরও পড়ল না।

'বেশ তো তৈরি হয়ে নাও।'

'না আমি যাব না।' সুনন্দা দুমদুম পা পেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, তোমার সঙ্গে মানুষে বের হয়!'

এই মন নিয়ে কি করি? অথচ জানি এমন আমি ছিলাম না। ক্বচিৎ আমার ভুল হত। আর এখন হামেশাই হচ্ছে।

কখন পায়চারি থামিয়ে আবার বসে পড়েছিলাম। কতক্ষণ আমি একা একা ভাবছিলাম জানি না। পোকার কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। মনটাও থিতিয়ে পড়ছিল। ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ কানে ভাসছে। আমার মনে হল সামনে স্ত্রী আর সুনন্দা বসে আছে। দুজনেই আমাকে দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

চিন্তাটা কেটে গেল দুম করে।

আবার সেই শব্দ। সেই পোকা! যে এতক্ষণ ছিল না, সে আবার ফিরে এসেছে। আমার সমস্ত অনুভূতি জুড়ে, তার বিশ্রী আর কর্কশ শব্দ নিয়ে। দুটো কানের পাশ দিয়ে পালা ক্রমে চক্রাকারে উড়ছে। ফরফর ফরফর ফর্‌র্‌ করে— নাঃ আর পারা যায় না। না দেখা একটা পোকার সঙ্গে কাঁহাতক পারা যায়। শেষদিকে অনুমান করে হাত পা ছুড়েছি, পোকা ঠিক তার বিপরীত দিকে। শব্দটা ঘুরে ঘুরে আমাকে যেন বিদ্রূপ করছে। সামান্য একটা পোকা আমাকে পাগল করে তুলবার উপক্রম করল।

মনে হল এই বুঝি জামার ভেতরে ঢুকল। বুকের কাছাকাছি। আবার মনে হল, না না, এবারও সেঁধিয়েছে কাপড়ের মধ্যে। এক টানে জামা খুলে ফেললাম। পরনের কাপড়ও ছুঁড়ে দিলাম। একা ঘরে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে পোকাকে আবিষ্কার করতে উঠে পড়ে লাগলাম। কিন্তু সে আমার নাগালের বাইরেই চলে গেল।

বাধ্য হয়ে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিলাম। বিশ্রী বোধটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম মন থেকে।

বিরক্তি আর অস্বস্তিতে গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। ইচ্ছে হল, দূর শালা বলে ঘর ছেড়ে এক ছুটে রাস্তায় চলে যাই। রাস্তায় নিশ্চয়ই পোকাটা আমাকে তাড়া করেতে পারবে না। ঘরের ভেতরেই পায়চারি করতে লাগলাম। হঠাৎ ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চোখ পড়ল। ছিঃ ছিঃ! ঘরের মধ্যে আমি একা দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি কি তাহলে পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি!

টেবিলের ওপর কাচের গ্লাসে জল রাখা ছিল। সেই জলের দিকে তাকালাম। টলটল করছে পরিষ্কার জল। হঠাৎ জলের ভেতর একটা মুখ যেন আমার চোখে ভেসে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সুনন্দার মুখ। সুনন্দা কী এক ব্যথায় দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য! এর মুখের ওপর, ঠিক ঠোঁটের কাছে একটা পোকা। সেই পোকাটা নাকি! যেটা এতক্ষণ আমাকে জ্বালাছে। হাত বাড়াতে যেতেই আর কিছু নেই– পোকা মুখ সব হারিয়ে গেল।

আবার মনটাকে বিশ্লেষণ করতে বসলাম। চুলচেরা বিচার করতে। এরপর আর অবসর পাব না। স্ত্রী যে কোনোদিন ফিরে আসতে পারে। সে এলে মনটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। আমি জানি, আমাকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না। ছেলেটাও না। অথচ আমি স্ত্রীর কাছ থেকে ক্রমাগত সরে যেতে চাইছি। স্ত্রীর সান্নিধ্যে মনটা কেমন গুটিয়ে পড়ছে। স্ত্রীকে ঠিক সহ্য করতে পারছি না। পুরনো ব্যবহৃত তৈজসপত্রের মত মনে হচ্ছে কিছুদিন ধরে। কবে থেকে কবে থেকে? .... কবে থেকে মনে করার চেষ্টা করতেই বিদ্রোহী মন ফিরে এল হাতের মুঠোয়। বন্ধু স্ত্রী সুনন্দার সঙ্গে পরিচিত হবার পরই এমন মনে হয়েছে।

কিন্তু সুনন্দা তো অপরের স্ত্রী। সে একজন বিবাহিতা। আমার সমবয়সী। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব বলে অভ্যাস পাল্টাবে কেন?

এই কেনর মানে কী কোনোদিন আমি বুঝেছি ? না এই মানে বুঝতে গিয়েই আমার মনটার গোলমাল হয়ে গেছে।

সুনন্দার সঙ্গে মেশবার সময় প্রতি মুহূর্তে আমার এই কাণ্ডজ্ঞান বজায় থেকেছে সে বন্ধু-স্ত্রী। বন্ধু-স্ত্রীর সঙ্গে একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত মুখ আলগা করে কথা বলা যায়। কিন্তু সেই সীমারেখা যে বিপজ্জনক তাও আমি ভেবেছি।

সুনন্দা আমার সজাগ মানসিকতাকে লক্ষ্য করেছে। হেসে হেসে বলেছে, কী ব্যাপার বল তো – তুমি এমন একটা ভয় ভয় ভাব নিয়ে থাক কেন? মনে হয় তুমি আমাকে ভয় পাও?'

'ও তোমার মনের ভুল।

'তাই বুঝি'। সুনন্দা শব্দ করে হেসে ওঠে।

ওর হাসি আমাকে চকিত করে তোলে। এই কথায় হাসির কি থাকতে পারে। সুনন্দা কী আমাকে ভীরু মনে করে! কে জানে ? অথচ সে আমার সঙ্গে সহজে মিশে পড়ে। বন্ধু জানে আমি তার স্ত্রীর কাছে যাই। হাসি গল্প করি, কথা বলি এ নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, বরং সে খুশি হয় – বেশ নিশ্চিন্ত আরামে থাকে। আহা আমি যদি নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এমন নির্ভাবনাময় কাটাতে পারতাম। তা পারি না। আবার অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে নিরিবিলি চুরি করে সময় কাটানোর সুযোগ ছাড়তে পারি না। নিজেকেই বলি বাঃ বাঃ কল্যাণ বেস তুমি! চালিয়ে যাও।

ঘরের বাতিটা অসহ্য লাগে। তাড়াতাড়ি উঠে বাতি নেভাতে গিয়ে ঘড়িতে চোখ পড়ে। রাত এগারোটা বেজে গেছে।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ি।

অন্ধকার ঘরে বিছানায় মনটা থিতোয়। হঠাৎ একটু আগের চিন্তাটা ফিরে আসে। আমি কি চালিয়ে যাচ্ছি! কি?

সুনন্দার সঙ্গে যখন গল্প করি তখন অবশ্য সময়টা একটু বেহিসাবী হয়ে যায়। এতে কী কোন অপরাধ আছে?

'তুমি কিন্তু পাপ করে যাচ্ছ।' সুনন্দা হঠাৎ একদিন বলে। পাপ'!

'হ্যাঁ পাপ।' সুনন্দার শান্ত হাসি নদীর ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে যায়। 'যা চাও তুমি মনে প্রাণে চাও না। তোমার লোভ আছে অথচ তা প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। এই অপরাধবোধ তোমাকে জ্বালাবে।'

'কোন অপরাধবোধ? কিসের লোভ? অবাক হয়ে যাই ওর কথায়।

'অত বাপু জানি না।' সুনন্দা স্পষ্ট উত্তর দিল না, মনে হল তাই বললাম।

'মনে এলেই বলতে হবে?

আমি যা করি বা বলি অকপটে করি।' সুনন্দা শাড়ির আঁচল ঘুরিয়ে উঠে পড়ল। যেন সে আর কিছু বলতে চায় না।

হঠাৎ আবার মশারির মধ্যে পোকাটা কেমন করে ফিরে এল। মাথার ভেতর বিস্ময় কিলবিল করতে লাগল। সেই একঘেয়ে শব্দ ফরফর ফর্‌র্‌ ফর্‌র্‌ ....উঃ আজ আমাকে হতচ্ছাড়া পোকাটা কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না। বিছানা থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখনো শব্দ হচ্ছে। আলো জ্বাললাম। আঁতিপাঁতি করে মশারির মধ্যে খুঁজলাম। না কিছু নেই কোথায় পোকা।

বোকার মত বিহ্বল হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কী যে করব তা বুঝতে পারলাম না। একটু বাদেই চেতনাবোধ কাজ করতে বাতি নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

আবার বিছানায় গা এলিয়েই মনে হল আমি একটা কিছু অপরাধ করছি। হ্যাঁ সেই অপরাধ আমার মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। হয়ত মন আর বসে থাকছে না। অপরাধ—স্ত্রীর মুখ ভেসে উঠল। কেমন বিষণ্ণ, বেদনা মাখানো। আবার সুনন্দার মুখ, উদাসীন। আমি কার কাছে অপরাধী — সুনন্দার না স্ত্রীর?

কোনো উত্তর মনে এলো না। শুধু পোকাটা ফিরে এল। আবার তার পাখার আওয়াজ হাজার গুণ বেড়ে গেল। সেই একঘেয়ে বিশ্রী আওয়াজ আমি শুনছি। আমার হাত-পা অবশ, বাধা দেওয়ার বা উঠে আলো জ্বেলে পোকাটা খোঁজার শক্তি নেই। ভয়ে বিস্ময়ে বিরক্তিতে বিছানার মধ্যেই আমি ঘামতে লাগলাম।

অনেক অনেকক্ষণ পর আমার মনে হল পোকাটা বাইরে নেই কী ভাবে কোন ফাঁকে আমার বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। হৃদ্‌পিণ্ডের ঠিক কাছে তার পাখা নাড়ার শব্দ টের

পাচ্ছি। সে অবিরাম শব্দের ঢেউ তুলে যাচ্ছে ফর্‌র্‌.. ফর্‌র ফরফর ...।

অদ্ভুত ব্যাপার! অদৃশ্য একটা সামান্য পোকা আমাকে কাত করে দিল, আমি হেরে গেলাম। অন্ধকারে ডুবে গেলাম। তলিয়ে যেতে যেতে মনে হল সুনন্দার মুখ কখন ছোট পোকা হয়ে বুকের ভেতর ঢুকে পড়েছে। আর তাই আমি এত কষ্ট পাচ্ছি। এত কষ্ট....

নীল নিকেতন



তুমি যেদিন তোমার হাজব্যাণ্ডের সঙ্গে বিদেশে বেড়াতে গেলে সেদিন সকাল দশটার সময় তোমার 'নীল নিকেতন'-এ না গিয়ে আমি পারিনি। সৌভাগ্য, মিস্টার ছিলেন না, অ্যামবাসাডর নিয়ে কী কাজে যেন বেরিয়ে গিয়েছেন। তার আগের দিন রাত্রেও গেছি। আবার সকালে গিয়ে হাজির হলাম। এরকম করি না। তোমার অজানা নেই যে একটু গ্যাপ দিয়ে আমি তোমার বাড়ি যাই। পাছে মিস্টারের চোখে একটু দৃষ্টি কটু লাগে। তুমি মনে মনে হাস। এ নিয়ে মুখে কিছু বলনি কোনোদিন। সকালে উঠেই মন হঠাৎ তোমাকে

দেখবার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। খালি মনে হচ্ছিল তোমার কাছে যাই। তোমার পাশে বসি। তোমার হাসি দেখি। তোমার গলা শুনি। তারপর তো ঘন্টা দুয়েক সময় কেটে গেল তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে। কত আবোলতাবোল বকলাম। কি ভাল যে লাগছিল কি বলব।

তুমি বললে, 'যাও; বাড়ি যাও। যা মনে আসে তাই লিখবে।'

আমি বললাম, 'তুমি নেই। আর কি আমি লিখতে পারব? যতদিন এখানে থাকবে না ততদিন আমি লিখতে পারব না। কে জানে, লেখার পাট বোধহয় চিরকালের জন্যেই চুকে গেল।'

'কিন্তু লিখতেই হবে যে! না লিখে তোমার মুক্তি নেই। একথা তো তুমিই কতবার বলেছ!'

'বলেছি তো। কিন্তু এরকম যে হবে, তুমি যে আমার মনে সবসময় থাকবে তা আমি আগে থেকে কেমন করে জানব!'

'তবু চেষ্টা কর। মনকে শক্ত কর। আমার যেতে ভাল লাগছে একথা ঠিক, কিন্তু তুমি সঙ্গে যাবে না, এটাও ভাল লাগছে না। অনেক বেলা হল, বাড়ি যাও।'

'হ্যাঁ যাই। এখানে ঘন্টাদুয়েক বসলাম। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। কিন্তু কি হয় জান? যেই তোমার বাড়ির বাইরে পা বাড়াব, অমনি তোমার কথা মনে পড়বে। আর সে মনে হওয়া যে কি তা আমি কেমন করে বোঝাই। খালি মনে হবে, তুমি এখানে নেই, তুমি নেই। তুমি চলে গেছ। তুমি, তুমি আর আসবে না। ম্যাডাম কি যে হচ্ছে আমার! এত ভাল লাগা একি ভাল!'

'খারাপ কোথায়? তোমার মনেও কোন পাপ নেই। আমার মনেও নেই কোন পাপ।'

'কিন্তু আমি যে বড় বেশি—'

'জানি। তার জন্যেই তো বলছি, আরও দু-তিনটে প্রেমিকার ব্যবস্থা করে ফেল না। তুমি তো লেখক। তোমার অনুরাগিনী হতে কে না চাইবে? তাছাড়া তুমি কি সুন্দর কথা বল। কি ইনোসেন্ট তোমার অ্যাপ্রোচ। মহিলাদের শ্রদ্ধার সঙ্গেতে প্রণয় জানাতে তোমার জুড়ি নেই।'

'ইয়ারকী? না?'

'আচ্ছা, ওটা করছি না। কিন্তু তুমিই তো বলেছ একবার গুছিয়ে ঠিকমত লিখতে বসতে পারলে তোমার মনের সমস্ত তোলপাড় থেমে যায়। এই যে আমি চলে যাচ্ছি, তোমার কিছু ভাল লাগছে না, এই দিয়েই শুরু কর না কেন। তুমি তো বল, তুমি যা খুশি নিয়ে গল্প লিখতে পার। বড় বেশি ব্যক্তিগত হবে? হোক না। নাই বা ছাপাতে দিলে। সেটা থাক শুধু তোমার আর আমার জন্যে। আমরা দুজনেই শুধু জানব। জগতে আর কেউ টের পাবে না। সেই গানটার মত, গোপনে তোমারে সদা কত ভালবাসি!'

'তোমাদের ট্রেন কটায়?'

'বিকেল চারটের সময়। কি সর্বনাশ! স্টেশনে যাবে নাকি? লক্ষ্মীটি এটা করো না। ওর কাছে আমার মুখ থাকবে না। এমনিতে তো, তুমি আছ, আমার অসুবিধে তুমি বোঝ না?'

'ঠিক আছে। যেতে দিলে না তুমি। তোমাকে স্টেশনে গিয়ে আরিভোয়া জানাতে কি ভাল লাগত! তারপর ফিরে আসতে অবশ্য ভীষণ কষ্ট হত। কিন্তু সে যে কি ভীষণ আনন্দের কষ্ট তুমি তার কতটুকু জান।

'জানি। আমরা অনেক বেশি জানি। তবু সব জেনেও আমাদের মুখ বুজে থাকতে হয়। লেখক এও তো তোমার অজানা নয়। যাও বাড়ি যাও, রোদ্দুরে ঘুরো না আর।'

'যাই। তোমার হাতটা একটু দেবে?'

'কেন?'

'একটু ছোঁব।'

'এতদিন যা করনি আজ তা নাই করলে!'

'বেশ। আমি তো তোমাকে ছুঁয়েই আছি।'

... তুমি লিখতে বলেছ তাই লিখছি। কিন্তু অদ্ভুত সব ব্যাপার ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। যেন পর পর সাজানো ছিল। এই যে তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপার, এর কি ব্যাখ্যা হবে? কিছুদিন আগে তুমি আমার কেউ কি ছিলে যখন দেখিনি তোমায়? আমি তো তোমাকে চিনতামই না। কিন্তু যেই তোমার সঙ্গে দেখা হল তখন সঙ্গে সঙ্গে মনে হল একে ছাড়া আমি বাঁচব না। কেন এমন হয়? এই সব ভাবতে ভাবতে তোমার 'নীল নিকেতন' থেকে বেরিয়ে মতি রায়ের ড্রাগ স্টোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি এমন সময় এই বাইশ তেইশ বছরের হবে একটা ছেলে ভীষণ মুখচোরা একটু হেসে বলল, 'আপনিই তো—তাই না'! অনেকদিন আপনাকে খুঁজছি। আপনার একটা গল্প আমাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছিল। দাঁড়ান একটু।'—বলে ছেলেটা দৌড়ে গেল ফুলের দোকানে। একটা রজনীগন্ধা মালা নিয়ে এল। তারপর লজ্জায় কিশোরীর মত লাল হয়ে বলল, 'এটা যদি আপনার হাতে জড়িয়ে দি, তাহলে কি আপনি রাগ করবেন?'

'মোটেই না।' হাসলাম ওর পাগলামি দেখে। কিন্তু পাগল তো আমিও কম নই। আমি একটা গোলাপ কিনে নিয়ে এলাম। ওর হাতে দিয়ে বললাম গোলাপের জন্যে গোলাপ! ওঃ! তখন যদি তুমি সামনে থাকতে! ছেলেটার লজ্জা দেখে হেসে অস্থির হতে তুমি। তোমাকে এ সুন্দর দৃশ্যটা দেখানো গেল না। আমাকে তো তুমি জানো, আমি ওর লজ্জাটা আরো বেশি করে উপভোগ করার জন্যে বললাম, 'এ রোজ ফর ও রোজ। ও ভন্‌ভন্‌ করে ছুটে পালাল। হাঃ হাঃ হাঃ।... এসব কথা কেন লিখছি আমি তার কি জানি। কিন্তু তুমি লিখতে বলেছ, তাই লিখে যাচ্ছি। লিখতে লিখতে একটা কিছু টের পাচ্ছি, কিন্তু সেটা যে কি ঠিক ধরতে পারছি না। দেখা যাক, লিখতে লিখতে লেখার শেষ প্রান্তে এসে

কি পাই, তুমি কি দাও।... যাক তা। তারপর কি হল শোন। আমি জানতাম না কিন্তু হয়ে গেল। যেই মালাটা হাতে জড়ালাম অমনি তুমি সামনে এসে দাঁড়ালে। সেই অনবদ্য, চেনা সুরে বললে, 'আমার থেকে তোমার মালাই বড় হল?' সেই সজল আঁখি সেই সুমিষ্ট হাসি. সেই মধুর, অতি মধুর কণ্ঠস্বর।

আমিও তোমাকে বললাম, 'মোহিনী, ছলনা জানি সব। আমি তো চেয়েছিলাম কিন্তু জড়াতে দিলে কই?' আমার কথার উত্তরে বিদ্যুৎ হেনে বললে, বীরপুরুষ। যে একটা সিনেমা নিয়ে যেতে হলে ভয়ে কাঁপে তার সঙ্গে জড়াতে আমার বয়েই গেছে।' এর জবাব আমার ঠোঁটে ছিল। কিন্তু আমি কেন জবাব দেব? তুমি কি তা জান না? এরকম মনে হতেই ড্রাগস্টোরে ঢুকে তোমাকে ফোন করলাম। তুমি ফোনে বলল কি ব্যাপার। আবার কি হল? এই তো এতক্ষণ বাড়িতে বসে বসে আমাকে দেখলে। এত দেখেও আবার দেখার ইচ্ছা! এ দুষ্টু খিদে। এ খিদে ভাল নয় লেখক।'

'জানি। আমার যে কি হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না। এতটা বাড়াবাড়ি, বোধহয় তুমি যাচ্ছ বলে।'

'কি মুশকিল! এবার আমি বকব। আমি কি চিরকালের জন্যে যাচ্ছি। ওর স্বাস্থ্যটা দেখেছ তো! খেটে খেটে শরীরটা কি করি। বুকের হাড় গোনা যায়। আমাদের একটা বাচ্চাও হল না। এত বড় এই বাড়ি। যতটা সম্ভব পালিয়ে পালিয়ে থাকা যায়। সবই তো তুমি বোঝ লেখক।'

'জানি। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। হাতে মালা এসে জুটল।'

'মালা? মালা আবার দিল কোন সোহাগী?'

– ব্যাপারটা বললাম। তারপর ম্লান হেসে বললাম, 'এ মালা এখন কাকে দি?'

ওদিক থেকে ফোনে সেই মধুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, আজ তো তেসরা জানুয়ারি। তোমাদের না সভা আছে ফরাসডাঙ্গায়। তোমার টালিগঞ্জের বন্ধু, অভিনেত্রী সন্ধ্যালীর আজই তো আস্‌বার দিন। তুমিই তো বলেছিলে। মালাটা ওকেই দিও।

আমি বললাম হেসে, 'তা না হয় ওকেই দোব যদি নেয়। কিন্তু সেই গানটা একটু গাইব?'

'কোন গানটা?'

'সেই – এত সুধা কেন সৃজিলে বিধি যদি আমারি তৃষ্ণাটুকু ফুরাবে না?'

'পাগলামি করো না তো। লেখাতে যত ইচ্ছে পাগলামি করো। কিন্তু অন্য সময় নয়। যাও, বাড়ি চলে যাও?'

'গানটা গাও না? দু লাইন। দু লাইনেই হবে।'

আসলে ওর গলার স্বরটা শোনার ভীষণ ইচ্ছে. ওহো, ওই স্বরে যে কি সুধা মাখানো। কত যে মায়া! ও গান গাইল। ফোনটা রেখে বাড়ি চলে এলাম।

আচ্ছা, তুমি সত্যি করে বলবে আমাকে লিখে রাখতে বলেছিলে কেন? তুমি কি আগে থেকে কিছু বুঝতে পেরেছিলে? তুমি কি জানতে পরের ঘটানাগুলো য় আমরা কি চাই, কাকে কাকে চাই, কতটুকু চাই– এসব সত্যিই তো, আমার লিখতে আসাও তো এই জন্যে, নিজেকে জানতেই তো। কি আমি চাই, কাকে চাই, কতটুকু চাই– এই নিয়েই তো জীবন। তারপর শোন যে ঘটনা ঘটলো। এও যেন আগে থেকে সাজনো ছিল। বাড়ি ঢুকতেই অর্পণা বলল, ব্যাঙ্কে গিয়েছিলে?'

'নাতো।'

'গ্যাস তো ফুরিয়েছে। গ্যাসে খবর দিয়েছো?'

'ওই যা!'

'কেরোসিন তেলের কথা নিতাইকে বলেছো?'

'নিতাইয়ের দোকানের পাশ দিয়েই এলাম। অথচ'–

'হুঁ'। – একটা হতাশা মেশানো দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে অর্পণা। অর্থাৎ বোঝ কি রকম লোক নিয়ে আমায় সংসার চালাতে হয়। হা রে ভাগ্য! হা রে সংসার!

'ভাত খেয়ে উদ্ধার করো। তারপর তোমার তো কোন কাজ নেই। বসে বসে ক্যাসেট শুনো।' একথার কোন জবাব হয় না। খানিক পর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে একটু নিচে গেলাম কাগজটা নাড়াচাড়া করবার জন্যে। আমার কোনদিনই কাগজ পড়তে ভালো লাগে না। লোকে যে কি রস পায় জানি না। ঘন্টাখনেক নিচে আড্ডা দিয়ে ওপরের ঘরে গিয়ে দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি ও শুধু একটা সেমিজ পরে ধবধবে শরীরটা নিয়ে ফুল স্পীডে ফ্যানের তলায় শুয়ে আছে, চাঁদের মত রূপসী মুখ, আর সেই মুখের চারপাশে শ্যাম্পু করা সোনালি চুলের রাশি উড়ছে বিস্রস্ত বাতাসে।

'ওখানে কি করছো? বাচ্চা একটা বালিকার মত ও চেঁচিয়ে উঠলো।

'কি আবার করবো?' তোমাকে এই জানলা দিয়ে দেখতে ভালো লাগছে তাই একটু চুরি করে দেখছি।'

'লজ্জা করে না? অতো বড়ো একটা লোক?'

'না আমার লজ্জা নেই। সুন্দর জিনিস, তাও আবার নিজের, দেখতে লজ্জা করবে কেন?'

'নিজের কি করে জানলে?'

'তা ঠিক। কিন্তু সুন্দর তো বটেই। তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তোমার চোখে সুন্দর ওই। তোমার উদ্দেশ্য অন্য। অসভ্য লোক, সরে যাও।'

'আজ রাত্তিরে কিন্তু। বলে দিলাম আগে থেকে। তোমার তো আবার মনে মনে তৈরি হতে সময় লাগে।'

'ছিঃ ছিঃ। বুড়ো হয়ে মরতে চলল! ছিঃ ছিঃ।'

আমি ওর ঘেন্নাকে আমলই দিলাম না। মেয়েরা কত ওরকম করে। ওকে বলে 'ন্যাকরা'।

'রাত্তিরে কিন্তু ফের মনে করিয়ে দিলাম। দরজায় ছিটকিনি দিও না।'

'এই রে! পাগল হয়ে গেছে একেবারে! পাশের বাড়িতে লোক গিজগিজ করছে। মানসম্ভ্রম আর কিছুই রাখলে না।'

'না পেয়ে পেয়ে, বুঝলে। না পেলে মামুষ এরকম হয়ে যায়। মানুষের সবকিছু দরকার।'

'আমার দরকার নেই।'

'তা অনেকদিন জানি আমার সঙ্গে নেই তা জানি। কিন্তু অন্য কারুর সঙ্গে'—

'ছোটলোক, অতি ছোটলোক। যাও চলে যাও সামনে থেকে। মা গো মা একটু নিজের মনে একলা হয়ে শুয়ে থাকবো তাও লোকটার জন্যে পারবো না!'-ও কেঁদে উঠল সত্যিকারের কান্না। আমার এই। একজনের আছে শরীর। মন আরেকজনের কাছে। যার কাছে শরীর, তাকে দিতে পারিনি মন। যাকে মন দিয়েছি তাকে দিতে চাইনি শরীর। আমার এরকম। কেন এরকম?

... সন্ধ্যে বেলায় যখন ফরাসডাঙ্গা যাবো বলে ট্রেনে চাপলাম তখন মনে হল এখন তুমি কোথায় কতো দূর। ট্রেনে, জানলার ধারেই ঠিক বসেছো, তোমার আবাঁধা চুল উড়ছে হাওয়ায়, মুখ থেকে সেই চুল দু হাতে সরাতে সরাতে কার কথা ভাবছো— জানতে পারি কি? আমি বড়ো আনফরচুনেট। থিংক অফ মি সাম টাইমস। আমি ধন্য হয়ে যাবে।

এ আমার খুব পরিচিত জায়গা, এই ফরাসডাঙ্গা। এখানকার ছেলেদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গজিয়ে গেছে। এদের এখানে কাজে কাজেই আমাকে আসতেই হয়। তাছাড়া কি যেন একটা ভূমিকা আছে আমার আজকের এই সভায়। ওহো, বক্তৃতা দিতে হবে। আর সভাপতিত্ব করতে হবে। তার মানে একটা শক্ত চেয়ারে আরো শক্ত হয়ে ঘন্টা তিনেক কাটানো পায়ের তলায় কামড়ানো মশা মারতে মারতে। কিন্তু কি ভালো হয় যদি বক্তৃতার সভাপতিত্ব থেকে এরা আমাকে রেহাই দিতো। এই সময়টা ফরাস-ডাঙ্গায় কোন একটা অচেনা চায়ের দোকানে বসে তোমার কথা ভাবতাম আমি। এমন তো কতোদিন হয়েছে। কি ভালোভাবে কেটে যেত সময়। কি ভালোভাবে সঞ্চালী এসে গেছে? সঞ্চালী মিত্র? তুমি বলেছিলে মালাটা ওকেই দিতে? আমি তোমার কথা তো অক্ষরে অক্ষরে মানি। তবু মালা আনতে ভুলে গেলাম কেন? সকালে যে মালা সেই তরুণ যুবক জড়িয়ে দিয়েছিল আমার হাতে। এর মধ্যে তা কি বাসী হতে পারে? তবে তোমার কথা আমি মানলাম না কেন?

'এই যে, এসে গেছেন। চলুন চলুন। কলকাতার ওরা কখনো আসেনি।' — সভার কাছাকাছি পৌঁছতে সভার ছেলেরা আমাকে ঘিরে ফেলল। সচরাচর রাস্তায় পা পড়লেই আমি একটু অন্য রকমের লোক হয়ে যাই। চলার গতি হয় দ্রুত ও অনিশ্চিত। ওরা

চেঁচিয়ে বলল, 'এই, এই। ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন! ওদিকে শুড়িখানা। ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। না, খাপ্যাকে নিয়ে আর'–

বলতে না বলতেই মার্কারি আলোর তীব্র ঝলকানির নিচে একটা ম্যাটাডোর এসে থামলো ব্রেক কষে। ঐ ম্যাটাডোরের থেকে সঞ্চালীর হাজব্যাণ্ড অনুনয় ওর সুন্দর মুখটা বাড়িয়ে,'এই যে লেখক, এই যে। উঃ, খুব লোক যা হোক। আমার দিকে তাকাতে বলছি না। ও খুব জানি আপনি ভুলেও আমার দিকে তাকাবেন না। আপনার বন্ধু এসেছেন। তাঁর দিকে একটু দেখুন।'

সঞ্চালী ম্যাটাডোরের বোধহয় একেবারে ভেতরে বসেছিলেন। উনি গাড়ির দরজার কাছে এসে ওঁর লাবণ্যময় অপরূপ মুখটা বাড়ালেন। 'এই যে লেখক! আসুন, আসুন। আমায় একটু ম্যাটাডোর থেকে নামিয়ে নিন না।' আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওঁর ধবধবে ফর্সা, দীর্ঘ, অনাবৃত বাহুখানি বাড়িয়ে দিলেন। আমি যত্নে নাবালে কি হবে, সঞ্চালী ঠিক সঞ্চালীই আছেন, উচ্ছল হেসে বললেন, 'একি! মেয়েদের এত কথা লেখেন আর তাদের হাত কি করে ধরতে হয় জানেন না? সত্যি!' আমি তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক চেয়ে আণ্ডার টোনে বললাম, 'মেয়েরা আর তেমন করে তাদের হাত ধরতে দিলেন কই?'

'কেন, আপনার স্ত্রী দেননি।' উনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওঁর কুহক মেশানো দৃষ্টি আমার ওপর রাখলেন। 'রিয়েলি?'

আমি আর কি বলি, মাথা চুলকে বললাম, 'ম্যাডাম, আপনি তো মেয়েদের কথা বলেছেন! স্ত্রী কি মেয়ে নাকি! স্ত্রীরা কেবলমাত্র স্ত্রী। যেমন পুরুষরাপুরুষই কেবল! জবাব দিতে যাচ্ছিলেন সঞ্চালী, এমন সময় ভারী চেহারা নিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে পরবর্তী যাত্রী, ইনি সুগায়ক, বহুবার দেখেছি, নামটা মনে রাখতে পারি না, নেমেই অনুনয়ের দিকে চেয়ে মজা করে বললেন, 'লেখক, আপনি কি বামঘেঁষা পার্টি!' আমার জবাব দেবার আগেই অভিনেতা অনুনয় কপট বিরক্তি নিয়ে বলল, 'আর বলো না তনুদা। একে একে আমার সমস্ত ফ্যানদের উনি কব্জা করেছেন। আমি আলাপ করিয়ে দিই ভদ্রতা করে। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর লম্বা চিঠি চলে যায় তাদের কাছে।'

'আমাকেও চিঠি দেবেন নাকি?' গায়ক সম্ভবত বোতল -পার্টি, ওঁর রসে ঢুলুঢুলু চক্ষু সেই কথা বলে। অনুনয় তাড়াতাড়ি বললেন, 'ছেলেদের উনি চিঠি দেন না ও ব্যাপারে একটু যে চক্ষুলজ্জা থাকবে তাও নেই। মেয়েদের চিঠি লেখার ব্যাপারে উনি একজন বিশেষজ্ঞ, অথরিটি বলতে পার।' যাই হোক সভা থেকে অনতিদূরে, একটি বাড়িতে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম। যে বড় ঘরটিতে আমাদের বসতে দেওয়া হয়েছে, কোথায় বসবো ভাবছি, সঞ্চালী ওঁর পাশে আমাকে ডেকে নিলেন। অভিনেতা কপট রেগে উঠে বললেন, না না। না। এ অত্যন্ত অন্যায়। এ খুব অন্যায়। লেখক, আপনার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। দেখছি অনেকদূরে প্রসিড করছেন। আমারই চোখের ওপর আমারই স্ত্রীর পাশের

আসনটি মানে বাঁদিকেরটি আপনি দখল করেছেন। সাবধান, আমি সহ্য করব না এসব'- সঞ্চালী অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঠোঁটে ছলনা জাগিয়ে বললেন, 'কি লেখক মশাই, আমাকে ইলোপ করার দিন তারিখ সব ঠিক করে রেখেছেন তো। না ওর ভয়ে পিছিয়ে যাবেন!'

—এই চলছে, এই চলছে অনবরত, এঁরা দুটিতে যখন যেখানে যান এই ধরনের মজায় নিজেরাও সব সময় মজে থাকেন, অন্যদেরও মজিয়ে ছাড়েন। কিন্তু আমি আজ কিছুতেই এসবে মন বসাতে পারছি না। আমি সবই দেখছি, শুনছি, কিন্তু কিছুতেই এরকম সরস, উপভোগ্য আলোচনায় যোগ দিতে পারছি না। কোথাও যেন একটা গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

'কি ভাবছেন লেখক? সেই তখন থেকে দেখছি আপনি অন্যমনস্ক!'— সঞ্চালী ঠিক ধরেছেন।

আমি কি জবাব দেব ভাবছি উনি নির্বাক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকালেন আমার দিকে, তারপর হঠাৎ বিপুল হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আহারে বেচারী! ফুলের জলসায় তাই কবি নীরব! ভাবখানা এই, সহে না সহে না এই ফুল ঝামেলা, তাই নয় কি লেখক!' মজার গন্ধ পেয়ে অনুনয় নিজের কোচ থেকে উঠে এলেন, 'সঞ্চালী, বামঘেঁষা এক পার্টি আবার একটা কেস করেছে নাকি!'

'পুরনো কেস। বলে ঘাড়ের পেছনে দিয়ে হাত দিয়ে চুলের বিনুনি খুলে সারা পিঠময় চুলের বিচিত্র ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিয়ে উনি বললেন, 'বলুন না লেখক! আমি তো আপনার সেই তার নাম জানতে চাইছি না। শুধু বন্ধুকে বলুন, ব্যাপারটা আমি ঠিক ধরেছি কি না?'

'ঠিক জানি না।'— বলে আমি আবার নিজের মধ্যে ডুবে গেলাম। চারিদিকে এত মালা, এত আলো, জানলায় দাঁড়ানো খোপায় জড়ানো ফুল নিয়ে কৌতূহলী নারী, অভিনেতা অনুনয়, অভিনেত্রী সঞ্চালীর এত মধুর বন্ধুতা— এসব আমি দেখছি না, আমি দেখছি গাঢ় অন্ধকারে ধাবমান এক বিশাল ট্রেন, সেই বিশাল ট্রেনের একটি বিশাল কক্ষ, সেই কক্ষের এক বিশেষ জানালা, সেখানে ও বসে আছে, আবাঁধা চুল বারে বারে ওর মুখে এসে পড়ছে আর ও তার চাঁদের মত সুন্দর মুখ থেকে দুহাতে চুলের গোছা সরাতে সরাতে না জানি কার কথা ভাবছে এই রাত্রে, এই তমসায়। সে কি আমি। সে কি আমি! সে কি আমি! কিন্তু রসিকতা চলছে পুরোদমে, এরই মধ্যে সঞ্চালী একবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, দর্পণে প্রতিফলিত নিজের প্রতিমার দিকে তাকালেন, তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার মত তাকেই তীব্র কটাক্ষ হানলেন। এমন সময় এল ক্যামেরাম্যান, উনি চলে এলেন ওঁর সীটে, অনুনয়কে জায়গা করে দেব বলে আমি উঠে দাঁড়াবো কিনা ভাবছি, সুরসিকা আমাকে উঠতে দিলেন না, মধুর ভঙ্গীতে আরো মধুরতা ঢেলে বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটা ফটোতে একটু থাকতে দিন প্লিজ। নো অনুনয়, নো। ও চেষ্টা করো না। ওই মেয়েটিকে অনেকক্ষণ ধরে ফলো করছে তোমার চোখ। তুমি বরং ওকে পাশে বসাও। লজ্জা কি, লজ্জা কি অনুনয়, আমি বরং গর্বিত, এ জন্যে যে আমার হাজব্যাণ্ডকে বাংলাদেশের এত মেয়ে পছন্দ করে!'

.... সভা চলেছে। আর বসলে আমার চলবে না। কাউকে কিছু না বলে স্টেশনে এলাম। সাড়ে দশটার গাড়ি। স্টেশনের পর স্টেশন। পর পর কয়েকটি চলে গেল। এইবার আমাদেরটা এলো। নাবলাম। নাবতেই মনে হল, আমি গাড়িতে নেই আর, তুমি কিন্তু এখনো গাড়িতে। কতোদূর যাবে তাও তো বলে গেলে না। ভালো হয়ে থেকো। অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে বসো না আবার। যতখানি আনন্দ করবার, ততখানি আনন্দ পাওয়া চাই। আর আনফরচুনেট আমার কথা মাঝে মাঝে ভেবো। থিঙ্ক অব মি সাম টাইমস। কিন্তু তাই তো, স্টেশন থেকে নেবে সাইকেলে এ আমি চলেছি কোথায়? মাইলখানেক যাবার পর আমার হঠাৎ মনে হল আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম সম্পূর্ণ আমার অজান্তে যে পাড়ায় তোমার বাড়ি, তোমাদের সেই 'নীল নিকেতন' সেই পাড়ায় নির্জনতা আর ঠাসা অন্ধকারে আমি ঢুকে পড়েছি।

তুমি বলেছ যা মনে আসবে তাই লিখে রাখতে। হোক তা বড় বেশি ব্যক্তিগত, নাইবা ছাপাতে দিলে, লিখতে থাকলে তুমি অন্যমনস্ক থাকবে। অন্যমনস্ক থাকলে আমার বিরহ, যে কদিন আমি থাকব না, খানিকটা ভুলে যেতে পারবে। ... কিন্তু এ আমার কি হল? সত্যি সত্যি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি নেই, এ তো বড় বেশি জানা, তবু রাত্রির এই সময়ে এখানে কেন এলাম? কে, কে এখানে আমাকে নিয়ে এল? ওই তো নেমপ্লেটে তোমারই দেওয়া অবিরাম নাম জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, 'নীল নিকেতন'। হঠাৎ গেটে ঝোলানো বড় তালাটির দিকে নজর চলে গেল। সে নেই, সে নেই, যে ছিল আমার। মনটা ডুকরে কেঁদে উঠল। নিস্তব্ধ, প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকালাম। বিশাল বাড়িটার সমস্ত দরজা জানলা অষ্টেপৃষ্ঠে ভেতর থেকে বন্ধ। একটু ফাঁক নেই কোথাও। গোটা বাড়িটা অন্ধকার। অন্ধকার আর নিঃশব্দ। আমি সব জানি, তবু কি এক আবেগে মনে হল ভেতরে ঢুকে একবার কড়া নাড়ব? জানি তো, যে ভেতরে নেই সে কিভাবে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াবে হাসিমুখে ঠিক পুরনো দিনের মত? কিন্তু সে নাই বা এল, আমার দরজার কড়া নাড়তে অসুবিধে কোথায়? আর আমি তো, তোমার সঙ্গে যেদিন থেকে পরিচয়, ওই একটা কাজ করে গেছি। তুমি তো জান, কতবার, কত ছলে বিরামহীন কড়া নেড়ে গেলাম কতদিন। প্রিয় আমার, তুমি সব শোনার পরও, কোন দিন 'ভেতর ' থেকে 'বাইরে' এলে না কি এক দুর্বোধ্য কারণে। তাহলে? আজই বা কি নতুন হল? কড়া নাড়ব না কেন?... এ পর্যন্ত লিখে আজকের সমস্ত ঘটনা আমি মনে মনে তন্নতন্ন করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। কিছু কি বাদ পড়ল? কি দিতে বাকি রাখলাম তোমায়? আমার সমস্ত প্রেম, সমস্ত আনুগত্য, আমার হৃদয়— কি দেওয়া হল না? টালিগঞ্জকে দিয়েছি নির্মল অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, অপর্ণাকে দিয়েছি সংসার আর এই শরীর, আর মহারানী, তোমার পায়ে রাখলাম আমার সম্পূর্ণ মন যা মালা হয়ে জড়িয়ে গেল আজীবন। তবু যে কথাটা লেখবার জন্য এত আয়োজন, সেই শেষ কথাটা যা লিখতে লিখতে এইমাত্র আমার কাছে ধরা পড়ল, যেন সাজানই ছিল, ছিল চোখের সামনেই, ঠিক যেন পর পর,

ঠিক পর পর, এতদিন ধরা পড়েনি। আজ যখন তুমি এ শহর ছেড়ে চলে গেলে দূর বিদেশে, সেই আজই, বলতে গেলে এখনই রাত্রির এই প্রহরে, আমার টেবিলে কখন বসে লিখছি মোমবাতির কম্পিত আলোয়, তখন জানা গেল। আমি কি চাই, আমরা কি চাই। আমি চেয়েছি স্ত্রী। পেয়েছিও। অমন স্ত্রী কারুর ভাগ্যে জোটে না। এরপরও আমি চেয়েছি একজন বন্ধু। আমি পেয়েছিও। আনন্দে, উল্লাসে, মজায় আবার দুঃখে, দহনে, পরামর্শে এমন সহৃদয় বন্ধু কখনো দেখিনি। কিন্তু তারপরেও কিছু থেকে যায়, অনেক, অনেক থেকে যায়। তারপরেও আমি চাই একজন প্রেমিকাকে, যে আমার চোখের জল। তাকে কি আমি পেয়েছি? এদের একজনকেও বাদ দেওয়া যাবে না, এদের প্রত্যেককে নিয়েই এ জীবন, এই মধুর রহস্যঘেরা অদ্ভুত জীবন। বলতে কি দূর বিদেশের নারী, তোমারও কি তাই মনে হয়? তুমি স্বামী চেয়েছ, পেয়েছও। সেদিক দিয়ে তোমার অতৃপ্তি নেই। তুমি চেয়েছ বন্ধু, পেয়েছও। মন হিতাকাঙ্খী বন্ধু বুঝি হয় না। কিন্তু তার পরেও কিছু থেকে যায়। থাক অনেক অনেক থাকে, যার নাম প্রেম। তুমি পেয়েছ কি তোমার প্রেমিকাকে? সেই ছন্নছাড়া দেবদাস, যে তোমার চেখের জল? পেয়েছ কি? যতক্ষণ উত্তর দেবে না ততক্ষণ আমি কড়া নেড়ে যাব। আমি কড়া নেড়ে যাব। আমি কড়া নেড়ে যাব।

তুমি বলবে কি?

ভয়



সন্ধ্যায় আবার আকাশ কালো করে মেঘ, তারপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি এল। আজ সারাটা দিন এরকম চলেছে। এবার খুব আগাম-আগাম বর্ষা আসছে, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে খবর ছিল। রোজ রাতে টিভির পর্দায় একটা রোগা লম্বা লোক দেশের মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে, 'তুরন্ত মোসুম আনে লগি। বে অব বেঙ্গলসে ডিপ্রেসান। পচ্ছিম বঙ্গালমে বহত জোর বর্ষায়গি।' কৃত্রিম উপগ্রহের পাঠানো ছবির ওপর ধ্যাবড়া শাদা ছোপ। হাওয়া-বাবুদের হলেও হতে পারে গোছের জ্যোতিষচর্চা নয়, ক্যামেরার চোখ।রাতভোর দিনভোর বৃষ্টি রাগিয়ে দিচ্ছে মানুষকে।

কেকা জানালায় বসে বৃষ্টি দেখছিল। মৃণা এসে বলল, 'সেই গানটা কী যেন রে বড়দি? বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি...'

কেকা বলল, 'আবার তুমি জ্বালাতে এলে ? বেশ তো টিভি দেখছিলে বাবা !'

'ভ্যাট ! খালি খানকতক বুড়োর বকবক। গান নেই ফান নেই।' মৃণা পাশ ঘেঁসে বসে জানালার রড আঁকড়ে ধরল ব্যালান্স রাখতে। তারপর গুনগুন করতে লাগল।

কেকা বলল, 'মিনু! ভাল হবে না বলছি।'

মৃণা ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'যা বাবা! হঠাৎ হল কী তোর ? অন্ধকারে ভূতের মতো চুপচাপ বসে আছিস দেখে তোকে সাহস দিতে এলাম।' তার মুখের একপাশে নিচের রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকে টেরচা হয়ে খানিকটা বৃষ্টিভেজা আলো পড়েছে। চোখে চাপা হাসি থরথর করছে। তারপর আর চেপে রাখতে পারল না হাসিটা।

কেকা রাগ করতে চাইছিল। কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে হেসে ফেলল। 'কী বললি যেন ? সাহস দিতে না কী ?'

'হুঁ। তুই যে যখন তখন কী সব দেখতে পাস, আর চ্যাঁচামেচি করে হুলুস্থূল বাধাস।'

'যাঃ ! সে তো স্বপ্ন। ওই একবার মোটে।'

স্বপ্ন ? তখন কিন্তু স্বপ্ন বলিসনি বড়দি ! মনে করে দ্যাখ। বলেছিলি কে একটা লোক তোর বিছানার পাশে....'

'মিনু ! ভাল হবে না বলছি !'

মৃণা আবার হাসতে লাগল। বলল, 'আমি সত্যি বুঝি না বড়দি, এত যদি ভয় তোর, অন্ধকারে এমন চুপচাপ বসে থাকিস কেন ? একা এমন করে বসে থাকতে ভয় করে না- হাসি মুখে কিছু বললেই যত ভয় তোর।'

কেকা আস্তে বলল, 'থাম তো তুই ! বৃষ্টি দ্যাখ।'

মৃণা জালানার রডে নাক ঠেকিয়ে একটু দেখে নিয়ে বলল, 'দেখলাম। দেখার মতো জিনিস নয়। রাস্তায় জল জমেছে। আর ঘণ্টাখানেক যদি চলে, কী হবে জানিস? কাল সকালের প্রোগ্রাম মাটি। আমার যাওয়া বন্ধ। রিকশো ভাড়া চাইবে মোড় অব্দি পাঁচ। ব্যাস। হয়ে গেল।'

'কাল কী আছে রে তোর?'

'আমার প্রাইভেট ব্যাপার তোকে বলব কেন? তোর তুই বলিস ? জীবনে বলেছিস কখনও ?'

তিতি ঢুকে বলল, 'ওম্মা। তোরা অন্ধকারে কী করছিস ওখানে ?' বলে সে খট করে সুইচ টিপল। কিন্তু আলো জ্বলল না। অথচ সব ঘরে আলো আছে, সে খটখট করে বারকতক সুইচ টিপে বলল, 'এ কী বড়দি ! আলো জ্বলছে না কেন ? মেজদি, তুই তো- সব কিছুতে এক্সপার্ট। দেখে যা তো।'

মৃণা বলল, 'নাও ! এবার ওটার পেছনে লাগল। জ্বলছে না জ্বলছে না। তোর কী সর্বনাশ হচ্ছে তাতে ?'

কেকা এতক্ষণে বলল, 'জ্বলছে না ?'

তিতি ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। চাপা সুরে বলল, 'নিশ্চয় তোমরা কিছু চক্রান্ত করছিলে চুপিচুপি আমাকে নিয়ে। আমি বাবা ডোন্ট কেয়ার। হুঁ, ভয় দেখাবে তো ? যত খুশি দেখাও না, আমি রেডি।'

পিঠাপিঠি তিন বোন। চেহারা প্রায় একইরকম—রোগা ছিপছিপে, পাতা চাপা ঘাসের মত রঙ। মাথার চুলে সামান্য তারতম্য আছে এই যা। বয়স যথাক্রমে তেইশ, বাইশ আর কুড়ি। কোনো ভাই নেই। শহরতলীর গা ঘেঁসে যে রেললাইন গেছে, তার নিচে বিশাল এক ঝিল, ঝিলের ধারে খেলার মাঠ, মাঠের ধারে এই দোতালা পুরনো বাড়ি। নিচের তলায় একদঙ্গল ভাড়াটে। দোতালার পাঁচটা ছোট বড় ঘর নিয়ে কেকা, মৃণা, তিতি আর তাদের বাবা সত্যেশ্বর, মা বৈজয়ন্তী, বিধবা পিসিমা সুহাসিনী, সত্যেশ্বরের দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে মনীশ—সে ল পড়ছে সান্ধ্য ক্লাসে এবং দিনে চাকরি করে, কাজের মেয়ে সন্ধ্যা আর কাজের ছেলে ভানু থাকে। সংসারটা বেশ বড়ই। সত্যেশ্বর রিটায়ার করেছেন চাকরি থেকে। মেয়েদের বিয়ের ভাবনায় বিপন্ন। কেকা বি এ-তে আটকে গেছে। মৃণা পাশ করেছে টেনেটুনে। তিতি এখনও লড়ে যাচ্ছে। সামনের বছর বি এ পার্ট-টু দেবে।

তিন বোনে খুনসুটি, ঝগড়া, হাসাহাসি, আবার রাগারাগি, আবার ভাব—এইরকম মেঘ-রৌদ্রের খেলা সারাক্ষণ। আগে মারপিটও বেধে যেত। তবে সেটা সন্ধ্যার দিকে হলে সুহাসিনী এসে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেই সব চুপ এবং আলো জ্বললে দেখা যেত, তিনটিতে জড়াজড়ি হুমড়ি খেয়ে বিছানায় পড়ে আছে, নয়তো দেয়ালে ঠেস দিয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। বৈজয়ন্তীর মতে, তাঁর ননদ সুহাসিনীই ভূতের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে ওদের মগজ বিগড়ে দিয়েছেন। সুহাসিনী আবার দিনদুপুরেই ভূতপ্রেত দেখেন। দিব্যি গম্ভীর মুখে বর্ণনা করে চলেন। কেউ বিশ্বাস করল না করল, ওঁর বয়েই গেল।

তিতির কথা শুনে মৃণা ভারী গলায় বলল, 'তিতি ! পড়াশোনা ছেড়ে ইয়ার্কি দিতে এসেছে কিন্তু। বলছি দাঁড়াও বাবাকে।'

বাবা-মা, পিসিমা টিভি দেখছেন ওপাশের বড় ঘরে। কিচেনের দরজায় দাঁড়িয়ে হাপিত্যেশ করছে সন্ধ্যা। মাঝে মাঝে খুন্তি দিয়ে নেড়ে আসছে আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট। এরপর রুটি বেলতে বসবে। তার ভাগ্যে টিভি দেখা নেই। পিসিমার পায়ের কাছে বসে প্যাটপ্যাট করে ছবি দেখছে ভানু। গ্রামের ছেলে। তার আনন্দ মানুষের ছায়াবিম্ব দেখে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাকে ডাকতে গিয়ে বেজার হয়ে ফিরে আসছে।

তিতি উদাস গলায় বলল, 'বৃষ্টির সময় পড়তে ভাল্লাগে না রে মেজদি।' তারপর দিদিদের মাঝখান দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'তোরা নিশ্চয় কিছু দেখছিলি। তাই না?' বল না আমাকে কী দেখছিলি ?'

মৃণা বাঁকা হেসে বলল, 'একটা কঙ্কাল ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।'

কেকা বলল, 'আঃ! আবার ?'

তিতি বলল, 'বলুক না। আমি ডোন্ট কেয়ার। ইশ ! কী বৃষ্টি রে! ফ্লাড এসে যাবে সেবারকার মত। মাঠ-ঝিল একাকার হয়ে যাবে। উঃ ! দারুণ ! কালোদারা নৌকো আনবে। শুধু একটি ভয়—' সে হঠাৎ থেমে কী দেখতে লাগল। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'ও মেজদি ! ওই দেখ, সত্যি কে যেন দাঁড়িয়ে আছে এদিকে তাকিয়ে।'

মৃণা চমকে উঠল। নিচের রাস্তাটা কিছুটা এগিয়ে খেলার মাঠের ধার দিয়ে ঘুরে বস্তি পেরিয়ে রেললাইন পেরিয়ে চলে গেছে। রাস্তার ওধারে টালিখোলার বস্তিটা শুরু। বস্তিটায় ডি সি বিদ্যুৎ। লোডশেডিং চলছে। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট আর এদিকটায় এ সি। ভোল্টেজ মাঝে মাঝে কমে যায়। বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার আলোটা তত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। তাহলেও মৃণা কাউকে দেখতে না পেয়ে তিতির কান টেনে দিল। 'তুই পিসিমা হয়ে গেছিস দেখছি কই ? কোথায় কে ?'

তিতি বলল. 'ওই তো ! মেজদি ! লোকটা যেন হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। অবিকল তাই মনে হচ্ছে।'

মৃণা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'শাট আপ !'

কেকা চুপচাপ বসেছিল। আস্তে বলল, 'ও তো অরুণদা।'

মৃণার বুক ধড়াস করে উঠল। কিন্তু সে যে ভয় পায়নি, তা প্রমাণের জন্য জানালার ভেতর একটুখানি হাত বাড়িয়ে এবং কষ্টকর হেসে বলল, 'ঠিক আছে। অরুণদাকে ডাকি। এসে তোদের ঘাড় মটকাক। আমি বসে বসে দেখি।

তিতি বলল, 'না রে ! অরুণদা কেন হবে ? একটা জ্যান্ত লোক। নিশ্চয় কোনো মাতাল। নয় তো ভিখিরি।'

কেকা বলল, 'না, অরুণদা।'

মৃণা বলল, 'যা বাবা ! আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তিতি, কোথায় রে ?'

তিতি বলল, 'ওই তো ল্যাম্পপোস্টের ধারে।'

'ভাট ! কিচ্ছু নেই।'

কেকা আবার বলল, 'অরুণদা দাঁড়িয়ে আছে।'

তিতি বলল, 'দাঁড়া, পিসিমাকে ডেকে আনি।'

মৃণা ওকে টেনে ধরল। 'না। আর তাহলে ঘুমুতে পাব না সারারাত ! জ্যান্ত হোক আর মড়া হোক, পিসিমা তার সঙ্গে আরও একগাদা ভূত টেনে এনে কেলেঙ্কারি করে ছাড়বেন। তুই আর বড়দি দেখছিস, সেই যথেষ্ট। প্রাণভরে দ্যাখ।'

তিতি বলল, 'সত্যি দেখতে পাচ্ছিস না মেজদি ?'

'না। আমার বাবা তোদের মতো অত দৃষ্টিশক্তি নেই।'

কেকা আপন মনে বলল, 'অরুণদার মতলব ভাল নয়।'

মৃণা খাপ্পা হয়ে বলল, 'বড়দি ! বৃষ্টি দেখছিস, দেখছিস। এর মধ্যে অরুণদা টরুণদাকে টেনে আনলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি ! আফটার অল য়ে মারা গেছে. তাকে নিয়ে ঠাট্টাইয়ার্কি আমার ভাল লাগে না।'

অরুণ ছিল পাড়ার ছেলে। এ বাড়ি প্রায় আসত-টাসত। সবাই জানত হয়োতা মৃণার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। শুধু কেকার মুখ চেয়ে একটু ইতস্তত করা। তাছাড়া অরুণেরও চাকরি ছিল না।

ছিল না, কিন্তু সে রোজগার করত নানাভাবে। পাড়ায় তার বদনাম ছিল মস্তান বলে। গত মাসে প্রচণ্ড এক গরমের রাতে, কেবল ফল্ট হয়ে সারারাত বিদ্যুৎ বন্ধ ছিল, তার শ্বাসনালী কেটে ঝিলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। মৃণা দেখতে যায়নি। গিয়েছিল কেকা আর তিতি। বডি জল থেকে ওঠানো অব্দি দুই বোন সেখানে ছিল। বৈজয়ন্তী কপালে দুহাত জোড় করে ঠেকিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, 'ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্য।'

বৃষ্টিটা নাটকীয় মোড় নিল এতক্ষণে। হঠাৎ কালো আকাশ চিড় খাইয়ে ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ ডাকল। তিন বোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল। এই সময় পিসিমা সুহাসিনী ভাইঝিদের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে এ ঘরে চলে এলেন। কিন্তু আলো নেই দেখে থমকে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, 'কেকা! মিনু! তিতি! আছিস নাকি সব?'

মৃণা বলল, 'আছি পিসিমা !'

'আলো নেই কেন ঘরে ? কী অদ্ভুত কাণ্ড তোদের বাপু ! তার ওপর বাজ ডাকছে, আর অমন করে জানালার ধারে বসে আছিস সব ? সরে আয় ওখান থেকে।'

সুহাসিনী তিতির মতো খটখট করে বারকতক ব্যর্থ সুইচ টিপে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'আ মলো ! এ আবার কী ? ও কেকা ! ও মিনু ! ও তিতি !'

তিতি কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'পিসিমা, দ্যাখ গে যাও ! ল্যাম্পপোস্টের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল।'

সুহাসিনী মারমুখী হয়ে এগিয়ে গেলেন। 'ও আবার এসেছে? সাহস তো কম নয়। কই? কোথায় সে হতচ্ছাড়া বাঁদর ? দেখাচ্ছি মজা।' বলে জানালার রডের ফাঁকে নাক বের করে দিলেন।

কেকা ও মৃণা উঠে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টিটা সমানে ঝমঝমিয়ে ঝরছে। রাস্তার জলে হালকা আলো হলুদ কাপড়ের মতো পড়ে আছে, কাঁপছে তিরতির করে। ওপাশের বস্তিঘরে মিটমিটে কয়েকটা আলো জ্বলজ্বল করছি। তারপর আবার চিড় খেল কালো আকাশ। মেঘ ডাকতে লাগল। সুহাসিনী তক্ষুনি সরে এসে বললেন, 'আমাকে দেখেই পালিয়ে গেছে। আয় তোরা, ওঘরে গিয়ে বসবি সব। মনা (মনীশ) আসুক, সুইচটা দেখে দেবেখন।'

মনীশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভনিং ক্লাস করে ফেরে সাড়ে নটা বা দশটায়। আজ খুব বিপদে পড়বে বাড়ি ফিরতে। এই এলাকায় একটু বৃষ্টিতেই এককোমর জল জমে যায়। ট্যাক্সি তো

সন্ধ্যার দিকে এদিকে আসতেই চায় না। যদি মনীশ শোয়ালদার ট্রেনে চেপে আসে, স্টেশন থেকে এটুকু রাস্তা জল ভেঙে আসা তার মত বাবুর পক্ষে কঠিন। রিকশো এমন সব রাতে বিশ টাকা হাঁকলেও অবাক হওয়া চলে না।

কেকা বলল, 'বেশ তো আছি এ ঘরে। টিভির বকর বকর আমার ভাল লাগে না।'

মৃণাও বলল, 'তুমি টিভি দেখ গে পিসিমা। আমরা বৃষ্টি দেখি।'

তিতি দোনামোনা করে বলল, 'আলোটা জ্বললে ভাল হত। পিসিমা, বরং একটা মোম খুঁজে নিয়ে এস না তুমি!'

এক পাশে তিন বোনের জন্য দুটো খাট জোড়া দিয়ে বিশাল বিছানা। ওপরে পুরনো ফ্যানটা ঘড়ঘড় শব্দে ঘোরে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা টেবিলল্যাম্প আছে। চমৎকার শেড দেওয়া আনকোরা নতুন। মনীশ এনে দিয়েছে কিছুদিন আগে। কেকা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে হুলুস্থুল বাধিয়েছিল যে রাতে, তার পরদিন। বিছানা থেকে হাত বাড়ালে তার সুইচ ছোঁয়া যায়।

সুহাসিনী আবছা আঁধারে ফ্যান এবং টেবিলল্যাম্পের সুইচ দেখে নিয়ে বললেন, ঘরের পুরো লাইনই ফিউজ হয়েছে হয়ত। দাঁড়া তোরা, মোম নিয়ে আসছি। ভয় করবিনে তো?'

মৃণা রাগ দেখিয়ে বলল. 'কিসের ভয় ? আছি তো আমরা--ছিলাম তো এতক্ষণ ! তোমার খালি--'

'না রে। এসেছে, বুঝলি তো ? আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে।'

সুহাসিনীর এসব রহস্যময় কথা শুনতে তিন বোন অভ্যস্ত। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে পিসিমার কথা শোনে। তিতি বলল, 'লোকটা কে গো?'

'ওই আছে একজন। বলছি দাঁড়া না, মোম নিয়ে আসি আগে।'

সুহাসিনী পা বাড়ালে কেকা আস্তে আগের মত বলল, 'ও তো অরুণদা।'

সুহাসিনী ঘুরে বললেন, 'কী বললি ?'

'অরুণদা।'

সুহাসিনী হেসে ফেললেন। 'কথা শোনো ! আমাকে অরুণ দেখাচ্ছে। অরুণকে আমি চিনি না? দাঁড়া, এসে বলছি।

সুহাসিনী চলে গেলে তিন বোন জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্যুতের ঝিলিক এসে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছিল ওদের। মৃণা মনে মনে রেগে গেছে কেকার ওপর। এত দিনে মনে হচ্ছে, কেকার কি ঈর্ষা ছিল তার প্রতি ? বলত বটে, 'অরুণ খারাপ ছেলে। ওকে বেশি পাত্তা দিস কেন রে?' অথচ জানত কেকা, অরুণের সঙ্গেই মৃণার বিয়ে হবে। শুধু কেকার একটা সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার অপেক্ষা। অরুণ খুন হওয়ার পর বাথরুমে ঢুকে মৃণা যে নিঃশব্দে কান্নাকাটি করেছিল, তাও জানে কেকা। কিন্তু সে অরুণকে দেখবে কেন বৃষ্টির

সন্ধ্যায় ল্যাম্পপোস্টের কাছে কী অধিকার আছে তার ওকে দেখার? মৃণা ভাবছিল, মানুষের আত্মা যখন অমর, অরুণের আত্মা দেখা দিতেও পারে। কিন্তু সে তো তাকে দেখতেই চায়। অথচ দেখতে পাচ্ছে না। পাচ্ছে কেকা।

তিতি ভাবছিল। যে অচেনা লোকটা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তার দিকে তাকিয়ে হাসছিল, সে নিশ্চয় তাহলে পিসিমার চেনা লোক। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না ওকে, আবছা কালো সিল্যুট মূর্তি—শুধু মুখটা একটু স্পষ্ট এবং হাসিটা তো আরো স্পষ্ট।

সুহাসিনীর গলা শোনা গেল টানা বারান্দায়। ভানু অথবা সন্ধ্যাকে বকাবকি করছেন। বারান্দার মিটমিটে আলোটা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছিল। টানটান আলোর ওপর দাগড়া দাগড়া বাড়তি পোঁচ—মোমবাতিটার। দরজার পর্দা সরানো আছে. সুহাসিনী পর্দাটা টেনে দিয়ে মোমবাতিটা ড্রেসিংটেবিলে ক্রিমের কৌটোর মাথায় বসিয়ে দিলেন। তারপর জানালার পর্দাটা টেনে দিতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আপন মনে বললেন, 'পালিয়েছে।'

বাকি তিনটে জানালা বন্ধ। ওই একটাই খোলা। বাতাসে পর্দাটা কাঁপতে থাকল। বৃষ্টির ছাঁট আসছে এতক্ষণে। বাতাস উঠেছে। বাইরে বৃষ্টি, বাতাস আর মেঘের শব্দ মিলে দুর্যোগের আভাস। সুহাসিনী ভাইঝিদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'মলো যা! তোদের হয়েছে কী বলতো! আমি থাকতে অত ভয় পাচ্ছিস কেন? আয়, বস সব।'

তিন বোন গম্ভীর মুখে বিছানায় উঠে পা মুড়ে বসল। সুহাসিনী বসলেন পা ঝুলিয়ে। তারপর ফিক করে একটু হাসলেন। তিতি বলল, 'কার কথা বলছিলে গো?'

সুহাসিনী চোখ বুঝলেন। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। তারপর কপালে দুহাত জোড় করে ঠেকিয়ে চোখ খুলে আবার ফিক করে হেসে বললেন, 'পরশু রাত্রে টিভিতে দেখেছিলাম ওকে, জানিস তোরা? ওই যে নিরুদ্দেশ সম্পর্কে একটা ' ঘোষণা—দাঁড়া, নামটাও মনে আছে, হুঁ .... কাজল বোস। আমাদের চুঁচড়োর লোক বলল বলেই চোখ গিয়েছিল। চেনা চেনা লাগছিল--তবে ঠিক মনে করতে পারছি না। গোবিন্দ ঘোষ রোড বললে কিনা—সেজন্যই।'

তিতি বলল, 'সে তো কেউ হারিয়ে যাওয়া লোকের ব্যাপার। সে কেন—'

'হারিয়ে যায়নি। অরুণের মতোই মার্ডার হয়েছে।'

মৃণা চমকে উঠে বলল, 'তুমি কীভাবে জানলে ?'

'জানি। বুঝতে পারি।'

'পারো, তাহলে পুলিশকে জানিয়ে দিলে না কেন--মনুদাকে দিয়ে?'

তিতি বলল, 'কীভাবে জানতে পারলে বলো না পিসিমা ?

'টিভিতে ছবি দেখামাত্র বুঝলাম, হতভাগা মার্ডার হয়েছে। ওর বডি এখনও পেয়ে যাবে। বালি ব্রিজের ওখানে আটকে আছে।'

কেকা শক্ত গলায় বলল, 'ও অরুণদা। কাজল-ফাজল কেউ না।'

তিতি বলল, 'কার কথা বলছিস বড়দি? যাকে রাস্তায় দেখলাম?'

'হ্যাঁ।'

সুহাসিনী জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'কখনো না। পরশু থেকে দেখছি, কাজল বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছে। কাল শেষ রাত্রে আমার ঘরের কপাট পর্যন্ত ঠেলছিল।'

তিতি ও মৃণা একসঙ্গে বলল, 'সত্যি?'

'সত্যি না তো মিথ্যা বলছি?' সুহাসিনী গম্ভীর মুখে বললেন। 'দেখবি হয়তো কালই কাগজে খবর বেরুবে কাজলের মৃতদেহ উদ্ধার। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, কেন ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে?'

তিতি বলল, 'চেহারার ডেসক্রিপশান দাও তো পিসিমা!'

'কেকার ভুল হচ্ছে কেন, বুঝেছি। কতকটা অরুণের মতই দেখতে ছিল। টিভিতে ছবিটা একটু আবছা ছিল। তাহলেও মনে হয়েছিল চিনি ওকে। গোবিন্দ ঘোষ রোডে লাল রঙের বাড়িটায় কোন বোস থাকত যেন। ওই বাড়িরই ছেলে হবে।'

কথাটা বলে সুহাসিনী গুম হয়ে কিছু ভাবতে থাকলেন। মৃণা অবিশ্বাসের সীমানা থেকে ওঁর দিকে তাকাতে তাকাতে বিশ্বাসের সীমানায় পা ফেলেতে গিয়ে তুলে নিচ্ছে। আবার ফেলছে। তারপর তার একটা কথা মনে পড়ে গেল। আগের মাসে এক সন্ধ্যায় সে ছাদে গিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পরে অরুণ গেল। মৃণা একটু লজ্জা পেয়ে চলে আসছিল। অরুণ তাকে আসতে দেয়নি। বলেছিল, 'মাঠের ওখান থেকে তোমাকে দেখে ছুটে আসছি। আর তুমি চলে যাচ্ছ? দাঁড়াও, কথা আছে।' মৃণার ভয় করছিল। অরুণকে কিছু বিশ্বাস নেই। ও যা সাঙ্ঘাতিক ছেলে! মৃণা বলেছিল, 'নাও, ঝটপট বল কী বলবে।' অরুণ তার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কী বলতে গিয়ে হঠাৎ চুমু খেয়ে বলেছিল, 'এই আমার কথা।' আর মৃণা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে নিচে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে অরুণও নেমে এসে তার বাবার ঘরে ঢোকে। বাবা ওকে খুব পছন্দ করতেন। মা তো খাতিরের চূড়ান্ত করে ছাড়তেন। কিন্তু মৃণা যখন ওদিকের বারান্দার রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আনমনা হয়ে আছে, সুহাসিনী এসে চাপাস্বরে হঠাৎ তাকে বলেন, 'অরুণের কপালে একটা কিছু আছে, মিনু। আজ ওকে দেখে আমার ভাল লাগল না।' মৃণা খুব রেগে গিয়েছিল বেমক্কা এসব কথাবার্তায়। কিন্তু আশ্চর্য, ব্যাপারটা সে ভুলেই গিয়েছিল। এমনকি, সত্যি ঝিলে অরুণের মড়া পাওয়া গেলেও ওটা মনে পড়েনি। এখন সব মনে পড়ছে। আরও মনে পড়ছে, সুহাসিনীর মুখে সেই দিন কেমন একটা বাঁকা হাসিও দেখেছিল যেন। তাহলে পিসিমা সব টের পেয়েছিলেন। টের পান কী ঘটতে চলেছে কার ভাগ্যে। তার পিসিমা কে?

সুহাসিনী শ্বাস ছাড়লেন। 'বরাবর আমার এটা হয়, বুঝলি? তার ওপর এ ঘরের লাইন ফিউজ আজ। এও একটা লক্ষণ। এমনি সব সময়েই তো ওরা আসে।'

তিতি ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'কারা পিসিমা?'

কেকা আস্তে বলল, 'অরুণদা, কাজল বোস...'

মৃণা হিসহিস করে 'শাট আপ' বলে খাপ্পা হয়ে চলে যাচ্ছিল। খাট থেকে নামতে গিয়েই সে থমকে গেল। শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বলে উঠল, 'পিসিমা ! ওটা কী ?'

দরজার পর্দার তলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিল একটা কালো বেড়াল—হলুদ জলজ্বলে দুটি চোখ, শাদা গোঁফ। বেড়ালটা ঘরে ঢুকে কোণার দিকে রাখা মোড়ার ওপর, তারপর টেবিলে উঠে গেল লাফ দিয়ে। পিঠ কুঁজো করে বসে এদের দিকে হলুদ চোখে তাকিয়ে রইল। তিন বোন পুতুল হয়ে গেছে। সুহাসিনী মিটিমিটি হাসছেন বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে। কতক্ষণ পরে মৃণা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ না কেন পিসিমা? শিগগির তাড়িয়ে দাও ! ' কান্নার সুর তার কণ্ঠস্বরে।

সুহাসিনী বললেন, 'আহা, ঢুকেই পড়েছে যখন, থাক। দেখি কী বলে।'

তিতি বলল, 'তুমি ওর কথা বুঝতে পারবে ?'

'পারছি তো।'

'কী বলছে, বলো না গো !'

মৃণা বলল, 'ভ্যাট! ওটা তো রাণুদিদের বেড়াল।'

সুহাসিনী ধমক দিলেন। 'খুব জানিস তুই ! রানুদের বেড়ালটা গাড়িচাপা পড়ে মরে গেছে, জানিস? কাজলের আত্মা বেড়ালটার শরীরে ঢুকে গেছে। এবার তোরা একটু চুপ কর তো। ও কী বলছে শুনে নিই।'

শোনা হল না। ভানু এল দুহাত তুলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে 'দিদিরা আসুন! শিগগির আসুন। পিসিমা আসুন! চিত্তহার! চিত্তহার!'

টিভিতে 'চিত্রহার' প্রোগ্রামের খবর। তিতি মেঝেয় ঝাঁপ দিল সবার আগে। তারপর মৃণা। সুহাসিনী উঠে দাঁড়ালেন। কালো বেড়ালটাকে চোখ কটমটিয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, ভানু 'আবার?' বলে চিক্কুর ছেড়ে তার দিকে ছুটে এল। বেড়ালটা এক লাফে মেঝেয় পড়ে তার পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গেল। ভানু হিহি করে হাসতে লাগল।

'বাঁদর' বলে সুহাসিনী তার কানের দিকে হাত বাড়িয়ে তার পেছন পেছন বেরিয়ে গেলেন। 'চিত্রহার' শুনতে খুব ভাল লাগে সুহাসিনীর। তিতি ও মৃণারও। বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সংহতি। .... 'আমরা-আ সব নির্ভয় নির্ভীক .... আমরা-আ..'

কেকা বসে রইল একা। মোমটা ছোট। তলার দিকে ঠেকেছে। শিখাটা ফুলে গেছে। দপদপ করে কাঁপছে। পুট পুট শব্দ হচ্ছে । বাইরে বৃষ্টি আর বাতাস একই তালে প্রাকৃতিক বাজনা বাজাচ্ছে। শুধু মেঘের ডাকে ক্লান্তির আভাস। গলা ভেঙে গেছে।

চিড়বিড় করতে করতে মোমটা দপ করে নিভে গেল। কেকার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। মনে মনে বলল, ভয় পাব না। আমি কিছুতেই ভয় পাব না। জানালার ফাঁক দিয়ে রাস্তার

আলোর সামান্য আভাস আর উল্টোদিকে দরজার পর্দার তলা দিয়ে বারান্দার মিটমিটে আলোর একটু ছটা এসে পড়ে আছে। ঘরের ওই জায়গাটা জুড়ে আলো-অন্ধকারমেশা খানিকটা আভা, কাকজ্যোৎস্না রাতের প্রতিবিম্ব। সেইখানে পায়ের শব্দ। কেকা তাকিয়ে রইল। অনেক দূরে থেকে কেউ এগিয়ে আসার মতো পায়ের শব্দ। কেকা ঠোঁট কামড়ে রইল। সে ভয় পাবে না। কিছুতেই ভয় পাবে না।

কেকা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, 'কে?'

'আমি।' .... কয়েক সেকেণ্ড পরে, 'কাজল।'

'কী কাজল-টাজল করছ? তাকে আমি চিনি না। পিসিমা চেনে।'

'তুমিই বলো আমি কে?'

'অরুণ।'

'আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন কেকা?'

'সে-রাতে তুমি অমন করে আমার পাশে বসলে কেন? কী মতলবে ?'

'তাই বুঝি তুমি মাঝখানে শুচ্ছ তারপর থেকে ?'

'জানি, তুমি সে-রাতে ভুল করে আমাকে মিনু ভেবেছিলে।'

'বিশ্বাস করো...'

'শাট আপ ! তুমি মিনুকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে।' কেকা হিসহিস করে বলল। 'বিশ্বাসঘাতক! মিথ্যাবাদী। ভণ্ড! জোচ্চোর! বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। নইলে চ্যাঁচাব।'

'চুপ করো কেকা! বিশ্বাসঘাতক আমি না তুমি?'

'তুমি আগে, পরে আমি।'

'কেকা! তুমি এমন সাঙ্ঘাতিক মেয়ে আমি ভাবিনি। তোমার কি এতটুকু ভয় করেনি, হাত কাঁপেনি...'

'না। যে আমার সর্বনাশ করেছে, তাকে শাস্তি দিতে আমার হাত কাঁপবে কেন?'

'তুমি সেদিন অত রাতে আমাকে ঝিলের ধারে অপেক্ষা করতে বললে, আমি সরল বিশ্বাসে অপেক্ষা করেছিলাম। তুমি গেলে। ভীষণ প্রেম দেখাতে শুরু করলে। আমার বুকের ওপর শুয়ে পড়লে। তখনও টের পাইনি তোমার উদ্দেশ্য। আসলে আমি ড্রিঙ্ক করে মাতাল হয়ে ছিলাম। হঠাৎ তুমি ড্যাগার বের করে আমার শ্বাসনালী কেটে ফেললে। কী সাঙঘাতিক মেয়ে তুমি কেকা! তারপর আমার পা ধরে টেনে জলে ফেলে দিলে। ড্যাগারটা জলে ফেলে দিয়ে ঝিলে নামলে। তুমি ভেজা কাপড়ে বাড়ি ফিরে গেলে। আমি সব দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তখনও কিছু বুঝতে পারছিলাম না। নইলে....'

'তুমি বেরিয়ে যাও। নইলে চ্যাঁচাব।'

'তোমার পিসিমা সব জানেন, কেকা। তোমার কাপড়ে ব্লাউসে রক্তের ছোপ ধোয়া যায়নি তখনও। তুমি ওঁর সামনে পড়ে গিয়েছিলে।'

'তুমি যাবে কি না বলো !'

'তোমার পেটে আমার সন্তান আছে, কেকা ! তার কী হবে ভেবেছ কি ?'

'পিসিমা জানে। শিগগির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি জ্বালিও না তো ! যাও।' কেকা ক্লান্তভাবে বলে। বৃষ্টিটা থেমে গেছে মনে হচ্ছে। ঝিল ও মাঠের দিকে ব্যাঙ ডাকছে, পোকামাকড় ডাকছে। কাঁপা কাঁপা এঞ্জিনের হুইসিলের শব্দ রেললাইনে। কেকা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

'কেকা! কেন তুমি এই ভুলটা করলে ? কেন অপেক্ষা করলে না আর কিছুদিন? দেখ



তে, আমি কী করতাম !'

কেকা কান্নাজড়ানো স্বরে বলল, 'তুমি মিনুকে ভালবেসেছিলে! ওকে বিয়ে করতে চাইছিলে।'

'না। তোমার বাবা-মা তাই চাইছিলেন। কারণ তোমার জন্য নাকি কোথায় একটা ছেলে ঠিক করা আছে।'

'তাকে আমি বিয়ে করতাম না। তুমি কেন বাবাকে বললে না...'

'আঃ! বলেছিলাম। তোমার বাবা মিনুর জন্য ইনসিস্ট করলেন।'

'তুমি বলনি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে?'

'অতটা বলা যায় না, কেকা!

'ন্যাকামি! তুমি চলে যাও, অরুণ।'

'আমি তোমকে নিতে এসিছি, কেকা!'

অমনি কেকা থরথর করে কেঁপে ওঠে। আবছায়া মূর্তিটা এগিয়ে আসছে তার দিকে। কেকার গলার স্বর বন্ধ হয়ে যায়। একটা ঠাণ্ডা হিম হাত তার বাহুতে। সমস্ত শরীর—হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কনকনিয়ে যায়।

অবশেষে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে কেকা বলে, 'হাত ছাড়। যাচ্ছি।' ....

ট্রেন থেকে নেমে মনীশ শর্টকাট করতে চাইছিল। রাস্তায় প্রায় কোমর জল ভাঙতে হবে। খেলার মাঠ দিয়ে নাক বরাবর এগোলে জলটা কম। খানাখন্দ আছে কোথাও কোথাও। তা থাক, দেখেশুনে পা ফেলব।

বৃষ্টিটা থেমেছে। আশ্চর্যভাবে মেঘের ফাঁক গলিয়ে ডিমের হলদে কুসুমের মত থলথলে চাঁদ। ভিজে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে মাঠের জলের ওপর। বাতাসটা আছে এখনও। বঙ্গোপসাগরের ডিপ্রেশানটা গাঙ্গেয় উপত্যকা পেরিয়ে বিহারে সরে গেল হয়ত। কাল প্রচুর রোদ, মনীশ আশা করেছিল।

মাঠের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াল। ডাইনে ঝিলের দিকে কেউ প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেও থমকে দাঁড়িয়েছে মনীশকে দেখে। মনীশ বল, 'কে ?'

দৌড়বার চো করছে দেখে মনীশ অ্যাডভেঞ্চারের লোভ সামলাতে পারল না। 'চোর চোর' বলে সে তাড়া করল। ঝপাং ঝপাং শব্দে জল ও হলুদ জ্যোৎস্না ভাঙচুর করে এগিয়ে যেতেই 'চোর' আছাড় খেয়েছে জলে। মনীশ তার দিকে ঝুঁকেই চমক খেল। 'কেকা! তুমি!'

কেকা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। মনীশ তার গালে থাপ্পড় মারতেই হুহু করে কেঁদে ফেলল। বাড়িতে নিশ্চয়ই বকাবকি বা ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। মনীশ বলল, 'বোকা মেয়ে! আমি তো আছি, না কী?'

সারাপথ কোনো প্রশ্নের জবাব দিল না। ততক্ষণে টিভি দেখা শেষ। বারান্দার শেষ

প্রান্তে কিচেনের সামনে টেবিলে মৃণা ও তিতি খেতে বসেছে। সুহাসিনী রেলিঙে ভর করে একটু দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন। এখনও বলেননি কেকা ওঘরে নেই। বললে তো হুলুস্থুল শুরু হবে।

আসলে সুহাসিনী চাইছিলেন, কেকা যদি মরতে গিয়ে থাকে, মরুক। ওর মরাই উচিত।

কিন্তু একটু পরে সিঁড়ির মুখে মনীশ আর কেকাকে দেখতে পেয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে। মৃণা ও তিতি এঁটো মুখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সত্যেশ্বর ও বৈজয়ন্তী নিজেদের ঘরে চাপা গলায় কথা বলছেন। বাড়িটা অস্বাভাবিক চুপচাপ। শুধু মাঠ ও ঝিলের দিক থেকে বর্ষারাতেব প্রাকৃতিক কণ্ঠস্বর। তারপর হুইসল দিতে দিতে একটা ট্রেন যেতে থাকল। খালপোলের দিকে আবার কিছুক্ষণ বুকের শব্দের মত আশ্চর্য এক শব্দ। ....